দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির সাধনা

মফিদুল হক

দেশভাগ কেবল ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক বিভাজন ছিল না, এর অভিঘাতের বিষ সংক্রমিত হয়েছে সমাজদেহের অনেক গভীরে। সাম্প্রদায়িকতা ও সংঘাতের জের কাটিয়ে উঠতে বিভাজনকে শিরোধার্য করে নিয়েছিল একদা রাজনীতিবিদরা, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ভেদচিন্তা আরো উস্কে দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতা, অন্যদিকে সম্প্রীতির সমাজ রয়ে গেছে অধরা। উপমহাদেশের মানুষের জীবন অর্থবহ করে তুলতে সম্প্রীতির আদর্শ তাই বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কূপমণ্ডূকতার বিপরীতে উদারচিন্তার প্রাধান্য গড়বার জন্য চাই অতীত ইতিহাসের নানামুখী ও নির্মোহ বিশ্লেষণ। সমকালের জন্য অশেষ তাৎপর্যময় সেইসব বিষয়ে আলোকপাত ঘটেছে বর্তমান গ্রন্থে, যা নিঃসন্দেহে আমাদের ভাবনাকে আলোড়িত করবে, চিন্তাকে করবে সমৃদ্ধ।

ISBN 978 984 506 079 0

ষাট বছরেরও আগে পরাধীনতার অবসান ঘটিয়ে উপমহাদেশে স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের সঙ্গে ঘটেছিল আরেক তাৎপর্যময় ঘটনা— দেশভাগ বা পার্টিশন। স্বাধীনতা ও দেশভাগকে তারপর থেকে আর আলাদা করে বিচার করা যায়নি, কেননা দেশভাগ কেবল একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্রিক বিভাজন-রেখা হয়ে থাকেনি, ভেদচিন্তা ও সংঘাত প্রবিষ্ট হয়েছিল সমাজদেহের অনেক গভীরে, জন্ম দিয়েছিল দাঙ্গা-হানাহানি থেকে শুরু করে বহু ধরনের সাম্প্রদায়িক ভাবনা-বিকৃতি। অতীত ইতিহাসের সেই অভিঘাতের নানা রূপবদল ঘটেছে। এর বিপরীতে অব্যাহতভাবে চলেছে সম্প্রীতির বিভিন্ন সাধনা, যেন রাষ্ট্রের বিভাজন মানুষে মানুষে বিভেদ ও বিদ্বেষের জন্ম না দেয়। সংঘাত ও সম্প্রীতির এমনি যে নিরন্তর লড়াই উপমহাদেশ জুড়ে পরিচালিত হচ্ছে তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-শৈল্পিক মাত্রা অধ্যয়ন সর্বদা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের এই গতিধারার ওপর আলোকপাতের চেষ্টা নেয়া হয়েছে গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধসমূহে, বিভিন্ন সময়ে রচিত হলেও সব মিলিয়ে এক সমগ্রদৃষ্টি এখানে মেলে, যা আমাদের নিয়ে যাবে সমাজসত্যের গভীরে, যাচাই করতে সাহায্য করবে অতীত ইতিহাসকে, সহায়ক হবে সুন্দর আগামীর ব্রতপালনে সমাজের সম্মিলিত প্রয়াসে।

অপর ফ্ল্যাপে দেখুন

টাকা ২৫০.০০

মফিদুল হক (জন্ম: ১৯৪৮) পেশায় প্রকাশক এবং কর্মসুবাদে শিল্প-সংস্কৃতি ও সৃজনমূলক বিভিন্ন উদ্যোগের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। তাঁর সমাজচিন্তামূলক বহুবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও শিল্প-সাহিত্যের সাময়িকীতে, যদিও প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা তুলনায় খুব বেশি নয়। মৌলিক প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি অনুবাদেও তিনি সর্বদা আগ্রহের পরিচয় রেখেছেন। সমাজ-অধ্যয়ন তাঁর রচনার মূল বিষয়, এক্ষেত্রে শিল্প-সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ পেয়েছে বিশেষ প্রাধান্য। বাংলা একাডেমী থেকে জীবনীগ্রন্থ সিরিজে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রচিত 'আবুল হাশিম' এবং 'পূর্ণেন্দু দস্তিদার'। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'মনোজগতে উপনিবেশ: তথ্য সাম্রাজ্যবাদের ইতিবৃত্ত', 'তৃতীয় বিশ্ব' এবং 'নারীমুক্তির পথিকৃৎ'। অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে এর্নেস্তো কার্দেনালের 'বিপ্লব ও ভালোবাসার কবিতা', জন হের্সের 'হিরোশিমা', সিডনি শনবার্গের 'ডেটলাইন বাংলাদেশ: ১৯৭১', আহমেদ সালিমের 'পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দিজীবন' প্রভৃতি। শিল্পকলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে দ্বিভাষিক গ্রন্থ 'কাইয়ুম চৌধুরী'। তিনি আন্তর্জাতিক থিয়েটার ইনস্টিটিউট-ইউনেস্কো প্রকাশিত দ্বিবার্ষিক সংকলন 'ওয়ার্ল্ড অব থিয়েটার'-এর অন্যতম সম্পাদক। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব তিনি।

ISBN 978 984 506 079 0

দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির সাধনা

মফিদুল হক

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

উৎসর্গ

দেবলীনা, অলীক, ঈপ্সিতা, লোপা, বিষ্ণু, তৌফিক
এবং ভারত ও বাংলাদেশের অপরাপর নবীন-নবীনা

যারা পেরিয়ে যাবে বিভাজনের রেখা

সূচিপত্র

ভূমিকা

দেশভাগ বা পার্টিশন বাংলার ইতিহাসের প্রবল আলোড়নময় ঘটনা হলেও এর তাৎপর্য ও অভিঘাত বিষয়ে আলোচনা বা বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম মেলে। পূর্ববাংলার বিভিন্ন মফস্বল শহর তথা ময়মনসিংহ, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বড় হয়ে ওঠার সুবাদে দেশভাগ আমার কাছে দূর ইতিহাসের ঘটনা হয়ে থাকেনি, বিভাজনের রেখা যে অজস্র জনপদের অগণিত মানুষকে স্পর্শ করেছে নানাভাবে, প্রভাবিত করেছে তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন, চিন্তা-চেতনা, সেসব প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দুইয়েরই অংশীদার হয়েছি। সেই সাথে জড়িয়ে আছে পঁয়ষট্টি সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্মৃতি, সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের কিশোর হিসেবে যে-আগুন থেকে আমরা ছিলাম নিরাপদ, দুশ্চিন্তামুক্ত, কিন্তু দগ্ধ হয়েছেন কাছের বা পাশের মানুষেরা; জীবনাভিজ্ঞতায় মিশে থাকা এইসব অভিঘাত ও ভাবনার জট থেকে কোনোভাবে কখনো মুক্তি পাওয়া যায়নি।

বিভিন্ন সময় অক্ষম নানা রচনায় উপরোক্ত বিষয়গুলোর নৈর্ব্যক্তিক প্রতিফলন ঘটেছিল এবং বর্তমান সংকলনে তা একত্র করে পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া হলো। বিভাজনের রাজনীতি বাংলাকে বারবার সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিলেও সম্প্রীতির আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কোনো ছেদ কখনো পড়েনি। এই প্রয়াসের যেমন রাজনৈতিক দিক রয়েছে, তেমনি আছে সাহিত্যিক ও শৈল্পিক মাত্রা। দ্বিজাতিতত্ত্বের সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের আদর্শ বহন করে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল সেখানে মানুষের অধিকার সর্বভাবে অস্বীকৃত হয়েছিল। কেননা কৃত্রিম এক রাষ্ট্রকে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে জবরদস্তিতা ও অস্বীকৃতির পথ বেছে নিতে হয়েছিল। অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক জাতিচেতনা নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব উপমহাদেশে বিভাজনের অভিশাপ মোচনের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এর পাশাপাশি বিদ্বেষ হানাহানিও ক্রমে বেড়ে চলেছে এবং ধর্মের এক উগ্র সহিংস রূপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এই পটভূমিকায় সম্প্রীতির আদর্শ জোরদার করবার গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে।

সংঘাতের বাস্তবতা ছাপিয়ে যাবে সম্প্রীতির আদর্শ, এমন ভাবনা থেকেই বর্তমান গ্রন্থের রচনাদি সঙ্কলিত হয়েছে। গ্রন্থ প্রকাশে ইউপিএলের প্রকাশনা-অধ্যক্ষ বদিউদ্দিন

নাজিরের প্রশ্রয় ও তাগিদ সর্বদা কার্যকর ছিল। তাঁকে বিশেষভাবে জানাই ধন্যবাদ। গ্রন্থভুক্ত লেখাগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, কয়েকটি প্রবন্ধ ইতিউতি সেমিনারে পঠিত হয়েছে, এই সূত্রে সংশ্লিষ্টজনের প্রতি জ্ঞাপন করছি কৃতজ্ঞতা। আলোচনা ও ভাববিনিময়ের সূত্রে আরো অনেকের কাছে আমি ঋণী, আলাদা নামোল্লেখ না করেও সবাইকে জানাই ধন্যবাদ, সালাম ও প্রণাম।

ঢাকা
জানুয়ারি ২০০৯

মফিদুল হক

বিভাজন ও সম্প্রীতি: বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষ

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষ অচিরেই আমরা পেরোতে যাচ্ছি। বঙ্গভঙ্গ যেমন জন্ম দিয়েছিল তীব্র বাদানুবাদ, বিতর্ক, সংঘাত ও বিভাজন, বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষেও তার কোনো কমতি ঘটেছে বলে মনে হয় না। কমতি যদি কিছু থাকে সেটা ইতিহাস বিষয়ে আমাদের ঔদাসীন্যের কারণে, বর্তমান নিয়ে আমরা এতো ব্যস্ত ও পীড়িত থাকি যে ইতিহাসের দিকে তাকাবার ফুরসৎ আমাদের নেই, হালফিল প্রাপ্তি দিয়ে জমার খাতা ভরে তুলতে চাই বলে কালপরিক্রমণের হিসেব কষা আমরা ভুলে গেছি, তাতে নগদ লাভ যদিও-বা কারো কারো ঘটে, জমার ঘরটা শূন্যই থেকে যায় সমাজের জন্য এবং অন্তঃসারশূন্য এক জীবনবোধ আমাদের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, জাতিগত ও রাষ্ট্রিক জীবনে সঙ্কটের যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি করছে সেই ঝঞ্ঝায় পাক খেতে খেতে আমরা ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছি, কোথাও কোনো স্থিতি খুঁজে পাচ্ছি না।

বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষ উপস্থিত হতে বাঙালি উৎসবে মেতে উঠতে আগ্রহী হয়। একাংশ একে দেখেন বাঙালি জাতিসত্তার উদ্বোধনের স্মারক হিসেবে, অনুনয়-নিবেদনের অধ্যায় চুকিয়ে গণরাজনৈতিক সংগ্রামের সূচনাকারী রূপে; কিন্তু তাদের উৎসবের ডামাডোলে হারিয়ে যায় নবোত্থিত সেই আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মসত্তার সম্মিলন সাধনে ব্যর্থতার স্মারকগুলো, যে ব্যর্থতা আন্দোলনকে সত্যিকার জাতীয় সংগ্রাম হওয়ার পথ থেকে বিচ্যুত করে। আরেক অংশ বঙ্গভঙ্গের পর্বের এককালীন ঘাটতিকে চিরকালীন সত্য হিসেবে শিরোধার্য করে উৎসব আয়োজনে ব্রতী হয়, ইতিহাসের এক পর্বের ব্যর্থতা ও জটিলতাকে অপর পর্বে চালান করতে তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। বিশ শতকের গোড়ার বঙ্গভঙ্গ প্রয়াস ও তার পক্ষে-বিপক্ষে সামাজিক-রাজনৈতিক বিলোড়নকে 'উৎসব' হিসেবে পালন করবার মধ্যে তাই আছে এক ধরনের নির্বিচার আনুষ্ঠানিকতা, যা আমাদেরকে ইতিহাসের বিশ্লেষক হওয়ার পরিবর্তে মতান্ধ অনুসারীতে রূপান্তরিত করে এবং এমনি ভূমিকা থেকে আড়ম্বরে মেতে থাকা যায়, ইতিহাসে অবগাহন সম্ভব হয় না।

বঙ্গভঙ্গের পর্ব নিয়ে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা যথার্থ বিদ্বজ্জনের কাজ, সেই পথ পরিহার করে আমরা বরং বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্র করে বিভাজন ও সম্প্রীতির যে প্রয়াস

গোটা বাংলায় আলোড়ন ও অস্থিরতার জন্ম দিয়েছিল তার স্বরূপ বিশ্লেষণের সামান্য এক চেষ্টা নেব এবং এক্ষেত্রে আমাদের অবলম্বন হবে এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত চার কুশীলব, লর্ড কার্জন অব কেডলস্টোন, নবাব খাজা সলিমউল্লাহ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ব্যারিস্টার আবদুল রসুল।

জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন (১৮৫৯-১৯২৫) জন্মেছিলেন অভিজাত ইংরেজ পরিবারে, শাসকশ্রেণীর একজন হিসেবে নিজেকে ভাবতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, ইটন ও অক্সফোর্ড থেকে শিক্ষা সমাপন করেন সভ্যতা ও ইতিহাস বিষয়ে, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন, রাশিয়া ও প্রাচ্যদেশ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন, লেখেন একাধিক পুস্তক— *রাশিয়া ইন সেন্ট্রাল এশিয়া* (১৮৮৯), *পার্সিয়া অ্যান্ড দি পার্সিয়ান কোশ্চেন* (১৮৯২) এবং *প্রবলেম অব দা ফার ইস্ট* (১৮৯৪) এবং এভাবে অগ্রগণ্য প্রাচ্য-বিশারদ হিসেবে তিনি বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেন। রাজনীতিতে তাঁর উত্থানেও বিলম্ব হয় না, ১৮৮৫ সালে তিনি পার্লামেন্টের লর্ডসভার সদস্য হন, বিদেশ মন্ত্রকের উপমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কিছুকাল। ১৮৮৭ সালে প্রথমবারের মতো কলকাতায় এসে ভাইসরয়ের আবাস রাজভবন দেখে তিনি বিস্মিত হন, তাঁর পৈতৃক আবাস কেডলস্টোনের প্রাসাদের আদলে তৈরি এই রাজভবন, ১৭৬১ সালে স্যার ন্যাথানিয়েল কার্জন যে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। ভারতের ভাইসরয় হওয়ার যে-স্বপ্ন দেখছিলেন জর্জ কার্জন এই অভিজ্ঞতায় তিনি যেন তার ঐশ্বরিক সমর্থন খুঁজে পেলেন। অবশেষে ১৮৯৯ সালে ৪৯ বছরের লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন। লন্ডনে তাঁদের আবাসের জন্য গৃহপরিচারিকা সংগ্রহের সঙ্কটে ভুগছিলেন লেডী মেরি কার্জন, এখন সিমলায় ভাইসরয়ের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদে সাতশত ভৃত্য ও পরিচারিকা তাঁদের ঘিরে রইলো, ভারতের বড়লাট তো সত্যিকারের রাজাধিরাজ। ভারতের এই নবীন রাজা পালটে দিতে চেয়েছিলেন দেশটিকে, সাম্রাজ্যের পদানত প্রজাদের জীবনে তিনি বহুমুখী কল্যাণ বয়ে আনবেন এবং উপনিবেশ ভারতকে প্রভু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে কৃতজ্ঞ খাতকের সম্পর্কে আরো দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করবেন, এই ছিল তাঁর প্রত্যয়। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী ও উদ্যোগী পুরুষ, সেইসঙ্গে প্রবল অহংতাড়িত। প্রশাসনকে গতিশীল করতে কার্জন সচেষ্ট হয়েছিলেন, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের আধিপত্যে নেটিভদের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ রেখে তাকে যতোটা গতিশীল করা যায় তিনি সেটা করেছেন। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া ও ইমপেরিয়াল লাইব্রেরি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, রেলওয়ে বোর্ড স্থাপন করে ভারতে রেললাইনের দৈর্ঘ্য বিপুলভাবে প্রসারিত করেন, চিনি ও ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের বিকাশ ঘটান, পশ্চিম ভারতে জলসেচ ব্যবস্থা উন্নত করেন; সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিক মনোভাবের ঔদ্ধত্য দ্বারা আচ্ছন্ন এই শাসকের মনে হয়েছিল, “মঙ্গলসাধনের উপায় হিসেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতো মহান আর কিছু পৃথিবী কখনো দেখেনি।”

ভাগ্যের এমনি পরিহাস, লর্ড কার্জনের শাসনকাল সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী যে পরিবর্তন বয়ে এনেছিল তা ছিল কার্জনের পরিকল্পনা-বহির্ভূত ও অনাকাঙ্ক্ষিত। ভারতীয় বাঙালি

সমাজের আন্দোলনমুখিতা অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেয়ে তিনি জন্ম দিলেন সত্যিকার গণসচেতনতা ও গণপ্রয়াস, যা এতোকাল ছিল অনুপস্থিত। তিনি শাসনকার্যের সুবিধার যুক্তি তুলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে বিভাজিত করবার যে সিদ্ধান্ত নেন তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নতর। ব্রিটিশ ভারতে বাংলার অবস্থান ছিল অগ্রগণ্য, বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশমান অংশ ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছে ক্ষমতার অংশভাগ নিয়ে ক্রমবর্ধমান দাবিদাওয়া হাজির করছিল। যে ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য কার্জন এতো করছেন সেই নেটিভদের দিক থেকে সমপর্যায়ের দাবিদারিত্ব মেনে নিতে কার্জন প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে কংগ্রেস এবং বাংলার জায়মান আন্দোলনমুখী প্রবণতার প্রতি কার্জন ছিলেন চরমভাবে বিদ্বিষ্ট। ১৯০০ সালের নভেম্বরে ভারত সচিব হ্যামিলটনকে কার্জন লিখেছিলেন, "আমার দৃঢ়বিশ্বাস কংগ্রেস ভেঙে পড়ছে এবং ভারতে থাকাকালীন আমার বড় বাসনা হবে তার শান্তিপূর্ণ মৃত্যুতে সাহায্য করা।" এহেন কার্জন যখন বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন সেই ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আরেক পত্রে লিখেছিলেন "বাঙালিরা নিজেদের এক মহান জাতি মনে করে এবং কোনো বাঙালি বাবুকে লাটসাহেবের গদিতে আসীন দেখতে চায়। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব তাদের সেই স্বপ্নের সফল রূপায়ণে বাধা দেবে। আমরা যদি তাদের আপত্তির কাছে নতি স্বীকার করি তবে ভবিষ্যতে কোনদিনই বাংলা ভাগ করতে পারবো না এবং আপনারা ভারতের পূর্বপার্শ্বে এমন এক শক্তিকে জোরদার করবেন যা এখনি প্রবল এবং ভবিষ্যতে বর্ধমান বিপদের উৎস হয়ে দাঁড়াবে।"

বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে ১৯০৪ সালের প্রথম দিকে লর্ড কার্জন ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম সফর করেন এবং মুসলিম এলিট সম্প্রদায়ের কাছে পৃথক পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেন। কার্জনের এই ব্যাখ্যায় প্রশাসনিক সুবিধার দিকটি মোটেই উল্লিখিত হয়নি, বরং তিনি জোর দিয়েছিলেন বিভাজনের ফলে মুসলমানদের অর্জনযোগ্য সুবিধাদির প্রতি। যে লর্ড কার্জন ভারতীয়দের মধ্যে কোনো গৌরবের চিহ্ন দেখতে পাননি তিনি পূর্ববাংলার মুসলমানদের জন্য বেদনাবোধ করে জানান যে, ঢাকা এখন তার পূর্বের ছায়া মাত্র। তিনি আরো বলেন, "বঙ্গভঙ্গ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যা এসব জেলার জনগণকে সৃষ্ট প্রদেশে তাদের সংখ্যাধিক্য ও উচ্চতর সংস্কৃতির বদৌলতে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম করবে এবং পূর্ববাংলায় মুসলমানদের মধ্যে এমন ঐক্য গড়ে তুলবে যা তারা প্রাচীন মুসলমান সম্রাট ও রাজাদের আমলের পর আর কখনো অর্জন করতে পারেনি।"

এইসব বক্তৃতা-বিবৃতিতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, মুসলিম এলিট গোষ্ঠীকে বশংবদ হিসেবে দাঁড় করিয়ে ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ফাটল ধরাতে সচেষ্ট হয়েছে ব্রিটিশ সরকার। এই ক্ষেত্রে তাদের বড় অবলম্বন হয়েছিলেন ঢাকার নবাব খাজা সলিমউল্লাহ। পিতা খাজা আহসানউল্লার মৃত্যুর পর সলিমউল্লাহ নবাব এস্টেটে গদিনশিন হন ১৯০১ সালে। পরিবার প্রধান হিসেবে তাঁর এই প্রতীকী অবস্থানকে কাজে লাগাতে ব্রিটিশ প্রশাসন সক্রিয় ভূমিকা নেয়। তবে যে-কাজ তাঁকে দিয়ে করাবার আকাঙ্ক্ষা

ব্রিটিশদের ছিল তা সম্পাদনে সলিমউল্লাহর আগ্রহ ও যোগ্যতা দুইয়েরই অভাব ছিল। সেই অভাব মোচনেও ব্রিটিশদের ভূমিকা রাখতে হয়।

নবাব আহসানউল্লাহর মৃত্যুর পর পারিবারিক সম্পত্তি তাঁর আট সন্তান ও বিধবা স্ত্রীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। নবাব সলিমউল্লাহ নিজে যখন এস্টেট পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন অন্য শরিকরা তা ভালোভাবে মেনে নেননি। জমিদারিতে তিন আনা অংশের মালিক ছিলেন সলিমউল্লাহ এবং তাঁর পরিচালনায় জমিদারি দ্রুত লোকসানে পরিণত হয়ে ঋণভারে জর্জরিত হয়। সরকার জমিদারি রক্ষায় হস্তক্ষেপ করে ১৯০৫ সালের মে মাসে কর্নেল জে. হোডিংকে ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দেয়। পরের বছর মাত্র তিন শতাংশ হারে সুদ ধার্য করে নবাব সলিমউল্লাহকে এক লক্ষ পাউন্ড ঋণ দেয়া হয়, যে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রকারান্তরে উৎকোচ হিসেবেই প্রদত্ত হয় এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের উদ্দেশ্য-সাধনে নবাবের ভূমিকা গ্রহণ নিশ্চিত হয়। এর সাথে সাথে ১৯০৮ সালে তাঁকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং ভাইসরয়ের আইনপরিষদে তাঁর অন্তর্ভুক্তি ঘটে, এর ফলে তাঁর যোগ্যতার মাপকাঠিও প্রসারিত হয়।

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর করার ক্ষেত্রে লর্ড কার্জন কোনো নিয়ম-নীতির ধার ধারেননি। এই বিপুল তাৎপর্যময় পরিবর্তন সম্পর্কে ব্রিটেনে ভারত সচিবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চললেও মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন তিনি নেননি। তদুপরি ভারতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী প্রধান লর্ড কিচেনারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ লেগেই ছিল। বিরোধকালে নিজের অবস্থান নিরঙ্কুশ করতে কার্জন কয়েকবারই পদত্যাগের হুমকি দিয়েছিলেন, ১৯০৫ সালের দ্বিতীয় ভাগে কিচেনারকে কাবু করতে তাঁর দেয়া এমনি এক পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে এবং বিমূঢ় কার্জন তাঁর স্থলাভিষিক্ত নতুন ভাইসরয় না আসা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। বঙ্গভঙ্গকে 'সেটল্ড্ ফ্যাক্ট' ঘোষণা করে সাজ সাজ রব করে চলে কার্জনের প্রস্তুতি। হাতে তাঁর বেশি সময় ছিল না, তড়িঘড়ি ফরমান জারি করে তিনি বিশাল এই কাজ সম্পন্ন করেন। ডিসেম্বরে পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর হাতে ক্ষমতা তথা বঙ্গবিভাজন বুঝিয়ে কার্জন যখন ফিরে এলেন লন্ডনে তখন চ্যারিং ক্রস স্টেশনে তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য রীতি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ও অপরাপর সরকারি প্রতিনিধিরা কেউ উপস্থিত ছিলেন না। ভারত-প্রত্যাগত ভাইসরয়কে আর্ল উপাধি প্রদানের যে রেওয়াজ সেটাও কার্জনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। পর্বতশৃঙ্গের মতো সুউচ্চ প্রত্যাশা জাগিয়ে তিনি ভারতের দণ্ডধর হয়েছিলেন, আর তাঁর প্রস্থান ঘটলো ক্ষুদ্র মূষিকের মতো। তাঁর ঔদ্ধত্য ও অহংবোধ তাঁকে ব্রিটিশ শাসকবৃত্তেও অপাঙ্ক্তেয় করে তুলেছিল, কিন্তু বাংলায় বিভাজনের বিষবৃক্ষের যে বীজ তিনি রোপণ করে এসেছিলেন তার শেকড় উৎপাটনে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, বরং নীতির কতক সংস্কার করে হলেও বহাল থাকে এর মূলধারা।

ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম এলিটদের রাজনীতির ময়দানে নামাবার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে এবং ১৯০৬ সালের অক্টোবরে ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট মুসলিম প্রতিনিধিদল ভাইসরয়

লর্ড মিন্টোর সঙ্গে দেখা করে আসন্ন সংস্কার প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখার দাবি উত্থাপন করেন। স্মারকনামা পেশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-নির্ধারিত জবাব অনুযায়ী ভাইসরয় এর প্রতি সোৎসাহ স্বীকৃতি প্রকাশ করেন। আলীগড় আন্দোলনের প্রবক্তা স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা মোচনের জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি ঘোষণা করেছিলেন এবং এর ভিত্তিতে মুসলিম এলিটরা এতোকাল স্বসম্প্রদায়কে রাজনীতি থেকে বিযুক্ত থাকার পরামর্শ দিয়ে চলেছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সাথে সাথে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সর্ব-ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে বশংবদ মুসলিম পক্ষ দাঁড় করাবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল এবং এবার দ্রুতই তা বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে চললো। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে আলীগরীয় ধারায় ঢাকাতে বাৎসরিক শিক্ষা সম্মেলন শেষে নবাব সলিমউল্লাহর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের সংক্ষিপ্ত বৈঠকে "ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থসমূহ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে" একটি 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়।

১৯০৭ সালের গোড়া থেকে লক্ষ্য করা যায় হিন্দু-মুসলিম বিভাজনকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও সহিংসতার বিস্তার। এর আগে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বিভাজন এমনি সহিংস সংঘাতের রূপ বিশেষ নেয়নি। মার্কিন ঐতিহাসিক জন. আর. ম্যাকলেন-এর পর্যবেক্ষণ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তিনি লিখেছিলেন, "১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন, শুরু থেকেই তার বিচ্ছিন্নতার মতাদর্শ এবং ১৯০৭ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সবই ছিল বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক স্রোতোধারার সৃষ্টি। আজ পিছনে তাকিয়ে বঙ্গভঙ্গকে আধুনিক সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাসে একটি প্রধান বিভাজক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এবং এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যা ১৯৪৭ সালের বাংলা তথা ভারত বিভাগ অপরিহার্য করে তুলেছিল।"

১৯০৭ সাল থেকে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অধ্যায়, ময়মনসিংহ, জামালপুর, কুমিল্লায় যেসব সহিংস ঘটনার অবতারণা হয় তা একটি অভিন্ন চরিত্র প্রকাশ করে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান ফারাককে মুখ্য করে পরস্পরের অভিন্ন স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে গোষ্ঠীচিন্তা ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়, বিভিন্নতাকে কেন্দ্র করে হিংসা ছড়ানো হয় এবং পরিণামে এই হিংসা রক্তাক্ত সংঘাতের রূপ নেয়। এই হিংসা প্রচারের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায় ময়মনসিংহের জনৈক ইবরাহিম খাঁ প্রণীত 'লাল ইশতেহার' নামক চরম সাম্প্রদায়িক প্রচার পুস্তিকায়। ইশতেহারটির ভাষা ও বক্তব্য এতোই নিম্নরুচির ও উস্কানিমূলক ছিল যে ঢাকা সম্মেলন এবং ১৯০৭ সালের মার্চে বরিশালে অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে কয়েকজন মুসলিম নেতা এর প্রচারণা ঠেকাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের স্বদেশী ডাকের বিপরীতে ইশতেহারে বলা হয়, "হে মুসলমানরা, উঠ, জাগো, তোমরা হিন্দুদের সাথে একই স্কুলে পড়ো না, হিন্দুর দোকান হতে কিছু ক্রয় করো না, হিন্দুদের দ্বারা তৈরি কোনো পণ্য স্পর্শ করো না।" তোমরা অজ্ঞ, এই কথা বলে ইশতেহারে জ্ঞানের এক অদ্ভুত মাহাত্ম্য প্রকাশ করে বলা হয়, "যদি জ্ঞান অর্জন করো তবে তোমরা অবিলম্বে

সকল হিন্দুকে জাহান্নামে পাঠাতে পারবে।" এই ইশতেহারের বক্তব্য প্রান্তিক কোনো ব্যক্তির একক প্রচারণা হিসেবে বিবেচনা করা যেত, কিন্তু বঙ্গভঙ্গবিরোধী মুসলিম নেতৃত্বের অন্যতম পুরোধা, নবাব খাজা সলিমউল্লাহ্‌র ডানহাত, বিশিষ্ট নেতা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁর *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকায় এর সংক্ষিপ্ত ভাষ্য প্রকাশ করেন। লাল ইশতেহারকে এমনি মর্যাদা দিয়ে মুসলিম নেতৃত্বের মন-মানসের রূপটি মেলে ধরলেন নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী। এটাও লক্ষণীয়, কুমিল্লায় দাঙ্গা বাঁধে মুসলিম লীগের শাখা গঠনকল্পে সেখানে নবাব সলিমউল্লাহ ও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর আগমনের পরপর। এক্ষেত্রে মুসলিম লীগের মিছিলে হিন্দুদের হামলা পরিচালনার অভিযোগও রয়েছে। যে-পক্ষই দায়ী হোক, সম্প্রীতি-রক্ষায় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের জোরদার প্রচেষ্টা তেমন লক্ষ্য করা যায় না। বরং দেখা যায় জামালপুরের বকশিগঞ্জে দাঙ্গার সময় প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছে, "হে মুসলমান ভাইয়েরা, তোমরা কি জান যে, সরকার এবং নবাব সলিমউল্লাহ সাহেব সম্পূর্ণভাবে আমাদের সমর্থক? সুতরাং, আমরা আর কার পরোয়া করবো?"

বিভাজন ছিল কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পদক্ষেপের মূলে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু থেকেই অর্জন করে অভূতপূর্ব ব্যাপকতা। ভারতবাসীর সামাজিক সচেতনতা ও রাজনৈতিক চেতনা, বিশেষভাবে উনিশ শতকের নবজাগরণের পথ বেয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর বিকাশ, তা সে রেনেসাঁ যত সীমিত ও খণ্ডিত হোক না কেন, এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছিল যে তা আর কোনোভাবেই কংগ্রেস এবং নাগরিক বিত্তবান গোষ্ঠীর আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিতে সীমিত থাকতে পারছিল না। ব্রিটিশ বিরোধিতা কিংবা ব্রিটিশ শাসনের অবসানের কথা তখন পর্যন্ত কেউ ভাবতে পারছিলেন না। যে মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয়েছিল সেই রাজতন্ত্র পুনর্প্রতিষ্ঠার শেষ চেষ্টা সশস্ত্র যুদ্ধের আকারে বিস্ফোরিত হয় সিপাহী বিদ্রোহ তথা প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে, ১৮৫৭ সালে। বিদ্রোহের ব্যর্থ পরিণাম যেমন কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক রাজশাসনের সূচনা করেছিল, তেমনি এটাও নিশ্চিত করেছিল যে ভারত আর তার অতীত রাজতন্ত্রে ফিরে যেতে পারবে না। বিশ শতকের সূচনাকালে নতুন ভারতের তাই কোনো পিছুটান ছিল না, অথচ সামনের লক্ষ্যে পৌঁছবার সামর্থ্য ভারতের রাজনৈতিক অবয়বে তখনও দেখা দেয়নি। ফলে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ছিল জোরদার, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে নব-অর্জিত সক্ষমতার প্রতিফলন ঘটেছিল নানাভাবে; কিন্তু রাজনীতিতে তার প্রকাশ ছিল ক্ষীণ। নতুন শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পেশাজীবী গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক গণসংগ্রামের পথে নিয়ে আসবার ঐতিহাসিক কাজটি করলেন লর্ড কার্জন, তাঁর বঙ্গবিভাজনের মধ্য দিয়ে। বাংলা তথা ভারতবাসীকে তিনি গণরাজনীতির ধারায় প্রবেশের সুযোগ করে দিলেন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্যারিবল্ডি, মাৎসিনি কিংবা আইরিশ বিদ্রোহ দ্বারা যতোই প্রভাবিত হোক, এক অভূতপূর্ব নিজস্বতা নিয়ে বাংলায় এই আন্দোলন বিকশিত হতে শুরু করলো, যে নিজস্বতা সহজেই অর্জন করলো আপন বিশিষ্ট

অভিধা, পরিচিত হলো 'স্বদেশী' আন্দোলন হিসেবে, যে-পরিচিতির কোনো যথাযথ ইংরেজি প্রতিশব্দ আজ অবধি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

১৯০৩ সালে প্রথম যখন কার্জনের বঙ্গবিভাজন পরিকল্পনা ঘোষিত হয় তখন থেকেই এর বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রতিবাদ উত্থিত হচ্ছিল। কিন্তু সরকারের দিক থেকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রকাশ্য উদ্যোগ তেমন দৃশ্যগোচর না হওয়াতে আন্দোলনে ক্রমে ভাটা পড়ে। তবে এই উপলক্ষে জনচিত্তে যে একটা পরিবর্তনের ঢেউ জেগেছিল নানাভাবে তার প্রকাশ মিলছিল। নতুন এই চেতনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কেবল সম্পৃক্ত হননি, তিনি একে নানাভাবে সমৃদ্ধিও যুগিয়েছিলেন, 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রয়েছে তার সার্থক প্রতিফলন। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই প্রবন্ধ প্রথম পাঠ করেন ২২ জুলাই, ১৯০৪ সালে। এই রচনা এমনই আলোড়ন সৃষ্টি করে যে ৩১ জুলাই অপেক্ষকৃত বড় মিলনায়তন কার্জন হলে এর দ্বিতীয় পাঠের আয়োজন হয় দর্শনীর বিনিময়ে। 'ভারতী' পত্রিকার খবরে জানা যায় চার ঘণ্টার মধ্যে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল ১২০০ টিকিট। সমাজের নিজস্বতা অনুধাবন ও অন্তরে ধারণ করে আত্মশক্তিতে জাগরণের বাণী উচ্চারণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "দেশ যখন একদা জাগ্রত হইয়া 'কন্সটিটিউশন্যাল অ্যাজিটেশনে'র রেখা ধরিয়া রাজ্যেশ্বরের দ্বারের মুখে ছুটিয়াছিল, তখন সমস্ত শিক্ষিত সমাজের বুদ্ধিবেগ তাহার মধ্যে ছিল। আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে সেই স্রোতের পথ বাঁক লইবার উপক্রম করিতেছে।... তখন সমস্ত দেশের ঐক্যের মুখ রাজদ্বারেই ছিল।... এখন সে চিরন্তন সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে—এখন সে আত্মশক্তি আত্মচেষ্টার পথে সার্থকতা লাভের দিকে অনিবার্যভাবে চলিবে, কোনো একটা বিশেষ মুষ্টিভিক্ষা বা প্রসাদলাভের দিকে নহে।"

এই যে জাগরণ তা মহাবিক্ষোভে ফেটে পড়লো বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে। ১৯ জুলাই ১৯০৫ ভারত সরকার এক্সট্রা অরডিনারি গেজেটে বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে বিস্তৃত প্রস্তাব প্রকাশ করলে পরের দিন 'বেঙ্গলি' পত্রিকা কালো বর্ডার দিয়ে তা মুদ্রিত করে। আগস্টে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা আসেন এবং ২৫ তারিখে টাউন হলে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন থেকে যে বয়কটের ডাক উঠেছিল তিনি সেটা বিবেচনা করেছেন অনেক প্রসারিত দৃষ্টিতে। বলেছেন, "আমি আমাদের এই বর্তমান উদ্‌যোগটির সম্বন্ধে যদি আনন্দ অনুভব করি তবে তাহার কারণ এই নয় যে তাহাতে ইংরেজের ক্ষতি হইবে, তাহার কারণ সম্পূর্ণরূপে এও নয় যে তাহাতে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের লাভ হইবে... আমি আমাদের অন্তরের লাভের দিকটি দেখিতেছি।... এই উপলক্ষে আমাদের চিত্ত সর্বদা স্বদেশের অভিমুখ হইয়া থাকিবে। আমরা ত্যাগের দ্বারা দুঃখস্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনার করিয়া লইব।"

দেশকে অন্তরের মাঝে স্থান করে দেয়ার এমনি সাধনার কথা ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এবার তা এক সংহত ও পরিব্যাপ্ত সৃজনসাধনার রূপ

অর্জন করলো। অনেক দিক দিয়েই তিনি নিজের পূর্বকার বৃত্ত অতিক্রম করে চলেছিলেন। দেশভাবনা চালিত হয়ে একদা রবীন্দ্রনাথ একজন কাউকে দেশনায়ক হিসেবে স্বীকার করে নেয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন, এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষপাত ছিল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির প্রতি, পরে 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তিনি এই আস্থা অর্পণ করেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। এবার তিনি একটি অভিনব প্রস্তাবনা করে লেখেন, "দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব—তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া চলিব,... তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া দেশকে সম্মানিত করিব।"

রবীন্দ্রনাথ নিছক কবিকল্পনা থেকে এমনি প্রস্তাবনা করেননি, তিনি যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে বিদ্যমান জটিলতা ও সমস্যাগুলো হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং তা' অতিক্রমের পথানুসন্ধান করছিলেন সেটা যেমন এখানে, তেমনি তাঁর পরবর্তী অনেক লেখাতে প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য 'স্বদেশী' আন্দোলনের প্রধান কুশীলবদের অনেকে সমস্যাটিকে স্বীকার করেননি কিংবা অনুধাবন করতে পারেননি, পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন এবং খণ্ডিত জাতিসত্তাকে পূর্ণসত্তা হিসেবে গণ্য করে কর্তব্যপালনে অগ্রসর হয়েছেন। শক্তিমান কিংবা গরিষ্ঠজনের পক্ষ থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল কিংবা লঘিষ্ঠজনের প্রতি উপেক্ষা যে সমাজে অনেক জটিলতার জন্ম দিতে পারে সে শিক্ষাও তো আমরা স্বদেশী আন্দোলন থেকে পাই, সেই উপলব্ধি বহন করে পরে 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরো খোলামেলাভাবে লেখেন, "মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যেতে পারে এই তথ্যটিই ভেবে দেখা দরকার, কে লাগালো সেটা ততো গুরুতর বিষয় নয়।'

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পৃক্তি নানাভাবে ফলবতী হয়েছে এবং এর এক চমকপ্রদ প্রকাশ দেখি রবীন্দ্রনাথের গানে, যা দেশের মানুষকে বিপুলভাবে আলোড়িত করেছিল সেই সময়। ২৫ আগস্ট টাউন হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ পাঠের আগে সমবেতকণ্ঠে পরিবেশিত হয় কবির সদ্যরচিত গান 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। শিলাইদহের বাউল গগন হরকরার গানের সুরে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। স্বদেশের সেই ঘোর দুর্দিনে সুরে ও কথায় এমন আকুল-করা আবেদন ছিল ঐ গানে যে সভাশেষে শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে পুনরায় গীত হয় সেই গান। এরপর একের পর এক স্বদেশপ্রেমমূলক গান লিখে প্রায় যেন আন্দোলনের চারণ কবি হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সময়ের অজস্র গানের মধ্যে রয়েছে 'ও আমার দেশের মাটি', 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে', 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক', 'সার্থক জনম আমার', 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'আমি ভয় করব না, ভয় করব না', 'যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না' ইত্যাদি। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে রচিত এইসব গান কবি হৃদয়ের প্রবল

ভাবোচ্ছ্বাসের স্মারক হয়ে আছে, সেই সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতিকে যুগিয়েছে তুলনারহিত সাঙ্গীতিক সমৃদ্ধি।

১৬ অক্টোবর সিমলা থেকে বঙ্গভঙ্গের ফরমান জারির দিন হিসেবে ধার্য হয়। এদিন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়, আয়োজিত হয় নগ্নপদ শোভাযাত্রা এবং রাখিবন্ধন। নগ্নপদ শোভাযাত্রার এই রীতি পরে পূর্ববঙ্গে আবার ফিরে আসে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিকে কেন্দ্র করে, কিন্তু বিরোধী নানা গোষ্ঠীতে সমাজ বিভক্ত হয়ে গেলেও সম্প্রীতির রাখিবন্ধন উৎসবকে আমরা আর ফিরে পাইনি। রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন নতুন গান, 'বাংলার মাটি, বাংলার জল।'

স্বদেশী আন্দোলনের আরেক ফসল, ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিপরীতে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, সেই প্রচেষ্টার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও সম্পৃক্ত ছিলেন, যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষার সদর্থক দিকগুলো বর্জনের তিনি ছিলেন প্রবল বিরোধী। স্বদেশী শিল্প-উদ্যোগ বিকশিত করার প্রয়াসেও রবীন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন, বয়নশিল্পীদের প্রশিক্ষণের জন্য কুষ্টিয়ায় তিনি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়েও এর ঘাটতির দিকগুলো সম্পর্কে সদা-সতর্ক থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ, এমনকি সংবাদপত্রে কালো বর্ডার দিয়ে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা জারির খবর প্রকাশকে বিদেশি রীতির অন্ধ অনুকরণ হিসেবে তিনি নিন্দিত করেছেন। 'শোকচিহ্ন' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "সম্পাদক মহাশয়, তোমাদের কাগজ হইতে এই কালিমা মুছিয়া ফেল। আজ স্বদেশ হইতে বিদেশ সংসর্গের অনেকগুলো কালিমা প্রক্ষালন করিবার জন্য তোমরা আহ্বান করিতেছ—দেশের অঙ্গে বিদেশী কালী দিয়া নতুন কলঙ্ক আর লেপন করিও না। আমাদের শোক আজ শুভ্র হউক, সংযত হউক, নিরাভরণ হউক—কঠোর ব্রত দ্বারা তাহা আপনাকে সফল করুক, অনাবশ্যক অনুকরণের দ্বারা তাহা দেশে বিদেশে আপনার কৃষ্ণাশ্রুরেখাকে হাস্যকর করিয়া না তুলুক।"

আরো নানাভাবেই রবীন্দ্রনাথ এই সচেষ্টতা দেখিয়েছেন—স্টার, ক্লাসিক, ইউনিক ইত্যাদি নাট্যশালাগুলোর ইংরেজি নাম বর্জন করে তিনি দেশীয় নামগ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন। এতে কেউ কর্ণপাত করেনি, তবে অনেক পরে, ১৯২৪ সালে, শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর নতুন মঞ্চের নাম রেখেছিলেন 'নাট্যমন্দির'।

সম্প্রীতির আহ্বান নানাভাবে জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি দেশপ্রেমের যে গভীর সাধনার কথা বলেছেন সেখানে ভাবমন্দিরে সর্বমানবের প্রতিষ্ঠা কামনা করেছেন। তাই দেখি পশুপতিনাথ বসুর গৃহে বিজয়া সম্মিলনীতে হাজির হয়ে রবীন্দ্রনাথ বিজয়ার সম্ভাষণ কেবল হিন্দুজনের মধ্যে সীমিত রাখাকে অতিক্রম করে 'অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নামাজ পড়িয়া উঠিয়াছে' তাঁকেও সম্ভাষণের আহ্বান জানিয়েছেন।

বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে প্রচলিত ধারণায় অনেক অনালোকিত দিক রয়ে গেছে এবং তার অন্যতম হলো বিভাজন অতিক্রমকারী সম্প্রীতির সাধনায় জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃত্বের অবদান। এঁদের অনেকের নাম আমরা জানি না, জানলেও তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক অবগত নই। এটা খুব কমই জানা রয়েছে যে, ঢাকার নবাব পরিবারের অনেক সদস্য

খাজা সলিমউল্লাহর বিপরীতে অবস্থান নিয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। নবাব পরিবারের একজন খাজা মুহম্মদ আরজু ঢাকায় ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রথমবার্ষিকীতে আয়োজিত বঙ্গভঙ্গবিরোধী সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। নবাব খাজা সলিমউল্লাহর বৈমাত্রেয় ভাই খাজা আতিকুল্লাহ একই বছর কলকাতা কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গ রদের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঐতিহাসিকদের অনেকে নবাব পরিবারের অভ্যন্তরে সম্পত্তিগত বিবাদের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করে একে তুচ্ছ করতে চেয়েছেন; কিন্তু এইসব ঘটনা অভিজাত পরিবারের অভ্যন্তরে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রতিফলন প্রকাশ করেছে। টাঙ্গাইলের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর নিকট পড়শি অপর জমিদার আবদুল হালিম গজনবীও ছিলেন বঙ্গভঙ্গের প্রবল বিরোধী। আবুল হোসেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, দীন মোহাম্মদ, দেদার বক্স, দিলওয়ার হোসেন, আবুল কাশেম ইত্যাদি অনেক নাম আমরা এখানে পাই। জাতীয়তাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক মুসলিম চেতনার এক মহান পুরুষ ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গুনাইউক গ্রামের জমিদারপুত্র ব্যারিস্টার আবদুল রসুল (১৮৭৪-১৯১৭)। অসাধারণ প্রতিভাবান, সমাজ-সচেতন ও দৃঢ়চেতা এই মানুষটির কর্মকাল খুব বিস্তৃত নয়; কিন্তু ঐ স্বল্পসময়েই তিনি বাংলার রাজনীতিতে উদারবাদী গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও দেশপ্রেমের যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন তার কোনো নিকট তুলনা নেই। ১৮৮৮ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে প্রায় কিশোর বয়সে তিনি ইংল্যান্ডে আসেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ এবং এম.এ ডিগ্রি নেয়ার পর তিনি ব্যারিস্টারি পড়েন এবং ১৮৯৮ সালে দেশে ফিরে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন সম্মুখ কাতারের নেতা, বিভিন্ন প্রধান ঘটনাধারায় তাঁর নামোল্লেখ পাওয়া যায়, এর দুই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে গঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ১৩ সদস্য-বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদের তিনি ছিলেন সদস্য এবং ১৯০৬ সালের এপ্রিলে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের তিনি ছিলেন সভাপতি। 'কার্লাইল সার্কুলার' প্রকাশের পর ফিল্ড অ্যান্ড আকাডেমী ক্লাবে আয়োজিত যে-সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঘোষিত হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন ব্যারিস্টার আবদুল রসুল। ১৯০৫ সালে কলকাতার রাজাবাজারে আয়োজিত বিশাল জনসভায় তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের হিন্দু মুসলমানদের মাতৃভূমি একই—বাংলা।' ২৬ অক্টোবর কলকাতার মল্লিকবাজার ট্রামডিপোর কাছে আয়োজিত জনসভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। বঙ্গভঙ্গের প্রথম বার্ষিকীতে, ১৯০৬ সালের অক্টোবরে যে রাখিবন্ধন উৎসবের আয়োজন করা হয় তাতে হিন্দু-মুসলিম মিলনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়, বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়:

"১. সমস্ত বাঙ্গালী নরনারী, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান কাহারও রন্ধনশালায় অগ্নি জ্বলিবে না।

২. বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান সকলে একত্র হইয়া মহাব্রত গ্রহণ করিবেন।

৩. সে দিন সমস্ত বঙ্গবাসী স্নানান্তে পরস্পরের হস্তে 'রাখীবন্ধন' করিবেন। এবং চিরদিন সুখে দুঃখে, পূর্বে পশ্চিমে বঙ্গবাসী সমুদয় হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান পরস্পরের সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন।"

বিজ্ঞপ্তির চৌদ্দজন স্বাক্ষরদাতার মধ্যে তিন মুসলিম সদস্য হলেন আবদুল হালিম গজনবী, গোলাম মাওলা চৌধুরী এবং আবদুল রসুল।

১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল বরিশালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিরূপে ব্যারিস্টার আবদুল রসুল যে ভাষণ দেন তা সারগর্ভ বাগ্মিতার অসাধারণ পরিচয় বহন করে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ইংরেজিতে প্রদত্ত এই ভাষণে তিনি মহামান্য লর্ড কার্জনকে যেভাবে সমালোচনা করেন তা একই সঙ্গে গভীর উপলব্ধি ও প্রবল আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ ঘটায়। তিনি বলেছেন, "ভারতের ভাইসরয় হয়ে আসার পর জ্ঞানবান মানুষ ও মহান রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তিনি সর্বমহলের গুণকীর্তন প্রত্যাশা করেছিলেন, বিরূপ সমালোচনা তিনি কখনো আশা করেননি। ভারতীয় চারিত্র সম্পর্কে তাঁর সামান্যই জানা ছিল, কতক বিরুদ্ধভাবাপন্ন পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতার রিপোর্ট ও ম্যাকলের নিবন্ধে তিনি যেটুকু পড়েছিলেন এর বাইরে বাংলা ও তার জনগণ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না; কিন্তু অচিরে আবিষ্কার করলেন ঘৃণ্য এই বাঙালিরা শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তায় তাঁর নিজ জাতির চেয়ে উন্নত যদি নাও হয় অন্তত সমকক্ষ তো বটে, একটি পদানত জাতি কোনোভাবে শাসক জাতির সমকক্ষ হলে তা ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলে। তাঁর অপ্রিয় পদক্ষেপগুলো বাংলায়ই সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছিল। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এখানে সংবাদপত্র অতীব শক্তিশালী এবং রাজনৈতিকভাবে কলকাতা লন্ডনের মতোই ক্ষমতাবান।" আবদুল রসুলের রাজনৈতিক সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তিনি পদানত জাতির প্রতিনিধি হিসেবে শাসকের সমালোচনা করেননি, বরং সমপর্যায়ের একজন গণতান্ত্রিক বিশ্বনাগরিক হিসেবে প্রতিপক্ষের সমালোচনা করেছেন। তিনি কার্জনের অবিমৃষ্যকারিতার বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, "এ হচ্ছে আরো একটি উদাহরণ কীভাবে নিজেদের শিক্ষা, পারিবারিক পটভূমি ও জীবনে উঁচু অবস্থান সত্ত্বেও কিছু কিছু ইংরেজ ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার পর অধস্তন হিসেবে গণ্য অপর জাতির সঙ্গে আচরণকালে হারিয়ে ফেলে তাদের ন্যায়, বিবেক ও সদাচারবোধ।"

মুসলিম সম্প্রদায়কে অগ্রগতির যে নিশানা দেখিয়েছিলেন আবদুল রসুল সেখানে হীনম্মন্যতার কোনো লেশ ছিল না, সামান্য সুবিধা ও নিম্নপদের কতক সরকারি চাকরির মোহে এক বিশাল সম্প্রদায় নিজেদের বিকিয়ে দেবে, এটা মানতে তিনি রাজি ছিলেন না। তাঁর বক্তব্য মানুষ হিসেবে মুসলমানদের সামনে উচ্চতর বোধ ও সাধনার পথ খুলে দিয়েছিল, যা ছিল সলিমউল্লাহ-কুলের বশংবদ আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেরানির চাকরিতে বাঙালির আসক্তির তীব্র সমালোচনা করে তিনি তাঁদের বাণিজ্যে ব্রতী হতে ডাক দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে, ধর্মবিচারে আরব, পারস্য বা তুরস্কের সঙ্গে ভারতীয়

কিংবা বাংলার মুসলমানদের মিল থাকতে পারে কিন্তু তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ তো এদেশের মাটিতেই প্রোথিত। তাই অভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য মাতৃভূমিতে সকল ধর্ম ও বর্ণের নাগরিকদের একই সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। তিনি বলেন, "আপনারা যদি সবাই মিলে আরব, পারস্য বা তুরস্কে হিজরত করতে প্রস্তুত না থাকেন তবে জানবেন আপনাদের রাজনৈতিক স্বার্থ বাংলার অপরাপর জনগোষ্ঠীর মতো একই থেকে যাবে। 'ভাগ করো ও শাসন করো'র নীতি আমাদের সবার জানা। কিন্তু আমরা বিভক্ত থেকেছি বলে শাসকদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে এমনিভাবে আমাদের শাসন করা। যদিও সরকার অনৈক্য সৃষ্টির জন্য অনেক কিছু করছে, বাংলার জনগণ কায়মনোবাক্যে ঐক্যবদ্ধ থেকে তাদেরকে পদানত করবার সকল আমলাতান্ত্রিক প্রচেষ্টা মোকাবেলা করতে পারবে।"

১৯০৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিপিনচন্দ্র পালের উদ্যোগে ত্রিপুরা পিপলস এসোসিয়েশন কুমিল্লায় ত্রিপুরা জেলা সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে আবদুল রসুল মুসলমানদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, "যাঁরা মনে করেন মুসলমানরা রাজনৈতিক আন্দোলনের গণ্ডির বাইরে শান্তিতে অবস্থান করতে পারবে তাঁরা স্বচ্ছন্দে একথা ভুলে যান যে কত অভাব অসুবিধা ইতোমধ্যেই আপনাদের জীবনে এসে জড়ো হয়েছে এবং দিন দিনই তার মাত্রা বেড়ে চলেছে। কঠিন বাস্তব, সত্যঘটনা ও জীবনের একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই জাতিসমূহের পক্ষে রাজনীতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। একমাত্র নির্বোধ ছাড়া এমন কথা কি কেউ বলতে পারে যে, ভারতের সাত কোটি মুসলমানের জাতীয় ও নৈতিক প্রয়োজন দেশের অবশিষ্ট একুশ কোটি লোকের প্রয়োজন থেকে পৃথক হবে?"

ব্যারিস্টার আবদুল রসুলের কাঙ্ক্ষিত পথে রাজনীতি অগ্রসর হয়নি, সম্প্রীতির চাইতে বিভাজনই পরবর্তীকালে মুখ্য হয়ে উঠেছিল, যদিও মিলন ও সম্প্রীতির ধারা বিভিন্ন সময় সম্ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়ে চলছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় বেশ কিছুকাল পর, ১৯১৬ সালের ২৪ এপ্রিল, বর্ধমানে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মুসলিম লীগ তাদের বার্ষিক অধিবেশনে আবদুল রসুলকে সভাপতি হিসেবে আমন্ত্রণ করে। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের পক্ষে এটা ছিল এক উদার পদক্ষেপ, বোধ করি বর্ধমানের আবুল কাশেম ও অন্যদের প্রভাবে তা সম্ভব হয়েছিল। সভাপতির অভিভাষণে ব্যারিস্টার আবদুল রসুল বলেন, "একটা সময় ছিল যখন স্বধর্মের অনেক মানুষ আমাকে বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করতেন। কতক নেতার বিবেচনায় আমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম সমাজের জন্য ছিল অতি অগ্রসর। আর তাই আমার সঙ্গে কোনো সংস্রব তাঁদের কিংবা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জীবনের সফলতা ও সম্ভাবনা বানচাল করার জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হতো। আমার একমাত্র অপরাধ, যা আমি দেখতে পাই সেটা হলো, আমি ছিলাম কংগ্রেসী। তবে সেটা কী করে অযোগ্যতা হয় আমি বুঝতে নাচার। উত্তর ভারতের কোনো কোনো সংবাদপত্র আরো এগিয়ে গিয়ে আমাকে সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসেবেও অভিহিত করেছে। নিন্দা ও কালিমা-

লেপন সত্ত্বেও আমি আমার চিন্তাধারায় অটল ছিলাম এবং বরাবরের মতো এখনও আমি বলতে চাচ্ছি, আমাদের অভিন্ন মাতৃভূমির কল্যাণসাধনে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মধ্যেই আমাদের মুক্তি নিহিত।"

বড় অকালে মৃত্যুবরণ করেন ব্যারিস্টার আবদুল রসুল। বর্ধমান অভিভাষণের বৎসরকাল পর মাত্র ৪৫ বছর বয়সে একমাত্র কন্যা নাজমা রসুলের বিয়ের পূর্বদিন ১৯১৭ সালের ৩১ জুলাই তাঁর প্রয়াণ ঘটে। তাঁকে স্মরণ রাখার বিভিন্ন চেষ্টা দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের উত্তর কালীবাড়ি মাঠে আয়োজিত হয় ত্রিপুরা জেলা যুব সম্মেলন এবং সম্মেলন মণ্ডপের নাম রাখা হয়েছিল 'রসুল নগর'। ১৯৩২ সালে কলকাতা করপোরেশন রসা রোডের নাম পরিবর্তন করে রাখে 'আবদুল রসুল রোড'। কিন্তু সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিস্তার ও দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব ব্যারিস্টার আবদুল রসুল ও তাঁর সম্প্রীতিমূলক চিন্তাধারাকে বিস্মৃতির অতলে ঠেলে দিয়েছিল। বিভাজনের ধারক খর্ব মানুষেরা ইতিহাসের খলনায়ক হয়ে উপমহাদেশ জুড়ে রক্ত-সংঘাত-হানাহানির যে মাৎস্যন্যায় সৃষ্টি করেছে তার থেকে আমাদের মুক্তি পেতেই হবে। এই মুক্তিপথ রচনায় যাঁরা অবদান রেখেছেন, বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষে তাঁদের যথাযোগ্য মূল্যায়ন এবং তাঁদের শিক্ষাদর্শ বরণ করার মধ্যেই আমরা পেতে পারি শান্তি ও সম্প্রীতির সমাজ গড়বার পথের দিশা, যে কাজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ক্রমেই আরো জরুরি হয়ে উঠেছে।

বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষ পরে অতিক্রান্ত পথের দিকে তাকালে আমরা দেখি বিভাজন ও সহিংসতার রাজনীতি ক্রমান্বয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে অভিনব রাষ্ট্র পাকিস্তান জন্ম নেয়। বিভাজনের আদর্শ মানুষকে যে ক্ষুদ্রতার দিকে ঠেলে দেয় তার জের হিসেবে নবগঠিত পাকিস্তানে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা অচিরে তাদের রাজনৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলে এবং নতুন এক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। মুসলমানরা এক জাতি, এমন এক কাল্পনিক ও বিদ্বেষমূলক তত্ত্বে গা ভাসিয়ে দেয়ার পরিণতিতে বাঙালি মুসলমান সমাজ তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারও হারাতে বসেছিল। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন পূর্ববঙ্গে যে মোহমুক্তির সূচনা ঘটায় তা রূপান্তরিত হয় স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং মহান এক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উদ্ভব হয় গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের। বঙ্গভঙ্গের বিভাজনের আদর্শ থেকে জন্ম নেয় দ্বিজাতিভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তান, আর বঙ্গভঙ্গের সম্প্রীতির আদর্শ ধারণ করে একাত্তরে জন্ম নেয় বাঙালি জাতীয়তাবাদী অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বাংলাদেশ। সাময়িক পশ্চাদপসরণ, পরাজয় কিংবা রুদ্ধতা সত্ত্বেও ইতিহাসের রায় যে মানবতা, সহিষ্ণুতা, উদারতার পক্ষেই ঘোষিত হয়, সেই সত্য আমরা শতবর্ষের পথপরিক্রমণে ফুটে উঠতে দেখি। অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক উদারবাদী বাংলাদেশ ক্রমে আবার সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক মনোভাব দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, অন্ধকারের শক্তির প্রবল আস্ফালন তচনচ করে দিচ্ছে সম্প্রীতির সমাজকে। আজকের অমানিশাতেও আমরা বঙ্গভঙ্গকালে সম্প্রীতির আবাহন ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের

উদয় থেকে পুনর্জাগরণের আস্থা খুঁজে পেতে পারি, বুঝতে পারি ইতিহাস মানবতার দিকে, মিলন ও সম্প্রীতির দিকে, তবে সেজন্য চাই যথাযথ সাধনা—সঙ্কীর্ণতা, কূপমণ্ডুকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম। বঙ্গভঙ্গ ঘিরে বিবাদ-বিসংবাদ-বিতর্কের মধ্যে আমরা দেখতে পাই এই সত্যের উদ্ভাসন।

আবুল হাশিম ও বাঙালির রাষ্ট্রসাধনা

বিশ শতকের বাংলার ইতিহাসের এক তাৎপর্যময় ঘটনাধারার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আবুল হাশিমের নাম, যে-ঘটনাকে অনেক ঐতিহাসিক বলতে চাইছেন 'পাইপ ড্রিম', অহিফেন সেবকের স্বপ্নপুরাণ যার পূর্বাপর প্রভাব বিশেষ ছিল না, অথচ ইতিহাস থেকে সেই ঘটনা কিছুতেই তো মুছে যাওয়ার নয়। ইতিহাস বইয়ে কেউ কেউ বড় জোর ফুটনোট হিসেবে স্থান দিতে চেয়েছেন এই প্রয়াসকে; কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে অন্তত ফুটনোট ছাপিয়ে যেতে চাইছে পরিচ্ছেদকে এবং পরবর্তী ইতিহাস পর্যালোচনা যত গভীর ও বিস্তৃত হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্র হরফের ঐ ফুটনোট দাবি করছে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ, নবতর বিশ্লেষণ। ইতিহাস যখন দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে বিপুল প্রভাবসম্পন্ন পরিবর্তনের দিকে, বাঁধভাঙা জোয়ারের জল ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে সকল স্থিরতা, তখন খড়কুটো দিয়ে সেই স্রোত রুদ্ধ করবার আয়োজনে মেতেছিলেন কতিপয় নেতা, তাঁদের একদিকে ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় এবং অন্যদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম। আরো কারো কারো সম্পৃক্তি ছিল এই প্রয়াসের সঙ্গে, তবে ইতিহাসে তা চিহ্নিত হয়েছে শরৎ বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রচেষ্টা হিসেবে। তবে প্রকৃতপক্ষে তা ছিল বসু-সোহরাওয়ার্দী-হাশিম উদ্যোগ এবং এই তিন উদ্যোক্তাই ছিলেন ইতিহাসের ট্র্যাজিক নায়ক, ভাগ্য তাঁদের নিয়ে খেলেছিল এক নিষ্ঠুর খেলা। ভাগ্যের বরপুত্র হিসেবে রাজনীতিতে তাঁরা নিজেদের আসন করে নিতে পেরেছিলেন জীবনের একেবারে গোড়ায়; কিন্তু রাজনীতির প্রভাবশালী বলয় থেকে ছিটকে পড়তেও তাদের বিশেষ সময় লাগেনি, আর ক্ষমতাবৃত্ত থেকে তাঁদের চ্যুত হওয়ার পেছনে স্বীয় ব্যর্থতার চাইতে পরিস্থিতিগত বৈরিতাই ছিল মূলত দায়ী, যে-কারণে তাঁরা হয়ে উঠলেন ইতিহাসের ট্র্যাজিক চরিত্র।

বিশ শতকের চল্লিশের দশক ভারতীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত তাৎপর্যময় এক পর্ব। দশকের শুরুতে লাহোরে মুসলিম লীগ ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং দশক শেষ হওয়ার আগেই প্রায় দুইশত বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে ব্রিটিশরা ভারত থেকে তাদের সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেয়, উদ্ভব ঘটে দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের আর অবশিষ্টাংশ

স্বাধীন ভারত হিসেবে যাত্রা সূচিত করে। এই পরিবর্তন ঘটবার কার্যকারণের বহু দিক রয়েছে। দেশভাগ বা পার্টিশন নিয়ে লেখালেখি অব্যাহত গতিতে চলছে এবং এর মনোযোগ বড়ভাবে পড়ছে চল্লিশের দশকের বাংলা ও পাঞ্জাবের রাজনীতির উপর। এই পরিবর্তনময়তার মধ্য দিয়ে যে-পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটলো তা সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা বটে। বিস্ময়কর এজন্য যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব নানা ধূম্রজালে ঢাকা পড়ে আছে এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রধারণার জন্ম থেকে তার উদ্ভবের কাল পর্যন্ত সময়ে এ-বিষয়ে কারো কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। ধারণা যে ছিল না সেটা তো লাহোর প্রস্তাবে প্রকাশ পেয়েছে, 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে পরবর্তী ঐতিহাসিকরা একে চিহ্নিত করলেও প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' কথাটির কোনো উল্লেখ ছিল না, বরং ছিল একাধিক রাষ্ট্রের কথা অর্থাৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো একের অধিক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবে। পরে ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে নির্বাচনে বিজয়ের পর সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের নির্বাচিত বিধায়কদের সভায় লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের পশ্চিমাংশ ও পূর্বাংশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে একক পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েমের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাব গ্রহণকালে জিন্নাহর বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম। তিনি পয়েন্ট অব অর্ডারে একাধিক বৈধতার প্রশ্ন তুলেছিলেন। লাহোর প্রস্তাবের 'স্টেটস' কিভাবে এক পাকিস্তান 'স্টেট' হয়ে গেল, সে প্রশ্নও তাঁর ছিল। জিন্নাহ অবশ্য একে টাইপের ভুল বলে এড়াতে চাইছিলেন, পরে আবুল হাশিমের অনুরোধে সভার কার্যবিবরণী খাতা পেশ করেন লিয়াকত আলী খান এবং সেখানে স্পষ্টতই দেখা যায় জিন্নাহর অবস্থান সঠিক ছিল না, খাতায় স্টেটস-ই লেখা রয়েছে। তবে দিল্লির এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম লীগের অসাধারণ নির্বাচনী বিজয়ের পটভূমিকায়, যে-সুবাদে জিন্নাহ তখন হয়ে উঠেছেন ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র, সোল স্পোক্স্ম্যান। ফলে এই বিরোধিতাকে খুব বেশি দূর টেনে নিয়ে যেতে পারেননি আবুল হাশেম। তাঁর জবানি থেকে জানা যায়, তিনি জিন্নাহর আপোষ রফা মেনে নিয়ে লাহোর প্রস্তাবের যথোপযুক্ত সংশোধন করতে সম্মত হন। তবে এই সংশোধন প্রকাশ্য অধিবেশনে পেশ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে গরহাজির থাকেন, অন্তত প্রস্তাব উত্থাপনের গ্লানি যেন তাঁকে পোহাতে না হয়।

পাকিস্তানের জন্মদাতাও যে পাকিস্তান সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ধারণা নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন তা বলা যাবে না। কেবিনেট মিশন ভারতে এসে তিনভাগে বিভাজিত যে ফেডারেল ও অখণ্ড ভারতের প্রস্তাব করেছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তো সেটা মেনে নিতে সম্মত ছিলেন। শেষ মুহূর্তে জওয়াহরলাল নেহরুর অবিমৃষ্যকারিতায় এই প্রস্তাব ভণ্ডুল হয়ে যায়, তবে জিন্নাহর সম্মতি থেকে বোঝা যায় 'পাকিস্তান' প্রস্তাব তার কাছে ছিল দর-কষাকষির একটি অবলম্বন, প্রয়োজনে প্রস্তাব বিসর্জন দিতেও তিনি প্রস্তুত রয়েছেন। জিন্নাহ বিষয়ক আয়েশা জালালের সাম্প্রতিক গবেষণা-গ্রন্থেরও এটাই প্রতিপাদ্য। এমনকি পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর গভর্নর জেনারেল হিসেবে জিন্নাহ যখন করাচি এলেন তখনও

পাক-ভারত দ্বিরাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল ভিন্ন রকম। দেখা যায় ১৯৪৭ সালের মধ্যভাগে জিন্নাহ বোম্বেতে সম্পত্তি ক্রয় করেছেন, বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগ করেছেন। আর বোম্বেতে জিন্নাহর সলিসিটর মোহাম্মদ আলী চাইওয়ালা জানিয়েছেন যে, মালাবার হিলের বাড়ি ও আসবাব জিন্নাহ রেখে গিয়েছিলেন, ইচ্ছে ছিল ফিরে এসে অবসর জীবন আবার এখানে কাটাবেন। এক্ষেত্রে এটাও স্মর্তব্য, দেশভাগের পর সোহরাওয়ার্দী রয়ে গিয়েছিলেন কলকাতা, স্বীয় করণীয় সম্পর্কে তিনি ছিলেন দ্বিধান্বিত, আর আবুল হাশিম দেশান্তরী না হওয়ার পক্ষেই স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ১৯৫০ সালের দাঙ্গা তাঁকে সম্পূর্ণ মুষড়ে দেয় এবং তিনি উদ্বাস্তু হয়ে আসেন ঢাকায়।

পাকিস্তান ধারণাটি ঘিরে যে ধোঁয়াশা বিদ্যমান ছিল তার মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান নিয়েছিলেন আবুল হাশিম। যে জটিল সময়ে এই ধারণা দ্রুত বাস্তব হওয়ার দিকে ধাবিত হচ্ছিল সেখানে কিছু একটা করবার তাগিদ ক্রমে জোরদার হয়ে উঠছিল। পাকিস্তানের ধারণার ছিল একটি মেঠো রূপ, 'হাত যে বিড়ি মু মে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' এই শ্লোগান দিয়ে যে-বিহারি লুম্পেনদের নামানো হয়েছিল ময়দানে, তাদের জন্য ডাইরেক্ট অ্যাকশন তো ছিল প্রত্যক্ষ উস্কানি। এর ফলে কলকাতা শহরে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল সেখান থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যেতে বিলম্ব হয়নি। দাঙ্গার পেছনে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক অবশ্যই ইন্ধন যুগিয়েছিল। অপরদিকে দাঙ্গার বিস্তার মুসলমানদের জন্য বিপুল ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়ে উঠছিল। এরপর দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে প্রথমে নোয়াখালীতে এবং পরে বিহারে। ফলে ব্রিটিশরা ক্ষমতা কাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যাবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে ওঠে; হিন্দু-মুসলমান বিভাজন রেখা বরাবর বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করবার সম্ভাবনা ক্রমে বাস্তব হয়ে উঠতে থাকে। এই পটভূমিকায় বঙ্গবিভাজন রোধ করতে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন সুভাষ বসুর ভ্রাতা কংগ্রেসের নেতা শরৎ বসু। তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম। শেষোক্ত দুইজন এই অবস্থানে এসেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন কারণে, পৃথক অবস্থান থেকে। তবে ব্রিটিশের বিদায় ও স্বাধীনতালাভ যতো ঘনিয়ে আসছিল এর রূপ ও কাঠামো নিয়ে চিন্তাভাবনা ততো বাড়ছিল। বাংলা কীভাবে ভাগ হবে কিংবা আদৌ ভাগ হবে কিনা সেটা হয়ে উঠলো আশু প্রশ্ন। জয়া চ্যাটার্জির *বেঙ্গল ডিভাইডেড* গবেষণা-গ্রন্থে আমরা দেখেছি যে, এই সময় বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব বাংলা বিভাজনের পক্ষে অবস্থান নেয় এবং বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিচয় ও সুবিধা লাভ করে নববিকশিত মুসলিম মধ্যবিত্ত ও গ্রামীণ ভূস্বামী গোষ্ঠী অখণ্ড বাংলার পক্ষে অবস্থান নেয়। এদের বড় অংশের আশা ছিল স্বাধীন বাংলা ভূখণ্ড পাকিস্তানের পূর্বাংশ স্বরূপ কাজ করবে। জিন্নাহর ইঙ্গিতে খাজা নাজিমউদ্দিন গোষ্ঠী যে বাংলা বিভাজনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল তার কারণ ছিল এই বাস্তবতা ও এ-নিয়ে দর-কষাকষির অভিপ্রায়, বিশেষভাবে কলকাতা বন্দর ছিল এই টানাপোড়েনের মূলে। কিন্তু এহেন টালমাটাল পরিস্থিতিতে আবুল হাশিম স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, জয়া চ্যাটার্জি যাকে বলেছেন 'পাইপ ড্রিম', তা

নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রবক্তাদের একটি রাষ্ট্রীয় রূপরেখা দাঁড় করাতে হয়েছিল এবং গবেষকদের জন্য এই রূপরেখা খুবই আগ্রহোদ্দীপক, কেননা এর মধ্য দিয়ে আমরা বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তার এমন এক বাস্তবভিত্তিক পরিচয় পাই যা আগে কখনো দেখা যায়নি।

ব্রিটিশ বিদায়ের দিনক্ষণ যতো ঘনিয়ে আসছিল মুসলিম 'জাতির' স্বতন্ত্র আবাসভূমির ধারণা স্বচ্ছ করে তোলার তাগিদ ততোই বাড়ছিল। এখন পিছন ফিরে তাকালে দেখা যায়, এই স্বতন্ত্র আবাসভূমির ধারণা সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষের কাছেই পরিষ্কার ছিল না, ইংরেজ কর্তৃপক্ষ, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কেউ জানেন না তারা কি চান, কেবল এটুকু জানেন তারা কি চান না। ইংরেজ চায় না ভারতবর্ষ একটি আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে বিকশিত হোক, ভারতের বিভাজন নিয়ে নানারকম খেলায় তাই তাদের বিশেষ পক্ষপাত ছিল। কংগ্রেসের মূল নেতৃত্ব চায় না মুসলিম প্রতিনিধিত্বের দাবিদারদের সঙ্গে ক্ষমতা কোনোভাবে ভাগাভাগি করে নিতে এবং মুসলিম লীগ নেতৃত্ব চায় না হিন্দুদের প্রাধান্যসম্পন্ন কোনো ধরনের স্বাধীন ভারত। ফলে এক জটিল সময়ে প্রবেশ করেছিল পরাধীন ভারত এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রায় পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল স্ব স্ব গণ্ডিবদ্ধ জীবনের সঙ্কীর্ণ চিন্তা দ্বারা। এহেন পরিস্থিতিতে, ঘটনা যখন অমোঘ পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে, তখন খুব অল্প সময়ের জন্য এক আলোকচ্ছটার মতো জ্বলে উঠেছিল শরৎ বসু-আবুল হাশিম সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবি। এই দাবি শুরু থেকেই ব্যর্থতার পরিণাম ললাটে ধারণ করেছিল। শরৎ বসু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলীয় সংসদীয় নেতা হলেও দলের অভ্যন্তরে তাঁর অবস্থান ছিল নাজুক। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারিতে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের পার্টিশনমুখী নীতির প্রতিবাদে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। অপরদিকে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি হওয়ার বাসনায় আবুল হাশিম নির্বাচনে প্রার্থী হলে সোহরাওয়ার্দী তাঁকে সমর্থন না করাতে তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে ছুটির দরখাস্ত করে সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে কার্যত রেহাই নিয়ে চলে গিয়েছিলেন বর্ধমান। এপ্রিলের শেষে কলকাতায় ফিরে তিনি যখন শরৎ বসুর অখণ্ড বাংলার উদ্যোগে শামিল হলেন ততোক্ষণে গঙ্গা নদী দিয়ে জল গড়িয়ে গেছে অনেক। অখণ্ড বাংলার প্রচেষ্টায় প্রাদেশিক কংগ্রেসকে শামিল করতে পারেননি শরৎ বসু, জয়া চ্যাটার্জির বিশ্লেষণ থেকে আমরা দেখতে পাই বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের উদারবাদী আধুনিকতা ফানুসের মতো উবে গিয়েছিল শ্রেণীস্বার্থ তথা ভূসম্পত্তির অধিকার রক্ষার প্রবল তাড়নায়। কংগ্রেস হাই কম্যান্ড তথা নেহরু-প্যাটেল এই উদ্যোগে খুঁজে পেয়েছিলেন বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে দ্বিতীয় আরেক 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র। আর মুসলিম লীগ নেতৃত্ব আবুল হাশিম-সোহরাওয়ার্দীর প্রয়াসের বিভিন্ন দিক তলিয়ে না দেখে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার চাপিয়ে দেয়ার সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে একে বিবেচনা করেছিল। ফলে বিভিন্ন স্বার্থের সম্মিলনে একেবারে স্বল্পকালের জন্য হলেও অখণ্ড স্বাধীন বাংলা একটি বাস্তব সম্ভাবনা হয়ে উঠেছিল। এর

পেছনে সমর্থন এসেছিল মুসলিম লীগের, যদিও কারণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমনকি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও তাঁর সম্মতি ব্যক্ত করেছিলেন, আরো একবার যা প্রমাণ করে, জিন্নাহর পাকিস্তান-ধারণা কোনো নিরেট অপরিবর্তনীয় আদর্শ ছিল না। মহাত্মা গান্ধী সোদপুর আশ্রমে বসু-হাশিম-সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা শেষে পরিকল্পনার প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেন। হালফিল দলিলপত্রে দেখা যায়, বাংলার গভর্নর বারোজও ছিলেন এই পরিকল্পনায় পক্ষে। কিন্তু অখণ্ড স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনা উবে যেতে বিশেষ সময় লাগেনি, কেননা অবিশ্বাস ও বিভাজন ভারতীয় তথা বাংলার রাজনীতির এতো গভীর প্রবেশ করেছিল যে, আকস্মিক উদ্যোগে তার সমাধান হওয়ার ছিল না। তদুপরি এর প্রতি যেটুকু সমর্থন ছিল তা এসেছিল পরস্পরবিরোধী মহল থেকে, নিজস্ব ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ভূত হয়ে।

তবুও ১৯৪৬ সালের ২০ মে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য শরৎ বসু-আবুল হাশিম যে পাঁচ-দফা চুক্তিনামা প্রণয়ন করেন তা বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও রাষ্ট্রধারণায় এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হয়ে আছে। এই প্রস্তাবনার মূল ভিত্তি হচ্ছে সম্প্রীতি, একটি জাতির অভ্যন্তরে যে ভিন্নতা রয়েছে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গঠনের অভিপ্রায় এই চুক্তিতে ব্যক্ত হয়েছিল। লক্ষণীয় যে, অত্যন্ত তাড়াহুড়োর মধ্যে প্রণীত এই চুক্তিতে এর আদর্শগত ভিত্তি উল্লিখিত হয়নি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার দিকটিই গুরুত্ব পেয়েছিল বেশি। মহাত্মা গান্ধীর কাছে প্রস্তাবের খসড়া পাঠানো হলে তিনি চট করে এদিকটি শনাক্ত করে মন্তব্য করেন, খসড়া চুক্তিটিতে স্বীকৃতি থাকতে হবে যে, বাংলার একটি সাধারণ সংস্কৃতি আছে এবং তার মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা। ২৪ মে প্রেরিত গান্ধীর এই পত্রের জবাবে ২৬ মে শরৎ বসু লেখেন, "বাংলার সংস্কৃতি ও মাতৃভাষা এক এবং আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলেই সে ভিত্তির ব্যাপারে একমত।"

অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠাকালের বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছিল এখানে রাষ্ট্রচিন্তার ভিন্নতর উপাদান নিহিত ছিল, তবে উদ্যোক্তারাও যে-বিষয়টি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন তা বলা যাবে না। বাংলার ইতিহাসের এই ক্রান্তিকাল বিষয়ে ড. এ. এম. হারুনুর রশীদ লিখেছেন তাৎপর্যময় গ্রন্থ, *দা ফোরশ্যাডোয়িং অব বাংলাদেশ* এবং তাঁর কাছে এটা বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে এমন এক রাষ্ট্রচিন্তা অন্তরে লালন করলেও সোহরাওয়ার্দী কিংবা হাশিম তা নিয়ে আগে কখনো প্রকাশ্য হননি।

সোহরাওয়ার্দী-হাশিম কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অখণ্ড স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তারও কোনো সরল জবাব নেই, বদরুদ্দীন উমর অবশ্য উদ্বেল হয়ে বলবার চেষ্টা করেছেন যে, কংগ্রেসী হিন্দুরা যখন হয়ে গেলেন সাম্প্রদায়িক, শরৎ বসুর মতো ব্যক্তিরা জাতীয়তাবাদী হিন্দু তখন আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতারা হন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক। এক্ষেত্রে সমাজে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব ও বিবিধ জটিলতা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। এই জটিলতার কারণে শরৎ বসু অখণ্ড বাংলা-পরিকল্পনায় নির্ভর করতে চাইছিলেন পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত নেতৃত্বের ওপর, কেননা বাংলা ভাগ হলে

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান যে টলে উঠবে সেটা বুঝলে তাঁরা বিভাজন চাইবেন না, এমন প্রত্যাশা ছিল শরৎ বসুর। অপরদিকে সোহরাওয়ার্দী ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং অখণ্ড বাংলায় তাঁর অবস্থান যে আরো দৃঢ় হবে সে তো বলাই বাহুল্য, খণ্ডিত বাংলায় তিনি কি করবেন সেটা তারও ভালোভাবে জানা ছিল না। অপরদিকে আবুল হাশিম যখন দু'মাসের নীরবতার অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন বাংলার পক্ষে সোচ্চার হলেন, ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭ তারিখের সেই বিবৃতিতে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ও জাতীয় চেতনার জয় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "ভ্রাতৃহত্যা কোনদিন কোন দেশকে প্রগতির পথে অগ্রসর করিতে পারে না, চিন্তা ও অনুভূতিতে বিপ্লব সৃষ্টিই প্রকৃত বিপ্লব। বাংলাকে তাহার হীনম্মন্যতাবোধের ও পরাজিতের মনোভাব পরিহার করিয়া অতীত ঐতিহ্য পুনরানুসরণ করিতে হইবে এবং প্রতিভার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করিতে হইবে। গভীর চিন্তার জগতে ভাবাবেগের স্থান নেই। সাময়িক উন্মাদনাকে ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করিতে দেয়া উচিত হবে না। বাংলা আজ এমন দুইটি রাস্তার সংযোগ-স্থলে আসিয়া উপনীত হইয়াছে যাহার একটি গিয়াছে স্বাধীনতার ও গৌরবের দিকে, আর অপরটি গিয়াছে চিরদাসত্ব ও হীনতার দিকে।"

এই বিবৃতিতে আবুল হাশিম মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা হওয়ার সঙ্কীর্ণতা পেরিয়ে আবেদন জানান গোটা জাতির প্রতি, তিনি বলেন, "বাংলার হিন্দু ও মুসলমান যুবকদিগকে অবশ্যই একতাবদ্ধ হইতে হইবে এবং মাতৃভূমিকে বহির্প্রভাবের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া বাংলার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারকরতঃ ইহাকে ভারতের তথা বিশ্বের ভবিষ্যৎ জাতিসংঘে সমস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।... নিজেদের সত্তা বজায় রাখিয়া সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারা বাংলার প্রকৃতি ও আবহাওয়ার সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া হিন্দু-মুসলমান এক আশ্চর্য কৃষ্টি এবং ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে যে কোনো জাতির দানের সঙ্গে তাহার তুলনা চলে।"

আবুল হাশিমের এই বিবৃতি দক্ষিণপন্থী মুসলিম নেতাদের দ্বারা প্রবলভাবে সমালোচিত হয় এবং তীব্র বাধার মুখে আবুল হাশিম পিছিয়ে এসে তাঁর অবস্থানের ব্যাখ্যায় ইসলামের আদর্শ ও লাহোর প্রস্তাবের দোহাই দেন। হিন্দু-মুসলিমের মিলিত রাষ্ট্রের বদলে তিনি এখন প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকার যুক্তি মেলে ধরেন, যে-যুক্তি হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে কোনো আবেদন রাখতে পারে না। পরবর্তী এই বিবৃতিতে আবুল হাশিম বলেন, "আমার স্বদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আমার যে দাবী, তাহা ইসলামের আদর্শের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যথার্থরূপে লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী।" নিজেকে বাঙালির মুখপাত্র হিসেবে স্থাপন করবার কোনো প্রচেষ্টা আর তাঁর মধ্যে দেখা যায় না, এমনকি তিনি যে বাংলার ৫৪ শতাংশ মুসলমানের পক্ষে কথা বলবার যোগ্যতাও রাখেন না, সেটা উল্লেখ করে নিজেকে ছোট মাপের করে তুলে তিনি বলেন, "একটি শিশুও জানে যে মুসলিম রাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব অথবা

সিন্ধুর, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতের মুসলমানদের কথা কহিবার একমাত্র অধিকার আছে কায়েদে আজমের।"

বাংলার রাজনীতির জটিল ইতিহাসে খুব স্বল্পসময়ের জন্য ঝলসে উঠেছিলেন আবুল হাশিম, সেই ঝলসানি অন্ধকার দূর করতে পারেনি, দুর্গত সেই সময়ে আলোরবাহকেরাও খানাখন্দে পা দিয়ে হড়কে পড়েছিল, তাদের অনেকের পক্ষে আর উঠে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি। ইতিহাসের নিষ্ঠুর পথচলা তাদের অনেকের ব্যক্তিজীবনও তচনচ করে দিয়েছিল, যেমন ঘটেছিল পঞ্চাশের দাঙ্গায় আক্রান্ত আবুল হাশিমের ক্ষেত্রে। জয় হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের, পরাক্রমী রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল পাকিস্তান, ১২০০ মাইলের ব্যবধান নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসের কিম্ভূততম এক রাষ্ট্র। কিন্তু ইতিহাসের রয়েছে আরেক গতি, তারই প্রকাশ হিসেবে ১৯৭১ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক তথাকথিত ধর্মরাষ্ট্রের জাতিসত্তা পীড়নমূলক অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবসান ঘটিয়ে আবির্ভূত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের, লাহোর প্রস্তাবের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার মেকিত্ব ঘুচিয়ে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তার জয় ঘোষণাকারী রাষ্ট্র, আদর্শগতভাবে এর মিল ১৯৪৬-৪৭ সালের অখণ্ড বাংলার ঘোষিত আদর্শের সঙ্গে অনেক বেশি। ফলে, আপাতদৃষ্টিতে পরাজিত হয়েছিলেন আবুল হাশিম; কিন্তু ইতিহাসের পথপরিক্রমণ তাঁর চিন্তা-চেতনার জয় ঘোষণা করেছিল, যদিও তিনি নিজেও সেই চিন্তায় অটল ও নিরাপোষ ছিলেন না।

তিনটি পদযাত্রা ও একজন গান্ধী

মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে শতবর্ষ আগে দক্ষিণ আফ্রিকায়, এক ব্যতিক্রমী ভিন্নধর্মী রাজনৈতিক গণসংগ্রাম হিসেবে যা এরপর বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং গোটা পৃথিবীর মানুষকে আলোড়িত করে ও যোগায় নতুন পথের দিশা। দক্ষিণ আফ্রিকায় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যখন সত্যাগ্রহের সূচনা করেন তখন তিনি স্বল্পখ্যাত এক ব্যারিস্টার, বিলেত থেকে ফিরে বোম্বেতে আইনের ব্যবসা শুরু করে খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারেননি, এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসরত ভারতীয়দের আমন্ত্রণে ২৪ বছর বয়সে ১৮৯৩ সালে তিনি সেখানে আসেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে বিভিন্ন ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে তাঁর বিশ্ববীক্ষণ ও রাজনৈতিক চিন্তা বিকশিত হতে থাকে। অবশেষে ১৯১৪ সালে তিনি যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি এক ভিন্নতর ব্যক্তিত্ব, বলা হয়ে থাকে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠিয়েছিল মোহনদাস করমচাঁদকে, আর দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতে ফেরৎ পাঠায় মহাত্মা গান্ধীকে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় পা দিয়ে ডারবান থেকে প্রিটোরিয়া যাওয়ার রেল ভ্রমণকালে গান্ধী বর্ণবাদী সমাজের পীড়ন ও অপমানের যে পরিচয় পান মারিৎজবুর্গ স্টেশনে, প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে মালামালসহ তাঁকে নামিয়ে দেয়া হয় প্ল্যাটফর্মে, কেননা ভারতীয় ও কৃষ্ণাঙ্গদের প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের অধিকার নেই, সেটা তাঁর জন্য ছিল এক নির্মম অভিজ্ঞতা। রিচার্ড অ্যাটেনবোরোর 'গান্ধী' চলচ্চিত্রের কল্যাণে সে-ছবি অনেকের মনে আঁকা রয়েছে। এহেন দক্ষিণ আফ্রিকায় মোহনদাস গান্ধী ভারতীয়দের বিভিন্ন ধরনের অধিকার আদায়ের আইনি লড়াইয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠেন, আইনজীবী হিসেবে পসার ও প্রতিষ্ঠা দুই-ই তাঁর অর্জিত হয়। এমনকি বুয়র যুদ্ধে তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ নিতে দ্বিধা করেননি। তাঁর একটি ধারণা ছিল গণতন্ত্রের পীঠস্থান ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠীর দেয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যুদ্ধশেষে ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত হবে; কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতি বরং আরো অবনতির দিকে ধাবিত হয়। ভারতীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ ও নাগরিক অধিকার অনেকাংশে সঙ্কুচিত হয় এবং বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশনের বিধান প্রবর্তিত হয়। ইতোমধ্যে গান্ধীর জীবনাচারে কতক বিশিষ্ট লক্ষণ ফুটে উঠতে

থাকে, তিনি যে সরল নিরাড়ম্বর জীবনের পক্ষপাতী সেটা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। *ইন্ডিয়ান অপিনিয়ন* নামে যে-পত্রিকার সঙ্গে তিনি জড়িত তার প্রকাশনার কেন্দ্র ডারবান থেকে ১৪ মাইল দূরে ফিনিক্স কৃষিখামারে স্থানান্তর করেন যেখানে সকলে কায়িক পরিশ্রম করবে এবং কৃষি উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রইবে। একথা ঠিক পেশাগত ও সামাজিক কাজের চাপে ফিনিক্স কৃষিখামারে গান্ধী খুব বেশিদিন অবস্থান করতে পারেননি এবং অচিরেই ফিরে আসেন জোহানেসবার্গে, তবে এই অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী জীবনের জন্য বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হয়েছিল।

ইতোমধ্যে ১৯০৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এসে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থান আরো কোণঠাসা হয়ে পড়ে। সেই বছরের আগস্টে ট্রান্সভাল কর্তৃপক্ষ যে আইন জারি করে তার ফলে আট বছরের বেশি বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত সকল নারী-পুরুষ-শিশুর জন্য রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়। রাস্তাঘাটে যখন যেখানে খুশি রেজিস্ট্রির কাগজপত্র পরীক্ষা করার কর্তৃত্ব দেয়া হয় পুলিশকে। ব্যারিস্টার মোহনদাস গান্ধী, দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসরত ভারতীয়দের অগ্রণী নেতা, আইনের পথে রাজনৈতিক সংগ্রাম করবার বিশেষ পক্ষপাতী, এবার বড় ধরনের নৈতিক সঙ্কটের মুখোমুখি হলেন, আইনের পথে যে সংগ্রাম সেটা কোন্ রূপ নেবে যখন রাষ্ট্র স্বয়ং হয়ে ওঠে নাগরিকদের প্রতি চরমভাবে বৈষম্যমূলক অন্যায় আইনের প্রবর্তক ও রক্ষক। এই অন্যায় বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে কীভাবে আন্দোলন পরিচালনা করা হবে সেটা ছিল বড় জিজ্ঞাসা। ১৯০৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জোহানেসবার্গের এম্পায়ার থিয়েটারে এই উপলক্ষে এক সভা আহ্বান করা হয়। জনাকীর্ণ সেই সভার এক পর্যায়ে ভারতীয় মুসলিম ব্যবসায়ী মুহাম্মদ কাচালিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলেন যে, আমি আল্লাহর নামে শপথ নিচ্ছি এমন অন্যায় আইনের কাছে আমি কখনো নতি স্বীকার করবো না। তাঁর এই বক্তব্যে চকিতে গান্ধী যেন দেখতে পান আলোর ইশারা। অন্যায় আইন প্রতিরোধে স্রষ্টার নামে শপথ নেয়ার মধ্যে গান্ধী দেখতে পেয়েছিলেন ব্যক্তির প্রতিরোধ চেতনার অপূর্ব বহির্প্রকাশ। এখান থেকেই বিকশিত হলো তাঁর অহিংস প্রতিরোধের ধারণা, অসীম দুঃখ-কষ্ট বরণ করেও আন্দোলনে অবিচল থাকা, সর্বদা অহিংস পন্থা অনুসরণ এবং এমনকি শত্রুর বিরুদ্ধেও ঘৃণা পোষণ না করে তার অন্তরে সদ্‌ভাবনার বিকাশ কামনা করার নীতি। সেদিনের সভায় সকলে মিলে শপথ নেয় অহিংস প্রতিরোধ রচনার, অন্যায় আইনকে স্বীকার না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এজন্য যে-কোনো অত্যাচার বরণের প্রত্যয় সবাই ব্যক্ত করেন। এই আন্দোলনের পরিচয় হিসেবে বেছে নেয়া হয় 'সত্যাগ্রহ' শব্দটি। পরে গান্ধী বলেছিলেন যে, এম্পায়ার থিয়েটারের ঐ দিনের ঘটনার পাশাপাশি আর যেসব প্রভাব সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ওপর পড়েছিল তা হলো ভগবদ্‌গীতা ও বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট পাঠ এবং টলস্টয়ের *কিংডম অব গড ইজ উইথিন ইউ* গ্রন্থ। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে তিনি যখন ফিনিক্স ফার্ম গড়ে তোলেন এবং কায়িক শ্রম ও অপরিগ্রহ নীতি বা সরল জীবনচর্চার সূচনা করেন তখন জন রাসকিনের *আনটো দি লাস্ট* গ্রন্থপাঠ দ্বারা বিশেষ অনুপ্রাণিত বোধ করেছিলেন।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে সত্যাগ্রহ পরিচালনার সিদ্ধান্ত বাস্তব আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করলো এবং রেজিস্ট্রেশন করতে ব্যর্থতার কারণে গান্ধী ও তাঁর দেড় শতাধিক সত্যাগ্রহী সাথীকে ট্রান্সভাল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। বলা বাহুল্য, এই অন্যায় আদেশ পালন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাঁরা স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন এবং সত্যাগ্রহের নৈতিক শক্তিময়তার দিকটি মেলে ধরেন। অহিংস পন্থায় পরিচালিত যে আইন অমান্য আন্দোলন পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান উপাদান হয়ে ওঠে তার শুরু হয়েছিল এভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকাতে।

কারামুক্তির পর এই পর্যায়ে গান্ধী টলস্টয় ফার্মের পত্তন ঘটান যেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলার সাধনার মধ্য দিয়ে জীবনকে সবরকম বাহুল্য ও ভোগবাদিতার বাইরে বৃহত্তর মানবসত্তার সঙ্গে সমন্বিতভাবে বরণ করার চেষ্টা চলে। এই চেষ্টা নিছক তপোবনবাসীর সাধনা ছিল না, ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে পীড়ন-বঞ্চনা-বৈষম্যের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহী সংগ্রামের ধারাকে পুষ্ট করবার অবলম্বন। এই টলস্টয় আশ্রমের সদস্যরা পরবর্তী সত্যাগ্রহ আন্দোলনে জোরদার শক্তি হয়ে উঠেছিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা থেকেই পরে ভারতে ফিরে গান্ধী প্রতিষ্ঠা করেন সবরমতী আশ্রম, সত্যাগ্রহী কর্মী বা মানুষ তৈরির শিক্ষালয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহী আন্দোলনের পরবর্তী পর্বে গান্ধী আরেক অভিনব আন্দোলনের সূচনা করেন, রেজিস্ট্রেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে ভারতীয় খনি শ্রমিকদের নিম্ন মজুরির প্রশ্ন যুক্ত হয় এবং তাঁদের নিয়ে তিনি নিউক্যাসলের খনি এলাকা থেকে পদযাত্রা শুরু করেন। প্রায় দু'হাজার শ্রমিকের এই পদযাত্রায় ট্রান্সভাল প্রবেশের মুখে গান্ধী ও অন্যদের গ্রেফতার করা হলেও সত্যাগ্রহীদের নিরস্ত করা যায়নি। বালফোর স্টেশনে পৌঁছলে খনিশ্রমিকদেরও গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের নাটাল ফেরৎ পাঠানোর জন্য তিনটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা হয়; কিন্তু শ্রমিকরা গান্ধীভাইয়ের সম্মতি ছাড়া ট্রেনে উঠতে অস্বীকার করে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার খনি শ্রমিকদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। এই পদযাত্রা সম্পর্কে তৎকালীন *সানডে পোস্ট* পত্রিকা লিখেছিল, "যে তীর্থযাত্রীদের গান্ধী নেতৃত্ব দিচ্ছেন তার সদস্যরা দেখতে বেশ চিত্রগুণসম্পন্ন। সাদা চোখে দেখলে এরা বেশ দুর্বল, বলা যায় অতিশয় কৃশ, এদের পাগুলো খ্যাংরাকাঠির মতো; কিন্তু প্রায় উপোস থাকার মতো যৎসামান্য আহার নিয়ে এদের পদযাত্রা দেখিয়ে দিচ্ছে এরা কতো বিপুলভাবে কষ্টসহিষ্ণু।"

পদযাত্রীদের যে বর্ণনা সানডে পোস্ট পত্রিকা দিয়েছিল তার সঙ্গে জীবনের উপান্তে এসে নোয়াখালীতে পরিচালিত গান্ধীর প্রায় একক পদযাত্রার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এবারকার পদযাত্রীও নিঃসন্দেহে বেশ দুর্বল, দেখতে অতিশয় কৃশ, পা দুটি খ্যাংরাকাঠির মতোই, তবে অন্তরের শক্তিতে বলীয়ান কী পরিমাণ কষ্টসহিষ্ণু তিনি সেটা অনুমান করাও প্রায় দুঃসাধ্য। সত্তরোর্ধ্ব একজন মানুষ যে পল্লীর পথে এভাবে হেঁটে যেতে পারেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং সেই মানুষটি যে একজন জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব সেটা এক অবিশ্বাস্য কাহিনী।

দক্ষিণ আফ্রিকার পর মহাত্মা গান্ধী তাঁর এই পদযাত্রার আরেক বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ সকালে যখন তিনি লবণ সত্যাগ্রহের সূচনা করে সবরমতী আশ্রম থেকে ডান্ডির সমুদ্র উপকূলের উদ্দেশে ২৪১ মাইল দীর্ঘ যাত্রা শুরু করেন। ইতিহাসে এই পদযাত্রা ডান্ডি মার্চ বা লবণ পদযাত্রা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আশ্রম ত্যাগের আগে গান্ধী প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছিলেন যে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর সবরমতী আশ্রমে ফিরবেন না। বাস্তবেও তাই ঘটেছিল, তিনি আর ফেরেননি সেখানে।

গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক চেতনাকে কতক মৌলিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ওপর স্থাপন করেছিলেন, ফলে প্রচলিত ধারার রাজনীতিতে ভিন্নতর প্রবাহ সৃষ্টি করতে ছিলেন বিশেষ পারঙ্গম। লবণ উৎপাদনের ওপর করারোপ নিয়ে যে জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে সেটা গান্ধী ছাড়া আর কারো পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল না। কেননা গান্ধী এখানে দেখতে পেয়েছিলেন দেশবাসীর প্রতীকী প্রতিবাদের সুযোগ, লবণ উৎপাদন প্রক্রিয়া হয়তো সমুদ্র-উপকূলের নির্দিষ্ট কতক ক্ষেত্রে কিংবা কতক খনিতে সীমাবদ্ধ কিন্তু প্রতিদিনের আহারে যৎসামান্য লবণের প্রয়োজন তো প্রতিটি ভারতবাসীর রয়েছে। অবশ্য সবার রইলেও গান্ধীর সেই প্রয়োজন ছিল না, কেননা ছয় বছর আগে সংযমী জীবনসাধনার অঙ্গ হিসেবে তিনি লবণ গ্রহণ ছেড়ে দিয়েছিলেন। অপরিগ্রহ কিংবা অসংগ্রহের যে জীবনসাধনা তাঁর, দক্ষিণ-আফ্রিকাতে যার সূচনা, সেই ধারাতেই তিনি আহারে লবণ বর্জন করেছিলেন। লবণ পদযাত্রায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইনকে এক পত্রে গান্ধী ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসসহ অন্যসব দাবির সম্মানজনক সুরাহা কামনা করে পত্র লিখলেন। আরউইন এর জবাবে দুঃখ প্রকাশ করে লিখলেন যে, মিস্টার গান্ধী এমন এক কর্মপন্থার কথা ভাবছেন যা আইনের লংঘন ঘটাবে এবং জনজীবনের শান্তি বিঘ্নিত করবে। ব্যক্তিগতভাবে আরউইন অবশ্য মনে করতেন গান্ধীর পক্ষে এতো দীর্ঘ পদযাত্রা পরিচালনা সম্ভব হবে না এবং ভারত সচিবকে লিখিত পত্রে জানান যে, গান্ধীর স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো না, এ ক্ষেত্রে দৈনিক পদযাত্রা অব্যাহত রাখলে তিনি নির্ঘাত মারা পড়বেন এবং 'সেক্ষেত্রে সমস্যার আনন্দময় সমাধান ঘটবে।'

পঁচিশ দিনের পদযাত্রা শেষে গান্ধী যখন পৌঁছলেন ডান্ডির সমুদ্র-উপকূলে, এক মুঠো লবণ হাতে তুলে নিয়ে আইন অমান্যের প্রতীকী ব্যঞ্জনা প্রকাশ করলেন, ততোদিনে গোটা ভারত ও ব্রিটেন জুড়ে আলোড়ন তুলেছে সেই পদযাত্রা। আটাত্তর জন সাথী নিয়ে যে যাত্রা সূচিত হয়েছিল তাতে যোগ দিয়েছে হাজার হাজার মানুষ। সেই সাথে দেশে ও দেশের বাইরে অগণিত মানুষ অন্তর থেকে শামিল হয়েছে এই পদযাত্রায়। নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের এমনি অপরূপ মিলন যে গণআন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল তা ব্রিটিশ সরকারকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করে। প্রত্যাহার করা হলো লবণ আইন এবং কারাবন্দি গান্ধীকে মুক্তি দিয়ে রাজনৈতিক সংলাপের পথ উন্মুক্ত করা হলো।

পদযাত্রাকে রাজনৈতিক সংগ্রামের অংশ করেছিলেন গান্ধী, সত্যাগ্রহের নীতির মধ্যে সত্য, সুন্দর, ন্যায় ও মানবতার পক্ষে ব্যক্তিমানুষের অবস্থান গ্রহণের যে উপাদান নিহিত

তার যৌথ রূপ পদযাত্রায় সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে; কিন্তু সত্যাগ্রহ একেবারে মূলে মানুষের ব্যক্তিগত একক সাধনার বিষয়। মানুষকে সত্যাগ্রহী হয়ে উঠতে হয়, আর এই হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় তাঁকে ত্যাগ-তিতিক্ষার অনেক সাধনার পথ পেরোতে হয়, মানবের জন্য অপার ভালোবাসা ও সত্যের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান অন্তরে ধারণ করতে হয়। আন্দোলনের নাম-পরিচয় যখন তিনি খুঁজছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় মগনলাল গান্ধী তখন 'সদাগ্রহ' অর্থাৎ সদ্‌কর্মের প্রতি আগ্রহ কথাটি প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু আরো ব্যাপক অর্থবহ হিসেবে গান্ধী 'সত্যাগ্রহ'-কে বেছে নিয়েছিলেন। এই সত্যাগ্রহে কেউ যোগ দিতে পারে না, যেমন পারে কোনো রাজনৈতিক গণসংগ্রামে, মিছিলে বা সমাবেশে যোগ দিতে। একজনকে সত্যাগ্রহী হয়ে উঠতে হয়, আর তাই তো দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে গান্ধী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সবরমতী আশ্রম, সত্যাগ্রহী হয়ে ওঠার শিক্ষালয়। তো এই সত্যাগ্রহ ও পদযাত্রার শ্রেষ্ঠ সমন্বয় গান্ধী ঘটিয়েছিলেন ১৯৪৬-৪৭ সালে দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালীর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাঁর পরিক্রমণে।

১৯৪৬ সালের মধ্য-আগস্টে কলকাতায় যে দাঙ্গার সূত্রপাত, রক্তঝরা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ও হানাহানির চক্র যেন চালু করে দিয়েছিল। ১০ অক্টোবর দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লো দূর নোয়াখালীর গ্রামে, আগুনে ঝলসে যায় কয়েক হাজার গৃহ, লুণ্ঠিত হয় সম্পদ, অত্যাচারিত হয় নারীরা, বলপূর্বক ধর্মান্তরণের ঘটনার অবতারণা হয় এবং নিহত হয়, সরকারি হিসেবে, ২৮৫ জন। নোয়াখালীর দাঙ্গা গান্ধীকে চরমভাবে বিচলিত করেছিল, সংঘাতের এই বিস্তার তাঁকে হতচকিত করেছিল। শহরে যে দাঙ্গা ঘটে সেখানে দাঙ্গাকারী ও দাঙ্গাপীড়িত কেউ কাউকে চেনে না, হিংসার উন্মত্ততা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষকে অন্ধ করে দেয় এবং তারা প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু গ্রামসমাজে মানুষ দীর্ঘকাল ধরে পাশপাশি বসবাস করে আসছে, সামাজিক ও ধর্মগত ভিন্নতা ও বিরোধের অনেক ক্ষেত্র থাকলেও পারস্পরিক মিলন ও সহাবস্থানের ক্ষেত্র তো সমাজ ও জীবনযাত্রাই প্রস্তুত করে দেয়। সেরকম একটি সমাজে যদি সম্প্রদায়গত বৈরিতা চরম নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে উপনীত হতে পারে তবে মানুষের জীবনবিকাশের ভিত্তিই তো টলে ওঠে, মানবসমাজ বলে আর কিছু থাকে না। নোয়াখালীর দাঙ্গায় বিচলিত গান্ধী এর প্রতিবিধানের পথ খুঁজছিলেন, রাজনৈতিক গণসংগ্রামের যেসব বাধা পথ আছে, গৎবাঁধা মিলনের বাণী উচ্চারণের ও সভা-সমাবেশে সজোর ঘোষণা জারির যে প্রচলিত পন্থা তাতে মন থেকে সায় মিলছিল না গান্ধীর। অপরদিকে নোয়াখালী তাঁর অন্তর্দহনের কারণ হয়ে উঠেছিল আর তাই ২৭ অক্টোবর ১৯৪৬ তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি নোয়াখালী যাবেন, 'অহিংস চেতনার কঠোরতম অগ্নিপরীক্ষা'র মুখোমুখি হবেন। নিজের ও আশ্রমিক সত্যাগ্রহীদের জন্য কর্তব্য নির্দেশ করে তিনি বলেছিলেন যে, আশ্রমের নারী-পুরুষ কর্মীদের একেকটি উপদ্রুত গ্রামে গিয়ে নির্যাতিতের প্রাণ ও মানরক্ষায় সক্রিয় হতে হবে এবং প্রয়োজনে জীবনদান করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। দূর পূর্ববঙ্গের দূরতম গ্রামে তিনি কেন এমন ঝুঁকি নিয়ে যাবেন সেই প্রশ্ন অনেকে করেছিলেন, জবাবে গান্ধী বলেছিলেন যে, পূর্ববঙ্গের এই সমস্যা স্থানীয় সমস্যা নয়, এটা সর্বভারতীয় সমস্যা।

৭ নভেম্বর ১৯৪৬ মোহনদাস গান্ধী চৌমুহনী এসে পৌঁছেন এবং পরদিন দাঙ্গা উপদ্রুত দত্তপাড়ায় তাঁর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে আশপাশের কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শনের পর শ্রীরামপুরে ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামপুর থেকে গান্ধী তাঁর সত্যাগ্রহী সাথীদের একেকজনকে একেক গ্রামে পাঠান এবং সেই দৃঢ়চেতা নারী সেখানে গ্রামের কারো বাড়িতে থেকে সম্প্রীতি ও জনকল্যাণের কাছে ব্রতী হতে বলেন। এই দলের মধ্যে নারী-পুরুষ সবাই ছিল এবং এঁদেরই একজন, পাঞ্জাবের অভিজাত পরিবারের সদস্যা বিবি আমতুস সালাম, শিরণ্ডি গ্রামে অবস্থান নেন এবং এক পর্যায়ে হিন্দুদের লুণ্ঠিত খড়ুগ ফেরত দিতে মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ব্যর্থ হয়ে পঁচিশ দিন অনশনব্রত পালন করেন। অবশেষে স্থানীয় গণ্যমান্য মুসলমানদের যৌথ হস্তক্ষেপে সমস্যার সম্মানজনক সুরাহা হয় এবং আমতুস সালাম ১৯৫০ সালের দাঙ্গা অবধি নোয়াখালীর গ্রামেই থেকে যান। পানিয়ালা গ্রামে প্রথমে কাজ করতে এসেছিলেন আভা গান্ধীর পিতা অমৃতলাল চ্যাটার্জি, পরে আসেন দক্ষিণ ভারতীয় সত্যাগ্রহী রেড্ডিপল্লী সত্যনারায়ণ। ১৯৪৮ সালে সেই যে এলেন সত্যনারায়ণজী আর কখনো দেশমুখো হননি, পানিয়ালার মানুষের কল্যাণে জীবনভর কাজ করেছেন। ১৯৯২ সালে নব্বই-উর্ধ্ব বয়সে তিনি দেহদান করেন। তিনি অপরিগ্রহ নীতি অনুসারে সরল সাধারণ জীবনযাপন করতেন এবং হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা দ্বারা যা আয় হতো তার প্রায় সবটাই গ্রামবাসীর কল্যাণে ব্যয় করতেন। নীরবে নিভৃতে আত্মদানের দীর্ঘ সাধনায় রত এই মানুষটির মধ্যে সত্যাগ্রহের প্রকৃত রূপটি খুঁজে পাওয়া যায়। জয়াগ গ্রাম পরিক্রমণ শেষে হবিগঞ্জের চারু চৌধুরীকে সেখানে রেখে যান গান্ধী, বলেছিলেন তিনি আবার ফিরে আসবেন, সেই ফেরার অপেক্ষায় চারু চৌধুরী আর জয়াগ ত্যাগ করেননি। পাকিস্তান আমলে তাঁর বড় সময় কেটেছে কারাগারে, একাত্তরে পাকবাহিনী জয়াগ এসে যখন তিন আশ্রমিককে হত্যা করে চারু চৌধুরী রক্ষা পেলেন তিনি কারাগারে ছিলেন বলে। আজ জয়াগের গান্ধী আশ্রম গান্ধীচিন্তার এক আলোকশিখা হয়ে রয়েছে।

প্রায় চার মাস গান্ধী ছিলেন নোয়াখালীতে এবং শেষ দুই মাসে, ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে, একাদিক্রমে গ্রাম থেকে গ্রামে হেঁটে চলেন এবং প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামে রাত্রিযাপন করেন, গ্রামের হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে আলোচনা করেন, কারো কারো বাড়িতেও যান, অন্দরের নারী ও শিশুদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। জাতীয় রাজনীতির প্রধান ব্যক্তিত্ব এভাবে দেশের দূর প্রান্তের সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে অতি সাধারণভাবে মিশে যেতে পারেন তেমন উদাহরণ আর দ্বিতীয়টি নেই। নোয়াখালীর হিন্দুদের সঙ্গে যেমন তেমনি মুসলমানদের সঙ্গেও নিবিড়ভাবে মিশেছেন গান্ধী। গ্রামসভাগুলোতে হিন্দু-মুসলমান সমভাবে উপস্থিত ছিল, আলোচনা যেমন করেছেন তেমনি তর্ক-বিতর্কও হয়েছে, নামাজ-শেষের মুসল্লিদের সঙ্গে কথা বলেছেন, মাদ্রাসা মাঠে সভা করেছেন। মানুষের কাছে সরাসরি পৌঁছে যাওয়ার এই পরিক্রমণের মধ্য দিয়ে মানুষের ওপর তাঁর আস্থা আবার বড়ভাবে ফিরে পেয়েছিলেন গান্ধী। নোয়াখালীকে তিনি যেমন দিয়েছেন, তেমনি নোয়াখালীও তাঁকে দিয়েছে সেই বিশ্বাস।

নোয়াখালীতে গান্ধীর পদযাত্রা ছিল এক নিঃসঙ্গ যাত্রীর সাধনা, নিঃসঙ্গ কিন্তু একা নন, প্রতিটি মানুষ তাঁর অন্তরের শক্তিতে যেন আপন আপন পদযাত্রায় ব্রতী হয়, এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা আর সেই আকাঙ্ক্ষার বাহক হয়েছে তাঁর সতীর্থ সত্যাগ্রহীরা। আমাদের ইতিহাসের এমন আলোকোজ্জ্বল অধ্যায় দাবি করে আমাদের আরো নিবিষ্ট অধ্যয়ন।

গান্ধী আবার ফিরে আসতে চেয়েছিলেন নোয়াখালী, স্বাধীনতার পর সবরমতী আশ্রমের সদস্যরা যখন গান্ধীকে পুনরায় সবরমতীতে ফিরে আসার আহ্বান জানায় তিনি বলেছিলেন যে, আমার জন্য সবরমতী অনেক দূরে, নোয়াখালী আমার কাছাকাছি। তিনি মানুষের অন্তরের শক্তি জাগ্রত করার যে সাধনায় নেমেছিলেন নোয়াখালী পদযাত্রায়, সেটা তাঁকে টানছিল বেশি।

হিংসায় উন্মত্ত আমাদের বর্তমান সমাজে নোয়াখালী অনেক কাছের স্থান, সেই সাধনা আজ বিশেষ জরুরি যা নোয়াখালী ঘিরে পরিচালিত গান্ধীর পদযাত্রায় একদা সূচিত হয়েছিল।

‘এই ভোর সেই ভোর নয়’

১৯৪৭ সালের ১৪/১৫ আগস্ট দিনটিকে দেখা হয়েছে নানাভাবে। ইতিহাসের পাতায় তা’ ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ব্রিটিশের কাছে এটা ছিল ‘ক্ষমতা হস্তান্তর’—স্বাধীনতার স্বীকৃতিদানে একান্ত ইংরেজ-সুলভ কুণ্ঠার পরিপ্রকাশ। বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের আওতায় প্রাথমিকভাবে স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসে শরিক হলেও অচিরেই এর তিক্ততা অনুভব করতে শুরু করে এবং জাতীয় অধিকারের অস্বীকৃতি যে পরাধীনতার নামান্তর সেই উপলব্ধি স্বাধীনতার স্বাদকে কটু করে তোলে। তবে ভারত ভেঙে যে ভাগ হলো, এবং সেই ভাঙনের সর্বনাশা টানে যে লাখ লাখ মানুষের জীবন টলে উঠলো, রক্তের হোলি খেলা এবং বিশ্ব-ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ জনউৎখাত ও উদ্বাস্তু বিনিময়ের দুঃস্বপ্ন-পীড়িত সেই স্বাধীনতা সাধারণজনের কাছে হয়ে আছে পার্টিশন বা দেশভাগ। এই দুর্গতি সবচেয়ে তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল পাঞ্জাব এবং বাংলায়। পাঞ্জাবের ও বাংলার মানুষ অচিরেই তাদের জীবনকে দুই পর্বে বিভক্ত হতে দেখতে পেল—পার্টিশনের আগে এবং পার্টিশনের পরে। যে জীবন ছিল পার্টিশনের আগে এবং অভাবিত ও অপ্রত্যাশিত যে নতুন জীবনের গহ্বরে পতিত হলো লাখ লাখ মানুষ পার্টিশনের পরে, তার মধ্যে পূর্বাপর কোনো যোগসূত্র ছিল না। যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হানাহানি রোধ করতে দেশকে ভিন্ন ভিন্ন শরীকানায় ভাগ করে নিতে সম্মত হলো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেই বিবাদ আরো বিপুল ও রক্তক্ষয়ী হয়ে উঠলো দেশভাগের পর। সেইসাথে জন্ম নিলো নতুন এক বিশাল জনগোষ্ঠী—উদ্বাস্তু। শুরুর দিকে রিফিউজি অর্থে ছিন্নমূল কথাটা খুব চালু ছিল। কিন্তু ছিন্নমূল অভীধা রাজনীতিকদের জন্য বোধকরি অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল—তাই তাঁরা শব্দটি পাল্টে নিলেন শীঘ্রই।

দেশভাগ যে জনউৎখাতের এমনি বিপুল মাত্রার সমস্যার জন্ম দেবে সেটা স্বাধীনতা প্রাপ্তির স্বপ্নে বিভোর কোনো রাজনৈতিক নেতাই ঘুণাক্ষরে ভাবতে পারেননি। এমনকি দেশ কীভাবে ভাগ হবে সেটা নিয়েও গভীর কোনো ভাবনা তাঁদের ছিল না। চট্‌জলদি সামরিক অপারেশনের মতো লর্ড মাউন্টব্যাটেন এই কাজ করতে গিয়ে চরম অবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন আর তাঁর অনুগামী হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম সকল রাজনৈতিক নেতা।

র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদে পাঞ্জাব কীভাবে বিভক্ত হবে সেটা ৯ আগস্ট চূড়ান্ত হয়ে গেলেও স্বাধীনতা ঘোষণার আগে তা মাউন্টব্যাটেন প্রকাশ করলেন না। ফলস্বরূপ স্বাধীনতার আনন্দ-উৎসব রাতারাতি রক্ত-খেলার রূপ নিলো। প্রথমে পাঞ্জাবে, তারপরে বাংলায়। এবং এই নিষ্ঠুরতার পথ বেয়ে দেখা দিলো ছিন্নমূল মানুষের দীর্ঘ কাতার। ছিন্নমূল মানুষদের যে অচিরেই বলা হতে লাগলো শরণার্থী বা উদ্বাস্তু সেটা রাজনীতিবিদদের অস্বস্তি অনেকটা লাঘব করেছিল। শরণ-প্রার্থীকে আশ্রয় দিলে তাঁর সমস্যার সুরাহা হয়, উদ্বাস্তুকে বাস্তু যোগালে তাঁর সমস্যারও সমাধান ঘটে, কিন্তু ছিন্নমূলকে কীভাবে আবার জীবনের মূল সংলগ্ন করা যায়? এই অমোচনীয় সমস্যার জন্ম দিয়েছিল যে অদূরদর্শী রাজনৈতিক নেতৃত্ব, দুই দেশেই তাঁরা সমস্যার উৎসকে পরিহার করে চলতে চেয়েছিলেন। ফলে ছিন্নমূল মানুষগুলো থেকে গেল, সংখ্যায় বাড়তেই লাগলো, কেবল ছিন্নমূল শব্দটি রাজনীতির বলয় থেকে বিদায় নিলো। ব্রিটিশ বিদায়ের এতোকাল পরও তাই মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক এমনিভাবে স্বাধীনতা অর্জন কি উপমহাদেশের নিয়তি ছিল?

ইতিহাসের অমোঘ গতি বলে একটা কথা বাংলায় খুব চালু রয়েছে। রাজনীতিবিদরা এর যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। জয়ী দল তাদের সাফল্যের পেছনে ইতিহাসের এই অমোঘ রায় দেখতে পান। পরাজিতরা অমোঘ গতির ভরসাতে পুনরায় বিজয়ী হওয়ার স্বপ্নকে জিইয়ে রাখেন। সমাজতাত্ত্বিকেরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে অমোঘ গতির উল্লেখ করতে ভুলে যান না। আর সাধারণ বিবেচনাবুদ্ধির মানুষরা যা-কিছু ঘটে তাকেই অমোঘ গতি হিসেবে মেনে নেয়ার প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেন। এতোকিছুর পরেও বলতে হয় অমোঘ গতি বলে একটা কথা নিশ্চয় রয়েছে। সেইসব কূলপ্লাবী তাৎপর্যময় পরিবর্তন কিংবা ঘটনা, যা একভাবে বা অন্যভাবে বিকশিত হতোই, যার অগ্রধারা রোধ করার সাধ্য কারো নেই, সেসব তো ইতিহাসের অমোঘ গতির জ্বলজ্যান্ত সাক্ষী হয়ে আছে। সামন্ততন্ত্রের বুকের ভেতর থেকে শিল্পবিকাশের পথ বেয়ে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব এবং তার ফলে ইউরোপে রাজতন্ত্রের স্থলে জাতিরাষ্ট্রের বিকাশ—এসব ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য পরিবর্তন বটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ঔপনিবেশিক বিশ্বব্যবস্থায় যে ভাঙন দেখা দিলো তা ইতিহাসের অনিবার্য পরিবর্তনের আরেক উদাহরণ। এশিয়া-আফ্রিকার পরাধীন জাতি স্বাধীনতার পতাকা নিশ্চিতভাবেই আকাশে তুলতো, হয়তো স্বাধীনতার দিনক্ষণে কিছু পরিবর্তন আমরা দেখতে পেতাম। কিন্তু এই একই বিবেচনা থেকে দেশভাগকে কি আমরা ইতিহাসের অমোঘ নিয়তি বলে ভাবতে পারি?

ইতিহাস বিবেচনায় 'যদি' বা 'কিন্তু'র কোনো স্থান নেই সেটা ঠিক, তা সত্ত্বেও দেশভাগ যেভাবে নিয়তি হয়ে উঠলো সাতচল্লিশে তার অন্যথা হওয়ার অবকাশ তো ঘটনাধারার পর্বে পর্বে বহুভাবেই দৃশ্যগোচর হয়। যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম বলে জোরগলায় ঘোষণা করা হয় সেখানে সম্মিলিত ভারত রাষ্ট্রসংঘের আওতায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠনের ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সাধারণ সভায় জিন্নাহ সভাপতির রুলিং দিয়ে বলেন,

লাহোরের ঐ প্রস্তাবে টাইপের ভুলে স্টেট-এর বানানে বাড়তি এস্ যোগ হয়েছিল। সঠিক পাঠ হিসেবে মুসলিমদের একক রাষ্ট্রগঠনের দাবি হিসেবেই লাহোর প্রস্তাবকে বিবেচনা করতে হবে। একটি রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে আলোচনাক্রমে সকলের সম্মতিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে সংশোধনী আনতে হলে দলের উচ্চ পরিষদের সভায় পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। সাধারণ সভায় অনিয়মতান্ত্রিকভাবে যে রুলিং দিয়ে লাহোর প্রস্তাবের অর্থ পাল্টে দিলেন জিন্নাহ এবং আবুল হাশিম ও অন্যদের প্রতিবাদকে ধামাচাপা দিলেন তাতে বোঝা যায় কতোটা অবিবেচনাহীনভাবে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছিল পাকিস্তান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে। বস্তুত ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের ধারণা সম্পর্কে জিন্নাহ নিজেও স্বচ্ছ ছিলেন না। বরং সময়বিশেষে নমনীয়ভার পরিচয় তিনি রেখেছিলেন। ভারতের প্রদেশগুলোকে তিনটি বিশিষ্ট গুচ্ছে চিহ্নিত করে এর ঐক্যবদ্ধতা বজায় রাখার যে প্রস্তাব ক্যাবিনেট মিশন রেখেছিল জিন্নাহ তা মেনে নিয়েছিলেন। মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি এই প্রস্তাবনার পক্ষে সমর্থনও আদায় করেছিলেন। কিন্তু নেহরু, প্যাটেল ও কিছুটা পরিমাণে গান্ধীর অবিবেচক ভূমিকা ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবনা বিনষ্ট করে দেয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যে হিন্দু সম্প্রদায়গত চিন্তার সঙ্কীর্ণতা সবসময়ে, বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে, অতিক্রম করতে পারেননি সেটার তথ্যসমৃদ্ধ পরিচয় পরবর্তীকালে প্রকাশ পেয়েছে। কেবল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেই নয়, বাংলাতেও ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বিজয়ের পর কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হক কংগ্রেসকে নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব হিন্দু-মুসলিম মিলিত সরকার গঠনের প্রস্তাব উপেক্ষা করায় ফজলুল হক বাধ্য হয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলে সরকার গঠন করেন। বাংলার মুসলিম রাজনীতির জাতীয়তাবাদী ধারার বিকশিত হওয়া এবং কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্কীর্ণতা মোচন করার একটি অনুপম সুযোগ এভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল। শুধু তাই নয়—ইন্ডিপেনডেন্ট মুসলিম লীগ ছেড়ে সোহ্‌রাওয়ার্দীর সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগে যোগদান এবং পরে কৃষক-প্রজা পার্টি ছেড়ে ফজলুল হকের মুসলিম লীগের সভাপতি পদ গ্রহণ বাংলার জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের নিজস্ব রাজনীতিক বিকাশের সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করে দেয়। এর ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। তাই দেখা যায় আরো পরে ১৯৪৬ সালে সোহরাওয়ার্দী—আবুল হাশিম—শরৎ বসু যখন অখণ্ড বাংলা গঠনের উদ্যোগ নেন ততোক্ষণে মুসলিম লীগের যূপকাষ্ঠে জাতীয়তাবাদী মুসলিম শক্তির বলিদান সম্পন্ন হয়ে গেছে। ফলে এই তাৎপর্যময় প্রস্তাবনা জিন্নাহ-গান্ধীর অমতের মুখে কোনো পথ খুঁজে পায়নি। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বাংলায় মুসলিম লীগের আসনের (৪০) চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ আসন (৭৬) পেয়েছিল কৃষক-প্রজা পার্টি ও স্বতন্ত্র মুসলমানগণ। পক্ষান্তরে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের ১১৪ আসনের বিপরীতে কৃষক প্রজা পার্টি ও স্বতন্ত্র মুসলমানদের মিলিত আসন সংখ্যা ছিল মাত্র ৬। অপরদিকে দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৯টি আসন এবং এই ফলাফল মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দৌর্বল্যকে প্রকাশ করলেও ইতিহাসের সবচেয়ে

তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষণে মুসলিম লীগের নাজুক অথচ বিপুল সাফল্য, উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জন মুহূর্তের সিদ্ধান্তমূলক সময়ে, সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় প্রাবল্য সৃষ্টি করে ডেকে এনেছিল স্থায়ী বিপর্যয়।

কেন্দ্রীয় রাজনীতিতেও জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বারবার পরাভূত হয়েছেন কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক চিন্তার কাছে। ১৯৮৮ সালে তাঁর সুবিখ্যাত *ইন্ডিয়া উইন্‌স্ ফ্রিডম* গ্রন্থের যে পূর্ণপাঠ প্রকাশিত হয় তাতে আজাদের ক্ষোভ ও হতাশা তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা জিন্নাহ মেনে নেয়ার পর ১৯৪৬ সালের ১০ জুলাই নেহরু ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে বাধ্যবাধকতা নেই বলে মতো প্রকাশ করে গোটা ঘটনাপ্রবাহকে পাল্টে দেন। মাওলানা আজাদ নেহরুর এই হঠকারী সিদ্ধান্তকে যেমন তীব্রভাষায় সমালোচনা করেছেন তেমনি বিহারে মুসলিম নেতা সৈয়দ মাহমুদ ও বোম্বেতে পার্শি নেতা নরিম্যানকে কংগ্রেস সংগঠনের নেতৃত্বে ন্যায্য অবস্থান থেকে বঞ্চিত করার জন্য গান্ধীর আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আজাদ লিখেছিলেন, "ঘটনার দিকে ফিরে তাকালে আমার মধ্যে এই অনুভূতি না জেগে পারে না যে, কংগ্রেস তার ঘোষিত আদর্শ বজায় রাখতে পারেনি। এটা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ সেই স্তরে উপনীত হয়নি যখন তা সম্প্রদায়গত বিবেচনাকে অতিক্রম করতে পারে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতি অবনত না থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন করতে পারে।"

অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর ছড়ায় রাজনীতিক বুড়ো খোকাদের প্রতি ধিক্কার উচ্চারণ করেছিলেন যাঁরা ভারত ভেঙে ভাগ করেছিল। রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতার এই দায়ভার আমরা মোচন করেছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে। জাতিগত ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপমহাদেশে রাষ্ট্রিক বিকাশের যৌক্তিক পরিণতি আমরা খুঁজে পেয়েছি মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যে। কিন্তু উপমহাদেশের রাজনীতির পিছুটান থেকে মুক্তি খুব সহজে মিলবে না। তাই জাতি-রাষ্ট্রকে সম্প্রদায়-রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টারও অন্ত নেই। দেশভাগ ঐতিহাসিক সত্য বটে, কিন্তু এর যা-কিছু নেতিবাচক জের সেটা অপনোদনের তপস্যার মধ্য দিয়েই উপমহাদেশকে এগোতে হবে। ১৯৪৭ সালের আগস্টে ফয়েজ আহমদ ফয়েজ লিখেছিলেন, 'মুক্তির মুহূর্তে সে তো আসে নাই/পা চালাও, চলো আগে চলো/মঞ্জিল, আসে নাই।'

১৯৪৭ সালের ১৪ এবং ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার আনন্দ-উৎসবের মধ্যে দুই রাজনৈতিক নেতা, মহাত্মা গান্ধী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, অনশন-ব্রত পালন করেছিলেন এবং সাতচল্লিশের স্বাধীনতার বেদনার রূপটি ফুটে উঠেছিল তাঁদের এই প্রতীকী আচরণে। তাঁদের কর্মজীবন নিয়ে অনেক সমালোচনা নিশ্চয় থাকতে পারে, তা সত্ত্বেও এই দুই রাজনৈতিক নেতার এমনি নৈতিক ভূমিকা পালন আমাদেরকে আলোড়িত না করে পারে না। বেলিয়াঘাটার হায়দারী ম্যানসনে গান্ধী যখন এলেন তখন হিন্দু সম্প্রদায়ের উত্তেজিত জনতা ইট-পাটকেল ছুঁড়ে তাঁর প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করে। গান্ধীর সঙ্গে মিলে সোহরাওয়ার্দীর

অনশনকেও কলকাতার মুসলিম সম্প্রদায় সুনজরে দেখেনি। কিন্তু বেলা না পড়তেই দুই নেতার এই হৃদয়-উৎসারিত কর্মের প্রভাব কলকাতার নাগরিকজন অনুভব করলেন। দলে দলে মানুষ এসে জানিয়ে যেতে লাগলো তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং সম্প্রদায়গত হানাহানি থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার। চারপাশের হিংসা-উন্মত্ত পরিবেশে শুভ ও কল্যাণের চকিত ইশারা যেন ঝিলিক দিয়ে গেল।

পরদিন, ভারতের স্বাধীনতা দিবসে, সাংবাদিকরা জানতে চাইলো গান্ধীর অনুভূতি। তিনি বিষণ্নভাবে বললেন, আনন্দ করার মতো কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না। আবারও ফয়েজের জবানিতে বলতে হয়, “এই ভোর সেই ভোর নয়/যার আসার প্রতীক্ষা ছিল আমাদের/এ তো সেই ভোর নয়/যার আকাঙ্ক্ষা বুকে পুষে/যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রিয়।”

দেশভাগ: আমাদের বিষবৃক্ষ

১৯৪৭ সালের মধ্য-আগস্টে প্রায় দুইশ' বছরের গোলামির জিঞ্জির ভেঙে ব্রিটিশ ভারত অর্জন করে স্বাধীনতা। ভারত যেমন ছিল উপনিবেশ যুগের প্রায় প্রথম দিকের পদানত সাম্রাজ্য, তেমনি ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর উপনিবেশবাদ মোচন প্রক্রিয়ার মূল পথিকৃৎ। উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান দেশকালের সীমানা ছাপানো তাৎপর্য বহন করছিল, এশিয়া-আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বিশেষ প্রেরণাসঞ্চারী হয়ে উঠেছিল; কিন্তু সাতচল্লিশের সেই ঔপনিবেশিক ভারতের নাগরিকেরা, বিশেষভাবে বাংলার সর্বস্তরের মানুষ, স্বাধীনতার সূর্যোদয়কে পরিপূর্ণ আবেগময়তা নিয়ে বরণ করতে পারেনি। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়টি ছিল চরম নৃশংস ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় কলঙ্কিত। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং থামতে না থামতে শুরু হয়েছিল দূর নোয়াখালীর শ্যামল গ্রামাঞ্চল জুড়ে অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয় নৃশংসতা, সেই জের মুছতে না মুছতে বিহারে শুরু হয়ে গেল সংঘাত। হিন্দু ও মুসলমান যেন কেবল ভিন্ন দুই যুযুধান জাতিসত্তার সদস্য নয়, একই দেশে একই মাটিতে পাশাপাশি মিলেমিশে তাদের বসবাস, নেতৃবৃন্দের কাছে মনে হয়েছিল, অসম্ভব ও অকল্পনীয়। ফলে স্বাধীনতাকে শান্তিময় করতে গৃহীত হয়েছিল বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করার নীতি, আর ঔপনিবেশিক শাসকেরা হয়ে উঠলেন এই বিভাজনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার নীতির উৎসাহী প্রবক্তা, পরিচালক ও বাস্তবায়নকারী। স্বাধীনতাকে বরণ করার সঙ্গে কোনো ঐতিহাসিক আবেগ জড়িত ছিল না, ছিল নতুন করে রক্তপাত ঘটবার শঙ্কা এবং তা এড়ানোর জন্য উত্তেজনা প্রশমনে গৃহীত ব্যবস্থাদির নানা দিক ও তার বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে তর্কাতর্কি। বিবদমান দুই পক্ষের অংশগ্রহণে সমন্বয় ও ফয়সালার নীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে সার্বিক মতবিনিময় ও আলোচনার কোনো উদ্যোগ ছাড়াই চলছিল ভাগবাটোয়ারার আয়োজন। খুলনার ভাগ্য কি হবে, মালদহ যাবে কোন দিকে, দিনাজপুর হিন্দুর নাকি মুসলিমের, এমনই এক স্থান যেখানে সব মিলেমিশে একাকার, জেলার ধর্ম নির্ধারণ করাই মুশকিল—এসব নিয়েই ব্যস্ত ছিল সবাই। বাংলার বিভাজন রেখা টানবার দায়িত্ব দেয়া হলো স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফকে, পঞ্চাশ বছর পর 'টাইম' ম্যাগাজিন সেই দিনগুলো নিয়ে তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিল যে, র‍্যাডক্লিফকে এই দায়িত্ব দেয়ার পেছনে বড় কারণ বোধ হয় ছিল

এটাই যে তিনি এর আগে কখনো বাংলায় আসেননি। এই শ্লেষাত্মক উক্তির পেছনে রয়েছে বিমূঢ় এক বাস্তবতার উপস্থিতি। দুই শত বছরের পরাধীনতা ঘুচিয়ে যে স্বাধীনতার আগমন, যাকে ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ বলেছিলেন, ইয়ে দাগ দাগ উজালা, তখনকার কিংবা পরবর্তীকালের সিংহভাগ বাঙালি মধ্য-আগস্টের সেই ঐতিহাসিক ক্ষণকে স্বাধীনতার দিন হিসেবে চিহ্নিত করেন না, বলেন পার্টিশন কিংবা দেশভাগের সময়। ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক কিংবা রাজনীতিক বিশ্লেষকদের পোশাকি ভাষায় যা স্বাধীনতার দিবস, আম-জনতার বুলিতে তা পার্টিশন, তাঁরা নিজেদের জীবনকে বিবেচনা করেন এর আগের ও পরের অংশ মিলিয়ে, যে বিভাজন-বিন্দুর এপার-ওপারের জীবন কোনোভাবেই আর একরকম কিংবা ধারাবাহিক থাকেনি এবং এই না থাকার বহু কার্যকারণ নিশ্চয় রয়েছে, রয়েছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও ঐতিহাসিক অনেক ভিন্ন ভিন্ন কারণ, কিন্তু একটি অভিন্ন ঘটনা জড়িয়ে আছে সকল কিছুতে, তা হলো ঐ প্রায় নির্দোষ সরল শব্দবন্ধ 'দেশভাগ'।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ ঘটিয়ে রাজনীতিবিদরা ভেবেছিলেন হানাহানি ও সংঘাতের অধ্যায় তারা পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবেন; মুসলমানদের পৃথক আবাসের ব্যবস্থা হলে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ করার বিষয়টির সুরাহা হবে এবং উপমহাদেশের দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান ঘটবে। কিন্তু এই ভাবনার গুরুতর ঘাটতির দিক কেন যে রাজনীতিবিদদের বিবেচনায় কোনো ঠাঁই পেল না সেটা ভাবতে গেলে আজ বিস্মিত হতে হয়। একই দেশের একই ভাষা তথা জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠী কিংবা বড় পরিসরে বহুজাতিক পটভূমিকায় ভিন্ন জাতি কিংবা ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে যখন জাতিগত, ধর্মগত, ভাষাগত বিবাদ রক্তক্ষয়ী হিংস্রতার রূপ নেয় তখন ভৌগোলিক বিভাজন তার সমাধান এনে দিতে পারে না। সমাজে ও রাষ্ট্রে জনগোষ্ঠীর মধ্যকার ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে মান্য ও শ্রদ্ধা করার শিক্ষা এবং তার অনুষঙ্গ হিসেবে সহনশীলতা ও উদারতার প্রতিষ্ঠা ছাড়া যে আর কোনো সমাধান নেই সেটা নেতৃভাবনায় বিশেষ স্থান পায়নি। বিবাদের উৎসগুলো পালটে দেয়ার জন্য অনেকরকম পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে; কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গি কারো মধ্যে ছিল না, ফলে সমাধানমূলক পদক্ষেপ হিসেবে গৃহীত দেশভাগ বিরোধমূলক সমস্যার সমাধান ঘটায়নি, বরং এখান থেকে সমস্যার গ্রন্থিগুলো সমাজকে আরো আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে যাত্রা শুরু করলো। স্বাধীনতা হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিষহরণ না করে সমাজদেহে সেই দূষণ আরো ব্যাপক ও স্থায়ী করে তুললো, যার জের উপমহাদেশ আজো বহন করে চলেছে, যার ফলে লোকবিবেচনায় স্বাধীনতা অব্যাহতভাবে 'পার্টিশন' হিসেবে আখ্যাত হয়ে আছে।

পার্টিশন এমন কতক স্ববিরোধিতার জন্ম দিয়েছিল যা এখন উদ্ভট ও অকল্পনীয় মনে হলেও রক্তাক্ত হিংস্রতার পটভূমিতে সেই সময় অর্জন করেছিল সঙ্গতি ও বাস্তবতা। এর সবচেয়ে জ্বলজ্বলে উদাহরণ হচ্ছে 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্রের জন্ম, যে-রাষ্ট্রের দুই অংশের মধ্যে ভৌগোলিক ফারাকই হাজার মাইলের ওপর এবং এই হাজার মাইলের চাইতেও

বড় দুই অংশের মানুষের মধ্যকার ভাষা, সংস্কৃতি, জাতিচেতনা, ইতিহাস, ঐতিহ্যের ব্যবধান। এমন একটি রাষ্ট্র কল্পনা করাও কষ্টকর, এ-যেন গ্রিস ও স্পেন মিলে একক রাষ্ট্র গঠন, তাদের ধর্মগত অভিন্নতার সূত্রে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবিটি উঠেছিল ১৯৪০ সালে এবং তখন ভাবা হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন মুসলিম-প্রধান অঞ্চল মিলে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রসমাহার গড়ে উঠবে, তাই বলা হয়েছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলভিত্তিক স্টেটস-এর কথা। পাকিস্তানের স্বাপ্নিক যুবক চৌধুরী রহমত আলী যেসব অঞ্চলের আদ্যাক্ষর নিয়ে এই পবিত্র ভূমির নামকরণ করেছিলেন সেখানে পূর্বভারতের বাংলার কোনো জায়গা ছিল না। পরে ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান যখন আশু অর্জনযোগ্য হয়ে উঠলো, যে দাবির পেছনে মূল যৌক্তিকতা ছিল অব্যাহত রক্তপাত ঠেকানো, তখন রাষ্ট্রের রূপ নির্ধারণ করাটা জরুরি হয়ে পড়েছিল এবং জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দিল্লিতে আয়োজিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে জোর গলায় বললেন যে, লাহোর প্রস্তাবে একক রাষ্ট্রের কথাই বলা হয়েছিল, টাইপিস্টের ভুলে 'স্টেট্‌স্' লেখা হয়ে গেছে। গঠিতব্য রাষ্ট্র বিভিন্ন স্বশাসিত অঞ্চল নিয়ে ফেডারেল কাঠামোর হবে, অথবা একক কেন্দ্রশাসিত হবে, সেই গুরুতর প্রশ্নের এভাবেই ফয়সালা করা হলো, প্রায় যেন এক যাদুবাস্তব কাহিনী। অধিকন্তু ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল পরবর্তীকালে তার ভিন্নতর বা নতুন ব্যাখ্যা যুক্ত করে অর্জিত রাষ্ট্রের রূপরেখা দাঁড় করাবার জন্য প্রয়োজন ছিল আরেকটি কাউন্সিল অধিবেশনের; তা না করে দলের সম্মেলন ডেকে ব্যাপক হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে গৃহীত হলো প্রস্তাব, যা নিয়মতান্ত্রিকভাবেও বিধিসম্মত ছিল না। এভাবে জন্ম নিলো পাকিস্তান নামক অভিনব রাষ্ট্র, যে-রাষ্ট্র কোন্ পথে যাবে সেটা জন্মের অসঙ্গতিই যেন জানান দিচ্ছিল।

রাষ্ট্র যখন বাস্তব হয়ে উঠলো, রাষ্ট্রের জন্মের ভিত্তি দ্বিজাতিতত্ত্ব সেই রাষ্ট্রে প্রয়োগ অর্জন করলো আরেক অসঙ্গতি। ঔপনিবেশিক ভারতরাষ্ট্রের নিরিখে ভারতীয় মুসলমানের সংখ্যালঘিষ্ঠ অবস্থান তাকে দ্বিজাতিতত্ত্ব গ্রহণের দিকে প্ররোচিত করেছিল, অপরদিকে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে এই সংখ্যালঘিষ্ঠ ধর্মগোষ্ঠী রাতারাতি অর্জন করলো সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সর্বময় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। ফলে প্রায় এক দশকের অব্যাহত আন্দোলনমুখর কর্মকাণ্ড বিজয় করায়ত্ত করবার সাথে সাথে তার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতার ভিত্তি যেন রাতারাতি হারিয়ে ফেললো, বরং প্রশ্ন দেখা দিলো দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক রাষ্ট্র সর্বজনের নাগরিক অধিকার কীভাবে নিশ্চিত করবে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এই স্ববিরোধিতার উপস্থিতি শনাক্ত করতে পেরেছিলেন এবং পরিশীলিত আইনজ্ঞ হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বকার দ্বিজাতিতত্ত্বের অবস্থান বিসর্জন দিয়ে নাগরিকজনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাষ্ট্রদর্শন ব্যাখ্যা করে বললেন যে, সময়ের সাথে সাথে পাকিস্তানে আর মুসলমান মুসলমান থাকবেন না, হিন্দু হিন্দু থাকবেন না, ধর্মের বিচারে নয় কেননা সেটা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়, তবে নাগরিক বিচারে সবাই হবেন পাকিস্তানী। জিন্নাহর অসাম্প্রদায়িক উদার চেতনার পরিচয় হিসেবে এই ভাষণ প্রায়শ উল্লিখিত হয়, কিন্তু এই পথে অসঙ্গতি দূর করবার যে প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছিল সূচনালগ্নে পাকিস্তান সেই পথ আর মাড়ালো না, স্বয়ং জিন্নাহও না, রাষ্ট্র হয়ে

উঠতে চাইলো মুসলমানের রাষ্ট্র, বহুজাতিক বহুভাষিক বহুধর্মীয় রাষ্ট্রকে কেবল মুসলমানের রাষ্ট্র করবার সেই অসম্ভবের পথ ধরে চলতে গিয়ে তা দ্রুত হয়ে উঠলো পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলমানের রাষ্ট্র এবং অচিরে পরিণত হলো পাঞ্জাবি ও উত্তর-ভারতীয় মোহাজের এলিট শাসিত কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্র। এর প্রথম ইঙ্গিত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহই দিয়েছিলেন, ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় এসে জনসভায় ঘোষণা করলেন, উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তিনি একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রটি বহুজাতিক ও বহুভাষিক এবং এর সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের মাতৃভাষা বাংলা।

সাতচল্লিশ-উত্তর পূর্ববঙ্গ তাই দেশভাগের জের কেবল বহন করেনি, এই অঞ্চলের মানুষের ওপর নতুন বোঝা হয়ে উঠছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের সকল অসঙ্গতি। পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হলো অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে—রাষ্ট্র কি গণতান্ত্রিক পথে এসব অসঙ্গতি মোচন করতে করতে এগিয়ে যাবে, নাকি অসঙ্গতি আরো বাড়িয়ে তুলে সঙ্কট গভীরতর করে চলবে? দ্বিজাতিতত্ত্বের সঙ্গে আসে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি ও কলুষতা, অপরদিকে সর্বজনের রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন জাতীয় অধিকার, গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতা। এই দুই বিপরীতের টানাপোড়েন নিয়ে এগিয়ে চললো পাকিস্তান এবং রাষ্ট্রনীতিতে অচিরেই প্রথমটির আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত হলো।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্যের বাস্তবতা কোনো দ্বিজাতিতত্ত্বের আবরণ দিয়ে ঢেকে দেয়া সম্ভব ছিল না। বিষয়টি সম্পর্কে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্বয়ং কি পরিমাণ অনবহিত ছিলেন সেই পরিচয় গণপরিষদে প্রদত্ত প্রথম ভাষণেও মেলে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজের মধ্যে, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের যেসব টানাপোড়েন রয়েছে তা কালক্রমে দূর হবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে জিন্নাহ বৈচিত্র্যের উদাহরণ টেনে বলেছিলেন, "এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও আপনি পাবেন পাঠান, পাঞ্জাবি, শিয়া, সুন্নি ও এমনি আরো অনেক কিছু; হিন্দুদের মধ্যে পাবেন ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ক্ষত্রিয়, এসব ছাড়াও বাঙালি, মাদ্রাজি ও এমনতর আরো অনেক কিছু—এবং কালক্রমে এসবই বিলুপ্ত হবে।" জিন্নাহর এই ভাষণ, ঐতিহাসিক ক্ষণে প্রদত্ত হলেও, খুব চিন্তাপ্রসূত বলে মনে হয় না। দেখা যায় বৈচিত্র্যের বর্ণোজ্জ্বল বিভিন্ন উদাহরণ সামনে থাকতেও তিনি এসব বিবেচনা করেছেন উল্টোভাবে, ফলে পাঠান, পাঞ্জাবি কিংবা বাঙালির মধ্যে যে রয়েছে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ বা শিখ সেকথা না বলে পাঠান ও পাঞ্জাবিদের সঙ্গে সমার্থক করেছেন মুসলিমদের, হিন্দুর সঙ্গে বাঙালিদের। যে বিভ্রমের বীজ এখানে নিহিত ছিল সেটাই কালক্রমে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে জাতিগত পীড়নের শক্ত নিগড় করে তুলছিল এবং এর যাত্রাবিন্দু ছিল নেতৃত্বের রাষ্ট্রবিষয়ক উপলব্ধিতে চরম ঘাটতি।

যেসব অসঙ্গতি নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের যাত্রা তা ক্রমান্বয়ে সঙ্গতিপূর্ণ করবার পথ ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে ফেডারেল রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলা। কিন্তু শুরু থেকে পাকিস্তান শক্ত কেন্দ্র-শাসনে রাষ্ট্রসত্তাকে বেঁধে রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল। এর ফলে অসঙ্গতিগুলো ক্রমে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো এবং তা নিরসনে রাষ্ট্রক্ষমতার

প্রয়োগ হয়ে উঠলো মুখ্য পদ্ধতি। সঙ্কটের প্রথম প্রকাশ ঘটলো রাষ্ট্রের ভাষার প্রশ্ন নিয়ে। ভাষা প্রশ্নে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি ছিল বিশেষ জটিল, পশ্চিমাংশে সিন্ধি, বেলুচি, পশতু, পাঞ্জাবি ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর বসবাস হলেও মোগল-পাঠানদের দীর্ঘ-শাসনের জের হিসেবে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম স্বরূপ উর্দু ভাষার অবস্থান ছিল জোরদার। বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ভাববিনিময়ের এই অভিন্ন ভাষা তাই পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বাভাবিক স্বীকৃতির দাবিদার হয়েছিল। কিন্তু পূর্বাংশে বাংলা ভাষার ঐতিহ্য হাজার বছরের এবং ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার বড় অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়েছিল স্বাভাবিক জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে। দুই অংশের ভাষাগত বাস্তবতা ছিল ভিন্ন এবং সর্ব-পাকিস্তানে বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এমন রাষ্ট্রে তাই কোনো একক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না। বাস্তবতাকে উপেক্ষা করায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে সঙ্কট প্রথম মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং তা মোকাবিলায় পাকিস্তান রাষ্ট্র ফিরে গেল দ্বিজাতিতত্ত্বের কুহকে এবং মুসলিম কওমের ঐক্য সুদৃঢ় করবার উপায় হিসেবে উর্দু ভিন্ন অপর কোনো ভাষার কথা ভাবতে পারলো না, তা বাস্তব যতোই ভিন্নতর হোক না কেন।

১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের স্বীকৃত ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে স্থান দেয়ার জন্য কুমিল্লার খ্যাতনামা আইনজীবী ও কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নাকচ হয়ে যায়। এরই জের ধরে ঢাকায় ছাত্র-তরুণদের দ্বারা প্রতিবাদ সভা ও মিছিল আয়োজিত হয় এবং সেই সমাবেশ থেকে অন্যান্যের মধ্যে গ্রেফতার হন নবীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর যে অবস্থান তা দ্বিজাতিতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করে এবং জিন্নাহ কথিত আধুনিক নাগরিকরাষ্ট্র গঠনের পথানুসরণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুতি ঘটায়। এই চিন্তা-চেতনার প্রকাশ হিসেবে আমরা দেখি ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত সরকারি সাহিত্য-মাসিক 'মাহে-নও' পত্রিকার 'আজাদি' সংখ্যায় মীজানুর রহমান রচিত প্রবন্ধের সুপারিশসমূহ। তিনি লিখেছিলেন, "মুসলিম জাতীয়তা ভৌগোলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নহে। ভৌগোলিক জাতীয়তার সহিত ইসলামী জাতীয়তার মৌলিক মোখালেকাৎ, ভৌগোলিক ব্যবধান যাহাই হউক না কেন, সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের এক খোদা, এক নবী, এক মযহাব, এক মিল্লাত, একই তাহজীব-তামদ্দুন। সুতরাং ভৌগোলিক ব্যবধানে মুসলিম মিল্লাতের সত্যিকার ভাবধারা বিভিন্নমুখী হতে পারে না। যেহেতু ভাবধারার উৎস এক, ভাবের বাহন ভাষাও মোটামুটি এক-কেন্দ্রীক হওয়াই স্বাভাবিক।" এই চিন্তা আসলে ছিল শাসকগোষ্ঠীর চিন্তার প্রতিফলন, একটি কৃত্রিম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে তার রক্ষণে আরো অনেক কৃত্রিমতার দিকে তারা ধাবিত হতে শুরু করলেন এবং বাংলার অধিকারকে কেবল বিসর্জন দিলেন না, বাংলাকেও এক কৃত্রিম লেবাস পরাতে সচেষ্ট হলেন। মীজানুর রহমানই লিখেছিলেন যে, রাষ্ট্রভাষা নিয়ে "তর্ক-তকরারের গোলগায়েশ নাই। ...পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার কবেলিয়াত উর্দুর রয়েছে। এই সমস্যার সমাধানের বুনিয়াদ তৈরী হয়ে গেছে। আনজামের এনতেজাম শুধু বাকি।"

ভাষার প্রশ্ন নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর এমনি অবস্থান ছিল চরম সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় এবং সকল ধর্মের নাগরিকের সমঅধিকারের রাষ্ট্র হওয়ার বদলে পাকিস্তান কেবল মুসলমানের রাষ্ট্র হয়ে উঠতে চাইছিল। এই মুসলমানের রাষ্ট্রেও অপর বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর জাতীয় অধিকার মেনে নিতে রাষ্ট্র প্রস্তুত ছিল না। ফলে রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক চরিত্র হিন্দু ও মুসলমানে যে ফারাক তৈরি করেছিল তা বাঙালি মুসলমান ও পশ্চিমী মুসলমানে ফারাক তৈরির দিকে অগ্রসর হলো। এখানে পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলা বিভাজনের একটি পার্থক্য রয়েছে। পাঞ্জাব বিভাজন রক্তক্ষয়ী হানাহানির জন্ম দিয়েছিল এবং সেই নিষ্ঠুর হানাহানি জনবিনিময়ের মতো বর্বরতায় পর্যবসিত হলো। আনুষ্ঠানিকভাবে উভয় রাষ্ট্রশক্তি উদ্যোগী হয়ে সীমান্তের দুই পারের হিন্দু-মুসলমানকে এপার ওপারে স্থানান্তর করে ভৌগোলিক বিভাজনকে স্থায়ী ধর্মীয় বিভাজনের রূপ দিলো। পাঞ্জাব পার্টিশন নিয়ে নব্বইয়ের দশকে লাহোর থেকে প্রকাশিত এক সংকলনের নাম দেয়া হয়েছিল '*অপারেশন উইদাউট অ্যানাসথেসিয়া*' বা বিবশীকরণ ছাড়াই শল্যচিকিৎসা। পাঞ্জাব পার্টিশন জন্ম দিয়েছিল রক্তসমুদ্রের, তুলনায় বাংলা বিভাজন ঘটে গিয়েছিল কোনো বড়রকম দাঙ্গা বা রক্তপাত ছাড়াই। কলকাতায় গান্ধী অবস্থান নিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারা জোরদার করতে। স্বাধীনতার দিনটিতে তিনি ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী একত্রে পালন করেছিলেন অনশন। এসবের একটি প্রভাব নিশ্চয় ছিল, তবে সর্বোপরি ছিল সম্প্রীতি বজায় রাখবার জন্য সমাজে বিরাজমান আগ্রহ। পাকিস্তান যে-আদর্শ নিয়েই জন্মলাভ করুক বাস্তব পাকিস্তান হবে সর্বজনের সমষ্টিমঙ্গলের ভূমি এমন এক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ পূর্ববঙ্গে নানাভাবে ঘটছিল। পাঞ্জাব রক্তাক্ত হলেও বাংলার তুলনামূলক শান্ত আবহের কারণে স্বাধীনতাকে '*রাঙা প্রভাত*' হিসেবে চিহ্নিত করে উপন্যাস লিখতে পেরেছিলেন আবুল ফজল, যে-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের কেউ কেউ সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্নও দেখেছিলেন। কবিয়াল রমেশ শীল ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে লিখেছিলেন, "বাজে বিজয় ভেরী গগনবিদারী, কিসের শঙ্কা কিসের ভয়,/মুক্তকণ্ঠে গাহিব মোরা জয় পাকিস্তানের জয়,/ প্রগতির তালে চলিব পা ফেলে, প্রতিক্রিয়ার হবে রুদ্ধশ্বাস/বিভেদের মূল সমূলে উৎপাটি দৈন্য অরাতি করিব নাশ।"

কিন্তু এ-সবই স্বপ্নকল্পনা, দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে এক নয়া জমানার সূচনা ঘটেনি, অতীতের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-হানাহানির জের নিয়েই শুরু হয়েছিল নয়াযাত্রা। দেশভাগের ফলে পূর্বাঞ্চলে জনবিনিময় না ঘটলেও জন-উৎপাটন শুরু হলো বড়ভাবে, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে উদ্বাস্তু মুসলমানরা আসতে শুরু করলেন পূর্ববঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গ থেকে শুরু হলো হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ, বিশেষত সামর্থ্যবান পেশাজীবী হিন্দু শিক্ষিত সমাজ, যাঁদের সঙ্গে কলকাতা মহানগরীর পূর্বতন যোগসূত্র ছিল, তাঁরা অনেকেই দেশত্যাগ করাটা সমীচীন বিবেচনা করলেন। সাতচল্লিশে যে দেশত্যাগের সূচনা তা বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের জনগঠন বা ডেমোগ্রাফি অস্বাভাবিকভাবে আমূল পাল্টে দিয়েছে এবং এই পরিবর্তন দাবি করে নানামুখী পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ। এমনি বিশাল

মাপের কোনো ট্রাজেডি যে ঘটতে পারে সেটা দেশভাগ নিয়ে ব্যস্ত ত্রিপক্ষীয় নেতৃত্বের কারো বিবেচনাতেই ছিল না। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের অদূরদর্শিতার সবচেয়ে বড় নজির হয়ে আছে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের মানুষের জীবনের এই পরম দুঃখভোগ ও লাঞ্ছনা। তবে বাংলায় দেশত্যাগ বড়ভাবে শুরু হলো ১৯৫০ সালের ভয়াবহ দাঙ্গার মধ্য দিয়ে। কলকাতা, নোয়াখালী ও বিহারের দাঙ্গার অভিজ্ঞতা পেছনে ঠেলে সম্প্রীতির অন্বেষায় বিভাজিত হয়েছিল দেশ, কিন্তু দেশভাগ হয়ে উঠলো আরো ব্যাপক রক্তপাত ও হিংস্রতার উৎসভূমি, মানবিক ট্র্যাজেডির নিরিখে দেশভাগের আগের চেয়ে নিষ্ঠুরতর হয়ে উঠলো পরবর্তী বাস্তব, যদিও মানবিক ট্র্যাজেডির এমনি তুলনামূলক বিচার চলে কিনা তা নিয়ে থেকে যায় সংশয়।

দেশভাগের পর থেকেই পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কে স্বাভাবিকতার কোনো স্থান ছিল না। যে চরম বৈরিতা থেকে ঘটে দেশভাগ তা উপচে পড়েছিল অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বিদেশ-নীতি উভয় ক্ষেত্রেই। পূর্ববঙ্গ ও পাকিস্তানের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলের সদস্য রইলেও তাঁদের আনুগত্য নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলা হয়। পাকিস্তান যতোই সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মরাষ্ট্র হওয়ার দিকে এগোতে থাকে, কংগ্রেস দলের অবস্থান ততোই পাকিস্তানবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যে গণপরিষদে বাংলার পক্ষে প্রস্তাবনা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কংগ্রেসের হয়ে উত্থাপন করেননি, করেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে, যদিও তিনি ছিলেন কংগ্রেস দলের সদস্য। পাকিস্তানের জাতীয় কংগ্রেস যদি বাংলার পক্ষে দাবি তোলে তবে তা তৎকালীন আবহে ভারত ও হিন্দুদের মুসলিমবিরোধী ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে, এই আশঙ্কা ছিল প্রবল। অচিরেই অবশ্য পাকিস্তানের কংগ্রেসীরা তাদের দলের বিলুপ্তি ঘোষণা করে পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে চলবার রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দেন। পরিস্থিতি এমনই ছিল যে মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিল এবং সরকার কিংবা দলের যে-কোনো সমালোচনা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত হতে লাগলো। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর সপক্ষে জিন্নাহ যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানেও দেশের ভেতরে ভারতীয় দালালদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সবাইকে সজাগ থাকবার আহ্বান তিনি জানান। বলা যায় পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রাশুরুর পর থেকেই ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধাচরণকে ধর্মের ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ হিসেবে গণ্য করতে থাকে। এর ফলে রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বড় জায়গা করে নিতে থাকে এবং বিদ্বেষ থেকে হিংস্রতা ও পীড়নের পথে এগুতে বিশেষ সময়ের প্রয়োজন হয় না। এই পীড়নের জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ হয়ে আছে ইলা মিত্রের জবানবন্দি, ১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে গ্রেফতারের পর থানায় যাঁকে নির্মমভাবে প্রহারের পর দুটি লাঠির মধ্যে পা ঢুকিয়ে, নির্যাতনকারী পুলিশের ভাষায়, দেয়া হয় 'পাকিস্তানী ইনজেকশন'। নারী হিসেবে, হিন্দু হিসেবে ও কমিউনিস্ট হিসেবে ইলা মিত্রের ওপর পীড়ন পাকিস্তানী রাষ্ট্রের বর্বরতার মাত্রা প্রকাশ করেছিল।

তবে শুরু থেকেই চলছিল বড় এক দ্বন্দ্ব, ধর্মপরিচয়ের মধ্যে জাতিপরিচয় বিসর্জন দিয়ে যে পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়বার চেষ্টা সেখানে স্থান পেয়েছিল সব ধরনের পশ্চাৎমুখিতা। এর বিপরীতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো বহুজাতিক গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদ ক্রমশ বাড়ছিল। সেই চেষ্টার প্রকাশ হিসেবে দেখি ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেতনায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, তা বালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই।' এই ভাষণে অবশ্য বিশেষ পীড়িত বোধ করেছে মাওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত দৈনিক আজাদ, পত্রিকার মতে, 'বিভক্ত ভারতের দ্বিখণ্ডিত বাঙলায় পাকিস্তানী পরিবেশে এই শ্রেণীর কথা শুনিতে হইবে, একথা ভাবা একটু কঠিন ছিল। তাছাড়া কোনো হিন্দু লেখক নয়, একেবারে স্বয়ং ডক্টর শহীদুল্লাহ 'মা প্রকৃতির' এমন বন্দনা গাহিবেন, একথাই বা কে ভাবিতে পারিয়াছিল।'

সমাজজীবনে দেশভাগের বড় রকম আঘাত এসে লাগলো ১৯৫০ সালের দাঙ্গার ফলে। এই দাঙ্গার ভয়াবহতা বিপুলসংখ্যক মানুষকে রাতারাতি তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে উদ্বাস্তু ও দেশান্তরী করে তোলে। সাতচল্লিশ-উত্তর বাঙালি অভিজ্ঞতায় 'পার্টিশন' শব্দবন্ধের সঙ্গে যোগ হয় আরেক ইংরেজি শব্দ 'রিফিউজি'। দেশভাগের পর পর পূর্ববঙ্গ থেকে দেশান্তরণ ঘটেছিল বটে, তবে তা প্রত্যক্ষভাবে দাঙ্গার রক্তপাতের মধ্য দিয়ে ঘটেনি। ঢাকায় তাঁর ভাষণে এই দেশান্তরণের উল্লেখ করে জিন্নাহ বলেছিলেন, ভারতীয় পত্রপত্রিকায় কথিত দশ লক্ষ হিন্দু দেশ ছেড়ে যায়নি, সরকারি হিসেবে এই সংখ্যা হচ্ছে বড় জোর দুই লাখ। দুই লাখ মানুষের দেশত্যাগকে জিন্নাহ অবশ্য বড় সমস্যা হিসেবে দেখেননি, পাঞ্জাবের অভিজ্ঞতা বুঝি তাঁকে বাংলা বিষয়ে এক ধরনের আত্মপ্রসাদ যুগিয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, আমি এটা দেখে সন্তুষ্ট যে সংখ্যালঘুদের প্রতি বিরূপ আচরণের জন্য তাঁরা দেশ ছাড়েননি, গেছেন ভারতীয় যুদ্ধবাজ নেতাদের বেসামাল কথাবার্তার কারণে। কিন্তু ১৯৫০ সালের দাঙ্গা জন্ম দিলো বিশাল উদ্বাস্তু প্রবাহের এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রে অমুসলিমদের বসবাসের অধিকার বিষয়ক আস্থা টলিয়ে দিলো। এই দেশান্তরণ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বাংলা উভয় অংশে সম্প্রীতির সমাজ-নির্মাণ প্রয়াসকে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলো। পূর্ববঙ্গে পঞ্চাশের দাঙ্গা ও পরবর্তী ঘটনাধারায় হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ শিক্ষা ও সংস্কৃতি-চর্চায় বড়রকম ঘাটতি তৈরি করে। দেশের নানা প্রান্ত জুড়ে আদর্শবাদী ও দক্ষ শিক্ষক সম্প্রদায় শিক্ষার যে উচ্চমান তৈরি করেছিলেন তাঁদের বিপুল সংখ্যক সদস্যের আকস্মিক অনুপস্থিতি মানবসম্পদ তৈরির প্রয়াসকে বিপুলভাবে ক্ষুণ্ন করে। সেই সাথে পূর্ববঙ্গের ছোট-বড় বিভিন্ন শহরে নাটমণ্ডপ, সঙ্গীতসভা, পালা-পার্বণ, সম্মিলিত উৎসব ইত্যাদি যে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক আচার বলবান ছিল তা বিপুলভাবে ক্ষুণ্ন হয়। একেবারে রাতারাতি এসব হয়তো ঘটেনি; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এসবে ছিল নাটকীয়তা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল এক নীরব রক্তক্ষরণ।

পাকিস্তান যা করতে চেয়েছে তার অর্জনে বড় সহায়ক হয়ে ওঠে দাঙ্গা ও হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ। এর বিপরীতে জাতীয় চেতনার যে জাগরণ তার স্বাভাবিক অবলম্বন হয় অসাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনা। এক্ষেত্রে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন নিঃসন্দেহে এক মাইলফলক এবং ভাষার জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জাতি তার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের উপাদানগুলো খুঁজে পেতে থাকে। স্মরণযোগ্য যে, ভাষা আন্দোলনের সময়েও করাচির দৈনিক *মর্নিং নিউজ* হেডলাইন করেছিল, ধোতিজ রোমিং ইন দা স্ট্রিট, অর্থাৎ ঢাকার রাস্তায় ধুতিদারদের আনাগোনা, বুঝিয়ে দিতে চাইছিল ভাষা আন্দোলন হিন্দুদেরই কারসাজি।

পঞ্চাশের দাঙ্গা ভারতে ও পূর্ববঙ্গে উভয় স্থানে ভয়াবহ রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পশ্চিম বাংলা, আসাম ও বিহার থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলমান এসে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেয়। সমান্তরালভাবে চলতে থাকে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ। এর ফলে উভয় রাষ্ট্রে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ যে কতোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার পরিমাপ করা কঠিন। হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে যে বাঙালিত্বের সাধনায় ব্রতী তাতে এক স্থায়ী ক্ষত তৈরি করেছিল দেশভাগ ও দেশান্তরণ। একটি ছোট উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় প্রেসিডেন্সি কলেজে মুসলিম ছাত্র ও অধ্যাপকদের উপস্থিতির দিকটি। দেশভাগের আগে মুসলিম বিদ্বজ্জনদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলার এই শীর্ষ কলেজে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত হচ্ছিলেন। তবে তার চেয়েও বড়ভাবে বাড়ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে মুসলিম ছাত্রের উপস্থিতি। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে যেসব মুসলমান ছাত্র ভালো ফল নিয়ে পাশ করতে পারতো তারা বিশেষ কোটা ও বৃত্তির সুবিধা নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সুযোগ পেতেন। এর ফলে প্রত্যন্ত বাংলা থেকেও অনেক তরুণ মুসলমান এসেছে এই কলেজে, তাঁদের কেউ কেউ আবার উঠে এসেছেন একেবারে কৃষিসমাজ থেকে। এমনিভাবে প্রেসিডেন্সিতে পড়তে এসেছিলেন নোয়াখালীর দরিদ্র ইমাম সাহেবের পুত্র মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, বিএ পরীক্ষায় বাংলায় যিনি পেয়েছিলেন রেকর্ড মার্কস্ এবং এমএ পরীক্ষা না দিয়ে বিশ্বভারতী থেকে নিয়েছিলেন সমাপনী শিক্ষা আর হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য শিক্ষক। আরো পরে একাত্তরে তিনি পাকবাহিনীর হাতে নির্মম মৃত্যুবরণ করেন। ঔপন্যাসিক অসীম রায়ের স্মৃতিচারণে জানা যায় শহীদুল্লা কায়সার, নাজমুদ্দীন হাশেম প্রমুখ বন্ধুদের সঙ্গে মিলে বামপন্থী ছাত্র-আন্দোলনে তাঁদের সক্রিয় হওয়ার কথা। পরে দেশভাগ-উত্তর পূর্ব পাকিস্তানে শহীদুল্লা কায়সারকে দীর্ঘকাল কাটাতে হয় কারাগারে এবং একাত্তরে তিনিও শহীদ হন পাকিস্তানী ঘাতকদের হাতে। নাজমুদ্দীন হাশেম হয়ে পড়েন পূর্বতন প্রগতিশীল তরুণের প্রেতচ্ছায়া, বামপন্থী পরিচয় সর্বতোভাবে গোপন রেখে তাঁকে চলতে হয় গোটা পাকিস্তানী জমানায়, অতীত নিয়ে বাঙ্ময় হয়ে উঠতে পারলেন কেবল জীবনসায়াহ্নে, স্বাধীন বাংলাদেশে। পঞ্চাশের দাঙ্গায় আবুল হাশিমের বর্ধমানের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল দাঙ্গাবাজরা। পরম বেদনাহত হয়ে প্রচণ্ড অভিমানে বাড়িঘর-বিষয়সম্পত্তি প্রায় ফেলে রেখে দেশ ছেড়েছিলেন তিনি, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী-দলীয় এই নেতা শরৎ বসুর সঙ্গে মিলে উত্থাপন করেছিলেন স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব। এর আগেই তো কলকাতার পাট

ঢুকিয়েছিলেন এ.কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, যদিও সোহরাওয়ার্দীর পাকিস্তান প্রবেশে নানা বাধা-নিষেধ দাঁড় করিয়েছিল করাচির প্রশাসন। সব মিলে পশ্চিমবঙ্গের সমাজে মুসলিম অংশীদারিত্বে এমন এক ঘাটতি তৈরি হয়েছিল যা আজও পূরণ হয়নি। বেঙ্গল প্যাক্টের সূত্র ধরে নানা জটিলতা ও বাধা উতরিয়ে হিন্দু-মুসলিম মিলিত কর্মের যে ক্ষেত্র ক্রমে বিকশিত হচ্ছিল পার্টিশন তাতে যেন এক পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলো। বিকাশের পথ কেবল রুদ্ধ হয়নি, অগ্রসর শিক্ষিত মুসলিম সমাজের সদস্যদের ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ সম্মিলিত সাধনার ক্ষেত্র একেবারে সঙ্কুচিত করে ফেলে। আর পশ্চিমবঙ্গের ওপর বাড়তি বোঝা হয়ে ওঠে বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুর চাপ, যা মহানগরী কলকাতাসহ পশ্চিমবাংলার জীবনধারা বড়ভাবে পালটে দিয়েছে।

দেশভাগের জের বহন করে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের যে যাত্রা সেখানে উভয়ের সমস্যার মাত্রা ভিন্নতর রূপ গ্রহণ করে। ১৯৫০ সালে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ভারত যাত্রা শুরু করলেও পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন আর হয়ে ওঠে না। এক মানুষ এক ভোটের ভিত্তিতে যে গণতন্ত্র তা মানতে গেলে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় বাঙালিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ফলে গণতন্ত্রের পথে পা বাড়ানো পাকিস্তানের জন্য মুশকিল হয়ে ওঠে। তুলনামূলকভাবে ভারত যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল তার চেয়ে অনেক পিছিয়ে এসে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়। পাকিস্তান যে মুসলমানের দেশ, সর্বজনের প্রজাতন্ত্র নয়, সেটা প্রায় অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাষা প্রশ্নে শাসকদের অবস্থানে এর এমন একটা সাংস্কৃতিক পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায়, রাজনীতিতেও যার প্রভাব ছিল ব্যাপক। দেশভাগ-পূর্ববর্তী বঙ্গীয় সমাজে মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম লীগের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও তা ছিল নানা ধারা-উপধারায় বিভক্ত। ঢাকার নবাব খাজা নাজিমউদ্দিন রক্ষণশীল অংশের প্রতিনিধিত্ব করতেন, এর বিপরীত অবস্থান ছিল আবুল হাশিমের প্রভাবাধীন তরুণদের, সোহরাওয়ার্দী ছিলেন উদারবাদী অংশের নেতা, আর ফজলুল হক ব্যাপক জনপ্রিয়তাসম্পন্ন লোকনেতা, বিশেষত কৃষকসমাজের কাছে বিপুলভাবে আদৃত। দেশভাগ-উত্তরকালে ভাষা ও জাতীয় অধিকার প্রশ্নে মুসলিম লীগ যে অবস্থান গ্রহণ করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থিত হতে বিলম্ব হয়নি; কিন্তু এই প্রতিবাদকে সংগঠিত রাজনৈতিক রূপ দান ছিল বিশেষ কষ্টকর। সেই লক্ষ্যে প্রধান যে প্ল্যাটফর্ম আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪৯ সালের জুন মাসে, যেখানে মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান উভয়ে শামিল হন, সেই দলের নাম রাখা হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। মুসলিম নাম ধারণ করা ছাড়া রাজনৈতিক দলের কর্ম পরিচালনা কষ্টকর ছিল, তবে কেবল সে-বাস্তবতা নয়, সদ্যপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তা দ্বারা যে কতো বিপুলভাবে আচ্ছন্ন ছিল তার প্রতিফলন এখানে মেলে।

বাঙালির মোহমুক্তি ও জাতীয় চেতনায় সম্পৃক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয় বায়ান্নোর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে ঘিরে এবং একুশে ফেব্রুয়ারি হয়ে আছে এই জাগরণের প্রতীক। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ স্বাভাবিকভাবে বরণ করে জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ধর্মভিত্তিক মেকি জাতীয়তাবোধের বিপরীতে তা ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক

জাতীয়তার শক্তি মেলে ধরে। এর স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছিল রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহারের অপপ্রয়াস খণ্ডন, জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত সকল মানুষের অভিন্নতার যে মিলনক্ষেত্র সেটা তো ধর্মীয় বিভাজনের উর্ধ্বে, আর তাই অসাম্প্রদায়িকতা হয়ে ওঠে এর মূল বাণী, এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের মোহমুক্তি ঘটতেও আর বিলম্ব হয় না। এর প্রতিফলন হিসেবে খুবই দ্রুত আওয়ামী মুসলিম লীগ, কার্যত যা ছিল মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিপরীত চেতনাবাহী কিন্তু পরিস্থিতির চাপ এড়াতে না পেরে পাকিস্তানে মুসলিম তকমা এঁটে চলার চেষ্টা শুরু করেছিল, বিসর্জন দেয় সেই ধর্মভিত্তিক দল-পরিচয় এবং বাঙালি জাতিসত্তার মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণরূপে ধারণ করে, হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগ।

বায়ান্নো থেকে শুরু হয়েছিল এক নতুন যাত্রা, তবে একান্ত নতুন বলাটা বোধহয় সঙ্গত হবে না। কেননা পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির অখণ্ড সত্তার সামগ্রিক বিকাশ সম্পর্কে সচেতন মানুষ ও ধারা তো সমাজে বরাবরই সক্রিয় ছিল। এমনকি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পক্ষে পূর্ববঙ্গের সামন্ত ধনিক ও নব্যশিক্ষিত মুসলমানদের সমর্থন বলবান করতে ব্রিটিশ সরকার যখন বিশেষ সক্রিয় ছিল তখনও ব্যারিস্টার আবদুল রসুলের মতো ব্যক্তিত্ব জাতীয়তাবাদী চেতনার অখণ্ডতা সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। সমাজে বিভিন্ন ধরনের যে-বিভাজন তার একটি ধর্মভিত্তিক বাস্তবতাও ছিল, ছিল এর বিভিন্ন ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কার্যকারণ। চিত্তরঞ্জন দাশ একই জাতিসত্তার দুই ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে মিলন ও সমন্বয় সাধনের রাজনৈতিক পথানুসন্ধান করে যে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন তা কখনোই একেবারে হারিয়ে যায়নি। বামপন্থী আন্দোলনে মুসলিম অংশগ্রহণ, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সমন্বিত জাতিচেতনায় মুসলিম অংশভাক যেমন এর একটি দিক তেমনি আবুল হাশিম-শরৎ বসু প্রণীত স্বাধীন অখণ্ড বাংলার দাবির মধ্যে নিহিত ছিল সমন্বিতভাবে রাষ্ট্র ও জীবন পরিচালনার দিকদর্শন। উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতার ফলে বিভাজনের নীতি সর্বপ্লাবী হয়ে যে-পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছিল তার মধ্যে মিলন ও সমন্বয়ের ঐসব প্রয়াসের প্রত্যাখ্যান বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হলেও তার কবর রচিত হয়নি এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রকে গঠনগত কৃত্রিমতা ও জাতিগত নিপীড়ক ভূমিকা পালন থেকে মুক্ত করে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও জাতিগত অধিকারের রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই প্রয়াস বিকাশের একটি পথ যেন খুঁজে পায় এবং এমনি অভিযাত্রায় শরিক হয় পূর্ববঙ্গের ব্যাপক তরুণ-সমাজ যাঁরা অল্প কিছুকাল আগেও ছিলেন পাকিস্তানী দ্বিজাতিতত্ত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন, এবার সচেতন হতে শুরু করলেন জাতিগত পীড়নের দাগগুলো সম্পর্কে।

এর পরবর্তী ইতিহাসের ধাপগুলো আমাদের জানা। পূর্ববঙ্গে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক সভার নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি এবং ফজলুল হক-ভাসানী-শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় জাতীয়তাবাদী শক্তির রাজনৈতিক উত্থান সূচিত করে; কিন্তু নানা অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতাগ্রহণ ও পরিচালনাকে বাধাগ্রস্ত

করে চলে। পূর্ববঙ্গের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এ.কে. ফজলুল হক ১৯৫৪ সালের এপ্রিল-মে মাসে কলকাতা সফরে এসে আবেগতাড়িত কয়েকটি ভাষণ দেন। যে মহানগরীতে সমন্বয় ও মিলনের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক সত্তার বিকাশ সেই জীবনসাধনার পীঠস্থান কলকাতার নতুন বাস্তবতার পটভূমিকায় পূর্ববঙ্গের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিনিধি হিসেবে পা রেখেছিলেন বিরাশি বছরের এই শেরে বাংলা। তাঁর বিভিন্ন ভাষণে আবেগের আতিশয্য বাঁধ মানতে চায়নি, তবে তিনি রাজনীতির বর্তমান বাস্তবতার দিকে চোখ রেখে কথা বলেননি, বলেছিলেন প্রাজ্ঞ দূরদর্শী দৃষ্টি নিয়ে অতীতকে ভবিষ্যতের সঙ্গে গেঁথে। পাকিস্তান ও ভারত দুই রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রতি মান্যতা দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন সমন্বিত জীবনসাধনার কথা। তাঁর এই ভাষণ নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য, যদিও একে ব্যবহার করে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মহলের ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ এই ভাষণকে অন্যভাবে চিহ্নিত করেছে। ফজলুল হক বলেছিলেন, "আজ আমাকে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস-গঠনে অংশগ্রহণ করিতে হইতেছে। আশা করি 'ভারত' কথাটির ব্যবহার করায় আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। আমি উহার দ্বারা পাকিস্তান ও ভারত উভয়কেই বুঝাইয়াছি, এই বিভাগকে কৃত্রিম বিভাগ বলিয়াই আমি মনে করিব।" তিনি আরো বলেন, "পাকিস্তান বলতে প্রকৃতপক্ষে কিছুই বোঝায় না। ইহা বিভ্রান্তি সূচনা করিবার একটি পন্থা মাত্র। ইহা কেবল উদ্দেশ্যসাধনের উপায় মাত্র।"

ফজলুল হকের বক্তব্যের তাৎপর্য বোঝা পাকিস্তানী রাজনীতিবিদদের সাধ্যের অতীত ছিল, তবে একে ব্যবহার করে স্বার্থ হাসিল তাদের পক্ষে দুষ্কর ছিল না। ঢাকায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অন্তরীণ করে গৃহবন্দি করা হয়, বাতিল করা হয় পয়তাল্লিশ দিনের যুক্তফ্রন্ট সরকার। যুক্তফ্রন্ট আবার ক্ষমতা ফিরে পেলেও বিবিধ ষড়যন্ত্রের ধাক্কা সামলাতে পারে না এবং আপোসের পথেই তাদের এগোতে হয়। এই আপোসের প্রতিফলন মেলে ১৯৫৬ সালে গৃহীত পাকিস্তানের সংবিধানে যখন দেশটিকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। একই সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভারসাম্য আনতে পশ্চিমের চারটি প্রদেশ বিলুপ্ত করে গঠিত হয় এক ইউনিট এবং পাকিস্তানের দুই ইউনিটের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারের সাম্য আনা হয়, কার্যত পূর্ববঙ্গের অধিকার খর্ব করে। সেইসঙ্গে 'পূর্ববঙ্গ' প্রদেশের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'পূর্ব পাকিস্তান', তবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হলেও পাকিস্তানের আর প্রজাতন্ত্র হয়ে ওঠা হয় না, ইসলামী যে কতোটা হয় সেটা তো আজো প্রশ্নবিদ্ধ। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের দাবি-দাওয়ার মুখে ১৯৫৮ সালে জারি করা হয় সামরিক শাসন এবং সব ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকারহীনতার মধ্য দিয়ে চলতে হয় দেশবাসীকে। পাকিস্তানে শক্ত ফৌজি শাসন কায়েমের প্রধান লক্ষ্য ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক এই রাষ্ট্রের কৃত্রিমতাকে স্থায়ী রূপ দেয়া। তাই দেখা যায় সামরিক শাসকেরা দ্বিজাতিতত্ত্বের সবচেয়ে উৎসাহী সমর্থক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কারণে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষার প্রশ্নে কিছুটা ছাড় দিতে হলেও জাতীয় অধিকার প্রদানে তাদের ছিল প্রবল অনীহা।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদযাপনকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বাঙালিত্ব বোধ, সচেতন নাগরিক সমাজের সঙ্গে ক্ষমতাসীনদের বিরোধ জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সম্ভাবনা নিয়ে জেগে ওঠে। একই সঙ্গে সোচ্চার হতে থাকে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট ক্ষোভ। সর্বোপরি ছিল রাজনৈতিক অধিকারহীনতা মোচনের তাগিদ। শাসকচক্র এর বিরুদ্ধে তাদের সাম্প্রদায়িক অস্ত্র ব্যবহারে কোনো কসুর করেনি। ১৯৬৪ সালের ভয়াবহ দাঙ্গা এর নির্মম প্রকাশ। পরবর্তী বছর ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধকে ব্যবহার করে বৈরিতার চরম প্রকাশ ঘটানো হয়। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির কারণ দেখিয়ে গ্রেফতার করা হয় যথেচ্ছভাবে এবং এর মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়দের ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ভারত, বিশেষভাবে পশ্চিমবাংলার সঙ্গে সব ধরনের সাংস্কৃতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। বই, পত্র-পত্রিকা আমদানি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ভারতীয় ও বাংলা ছায়াছবির প্রদর্শনী বন্ধ করা হয়। রেল ও সড়ক যোগাযোগ সীমিত করে তোলা হয়। সর্বোপরি পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত বিপুলসংখ্যক অমুসলিমের জীবনের মৌলিক অধিকার হরণ করে জারি করা হয় 'শত্রু সম্পত্তি আইন অধ্যাদেশ', দেশের এক বৃহৎ নাগরিক গোষ্ঠী গণ্য হন দেশের শত্রু রূপে তাদের সম্পত্তি অধিগ্রহণ রাষ্ট্রের ক্ষমতাভুক্ত হয়।

দেশভাগ পাঞ্জাবে রক্তাক্ত দাঙ্গা ও জনবিনিময়ের বর্বরতার জন্ম দিয়েছিল। ১৯৪৭-উত্তর দিনগুলোতে চরম হিংস্রতার সঙ্গে ঘটেছিল শেকড় থেকে জনগোষ্ঠীর উৎপাটন ও উৎসাদন। পূর্ববঙ্গে সেই কাজটি ঘটেনি, কিন্তু সমচরিত্রের প্রক্রিয়া চলেছে দীর্ঘ সময় জুড়ে, কখনো প্রকাশ্যে, কখনো অন্তঃসলিলাভাবে। সেই প্রচেষ্টা বুঝি সার্থকতা পেল ১৯৬৫ সালে এসে, দাঙ্গা, পীড়ন, সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা এবং শত্রু সম্পত্তি আইনের মধ্য দিয়ে। যে বিভাজন ও উৎসাদনের নীতি নিয়ে দেশভাগের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা এক পরিপূর্ণতা পেল ১৯৬৫ সালে।

কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় সমাজের যে অন্তর্নিহিত শক্তি, যে শক্তি অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধের মধ্য দিয়ে জাতীয় জাগরণের ইঙ্গিত বহন করছিল তা সমান্তরালভাবে লড়াই অব্যাহত রেখে চলছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের পটভূমিকায় শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয়-দফা প্রস্তাব ঘোষণা করে এককেন্দ্রীক ব্যবস্থাসম্পন্ন সর্ব-পাকিস্তানভিত্তিক রাজনীতির বিপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ ও জীবনপরিচালনার দাবিনামা উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবনায় ক্ষিপ্ত আইয়ুব খান হুঙ্কার ছেড়ে বলেছিলেন, এসব হচ্ছে বৃহত্তর বঙ্গ গঠনের পরিকল্পনা। এই দুই ধারার রাজনীতির দ্বন্দ্ব পতন ডেকে আনলো আইয়ুব খানের এবং নব-অধিষ্ঠিত স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের জন্মের পর এই প্রথম সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হলেন, এক মানুষ এক ভোট নীতি গৃহীত হলো এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল করে পুনরুজ্জীবন ঘটলো পূর্বতন প্রদেশগুলোর। বেলুচ, সিন্ধি, পাঞ্জাবিদের পাশাপাশি পাঠানরাও পেল তাদের জাতীয় অধিকার, যদিও তাদের প্রদেশের নাম রয়ে গেল ইংরেজ শাসকদের প্রদত্ত এনডব্লিউএফপি বা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। ১৯৭০ সালের সেই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

নেতৃত্বে আওয়ামি লীগের অভূতপূর্ব বিজয় এবং সর্বপাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন শাসকদের জন্য অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির জন্ম দিলো। ইসলামী প্রজাতন্ত্রে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব প্রদেশের জাতীয়তাবাদী বাঙালিরা, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বটে, কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী নয় পেল নিরঙ্কুশ বিজয়। পাকিস্তান এতোদিন যে যুক্তিতে এককেন্দ্রীক শাসনব্যবস্থা শক্তভাবে বজায় রেখেছিল এবার সেটাই তাদের জন্য বুমেরাং হয়ে উঠলো। নির্বাচন ও জনমতের ক্ষেত্রে তাদের পরাজয়কে মেনে নিয়ে স্বশাসিত প্রদেশসম্পন্ন ফেডারেল ব্যবস্থা কায়েম ছিল পাকিস্তানের জন্য উত্তরণের পথ। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক রাষ্ট্রের অসারতা এতো সহজে দূর হওয়ার ছিল না, তাই বর্বর সামরিক শক্তি নিয়ে নৃশংস গণহত্যায় মেতে উঠলো পাক শাসকগোষ্ঠী কিন্তু রক্তস্রোত বইয়ে দিয়েও বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ বানচাল করতে তারা ব্যর্থ হলো, মহান এক মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় ঘটলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের।

পূর্বাংশে দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবসান ঘটলো বটে কিন্তু রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিষবৃক্ষের যে শিকড় সমাজের গভীরে জারিত হয়েছিল তার থেকে রক্ষা পাওয়া তো ততো সহজ নয়, লড়াইয়ের নাটকীয়তার মতো জয়-পরাজয় এতে নেই, এ-হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন ও দৃঢ়পণ এক সংগ্রাম, সংস্কৃতি, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি তথা সামগ্রিক জীবনদৃষ্টিভঙ্গির সুস্থ ও স্বস্থ বিকাশ এর সঙ্গে জড়িত। ক্রমান্বয়ে আরো স্পষ্ট হচ্ছে যে, জীবনের পরতে পরতে চলছে অসুস্থতার বিরুদ্ধে সুস্থতার এই লড়াই। বাংলাদেশ পর্ব তেমনি এক লড়াইয়ের অব্যাহত কাহিনী, যেখানে পশ্চাদপসরণ ঘটেছে অনেকভাবে কিন্তু লড়াই কখনো থেমে থাকেনি।

১৯৪৭ সালের দেশভাগ ফারাক টানা ভৌগোলিক বিভাজন ছিল না। সিরিল র‍্যাডক্লিফের দাগ দেয়া টানা কেবল মাটির ওপর নির্দোষ ফারাক টানা ছিল না, এই রেখা বাংলার দুই প্রধান জনগোষ্ঠী, তারা যে যেখানে যে অবস্থানে থাকুক না কেন, উভয়ের সকল সদস্যের জীবনবাস্তবতাকে বিভাজিত করার উদ্দেশ্যে টানা হয়েছিল। এর আদর্শগত বাহক হিসেবে জন্ম হয়েছিল পাকিস্তানের, ভারত সাম্প্রদায়িক সব জটিলতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে গ্রহণ করেনি বটে; কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভাজন টানবার রেখা পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশে বসবাসকারী হিন্দু-মুসলমানকে সমানভাবে বিভক্তি-বিষে দূষিত করতে চাইলো। প্রতিটি সমাজ এই সমস্যা মোকাবিলায় তার মতো করে সংগ্রাম করেছে। সেখানে বাইরে থেকে নেমে এসেছে অভিঘাত, ক্ষমতাধরদের, রাষ্ট্রের আর পাকিস্তান যেহেতু বিভাজনকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল, জনবিনিময়কে উদ্দেশ্য হাসিলের অবলম্বন করেছিল তাই সংখ্যালঘুরা যেমন হলো নানামুখী পীড়নের শিকার তেমনি সংখ্যাগুরুর মানসকে উদার ও অসাম্প্রদায়িক করে তোলার আয়োজন রোধে তৈরি হলো নানা বাধা। এর একটি হিংসাত্মক ইতিহাস রয়েছে, দাঙ্গা ও দেশত্যাগের ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা তার মাইলফলকগুলো দেখার চেষ্টা নেই, কিন্তু এর পরতে পরতে যে বেদনা মিশে আছে তার হদিশ কে করবে! করা তো দূরের কথা, করবার চেষ্টা নেয়াটাও

পাকিস্তান আমলে ছিল প্রায় নিষিদ্ধ, লিখিত আদেশ না থাকলেও অলিখিতভাবে এক লক্ষণরেখার অস্তিত্ব টের পাওয়া যেত। পাকিস্তান আমলে সামাজিক বিশ্লেষণে ইতিহাসের পাঠগ্রহণে দাঙ্গা ও দেশান্তর প্রশ্নটি বিশেষ বিবেচিত হতে পারেনি, এমনকি সাহিত্যিকের কলমেও তা উঠে আসতে পারেনি, যদিও এই নিদারুণ অভিজ্ঞতায় উভয় সম্প্রদায়ের সংবেদনশীল মানুষ হয়েছিলেন গভীরভাবে পীড়িত। এমনকি পশ্চিমবাংলা থেকে শিকড় উৎপাটিত হয়ে যে মুসলমান উদ্বাস্তুরা এসেছেন পূর্ববঙ্গে তারা তাদের 'ফেলে আসা গ্রাম' নিয়ে প্রকাশ্য কোনো আবেগ প্রকাশ করতে পারেননি। সরকারি বিবেচনায় তারা তো বিধর্মীর দেশ ছেড়ে এসেছেন মুসলমানের পবিত্র ভূমিতে, এখনও যদি তাদের পিছুটান থাকে তবে সেটা তো হবে শত্রুদেশ হিন্দুস্তানের জন্য অন্তরের টান, তেমন অনুভূতি তো পাকিস্তানের জন্য অনুমোদনযোগ্য হতে পারে না। ফলে দেশভাগের সাহিত্য কিংবা দেশভাগের বিশ্লেষণ পাকিস্তান আমলে ছিল প্রায় দুর্নিরীক্ষ্য। যে আবুল হাশিম যুক্তবঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তিনি পাকিস্তান আমলে বিষয়টি নিয়ে কোথাও কোনো উক্তি করেননি, কেউ তাঁকে এ-বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসাও করেনি। রাহাত খান যে লিখলেন 'আমাদের বিষবৃক্ষ' কিংবা হাসান আজিজুল হক 'আগুনপাখি' সেজন্য তাদের প্রায় চল্লিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। এর জের সাম্প্রতিক বিবেচনাতেও এসে উপচে পড়েছে, দেশভাগের অভিঘাত কিংবা দাঙ্গা ও দেশত্যাগের ফলে পূর্ববঙ্গীয় সমাজের বিকলাঙ্গতার বিষয়টি আলোচনার প্রায় বাইরে থেকে যায়, বাংলাদেশের উজ্জ্বল অভ্যুদয় হয়ে থাকে বিবেচনার বিষয়। এশিয়াটিক সোসাইটি তিন খণ্ডে যে 'বাংলাদেশের ইতিহাস' প্রণয়ন করেছে সেখানে দেশভাগের পর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর নির্বাচন ও স্বায়ত্তশাসন, স্থানীয় সরকার, বাম রাজনীতি এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে আলোকপাত করা হলেও দেশভাগের অভিঘাত থেকে গেছে বিবেচনার বাইরে। ফলে এটুকু অন্তত বলা যায়, দেশভাগ বাঙালির অন্তরে যে বিভাজনরেখা টানতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হয়েছিল তার জের আমরা এখনও মুছে ফেলতে পারিনি। পারিনি, সেটা তো সাম্প্রতিক সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনাধারায় নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। বাংলাদেশের উজ্জ্বল আবির্ভাব যে আবারও পতন-অভ্যুদয় পথ বেয়ে চলতে শুরু করলো সেটা তো সমাজদেহে এই বিষময়তারই ফল। ১৯৭৫ সালে নৃশংসভাবে নিহত হলেন অসাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতির আদর্শবহ বাঙালি নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং এই হত্যার জের ধরে সংবিধান থেকে বিলুপ্ত হলো ধর্মনিরপেক্ষতার ধারা, প্রারম্ভিকে যুক্ত হলো ধর্মীয় অনুষঙ্গ, আর পরবর্তী সময়ে আরেক স্বৈরশাসক যোগ করলেন রাষ্ট্রের ধর্ম হিসেবে ইসলামের অধিষ্ঠান। এর পাশাপাশি শিক্ষা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রেও চলেছে বিষয়ময়তার সঞ্চার, আন্তর্জাতিক আবহ থেকে অনুকূল হাওয়া পেয়ে ঘটেছে জঙ্গি ও হিংসাত্মক ইসলামের প্রসার, বাংলার সুফি ইসলামের বিপরীত মেরুতে যার অবস্থান। এসব বিষময়তার প্রভাবে দাঙ্গা ও সংঘাত থেকে আমরা মুক্তি পাইনি, বরং তা আরো নানাভাবে জেঁকে বসেছে, সম্প্রীতির আবহ ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে, মিলনের আদর্শ খুঁজে পাচ্ছে না পথ।

এসবই সঙ্কটময়তার চিত্র; কিন্তু এমনই তো ছিল, কিংবা বলা যায় এর চেয়েও আরো গভীর অন্ধকারের নিমজ্জন থেকে পূর্ববঙ্গের মানুষ উঠে এসেছেন আলোর পথে, পাকিস্তানী দ্বিজাতিতত্ত্ব অস্বীকার করে মিলন মিশ্রণ সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মানবিক বিকাশের পথ রচনা করেছেন তাঁরা। সেই অগ্রপথিকরা আমাদের আদর্শ, তাদের কর্মপথের রেখা ধরে অগ্রসর হওয়ার মতো মানুষ সমাজে নিশ্চয় রয়েছে। সেই ইশারাও তো নানাভাবে মেলে এবং সম্প্রীতি ও মিলনের শক্তিতে বলীয়ান ভাবী বাঙালির আবির্ভাবের প্রত্যাশায় আমরা পুনরায় উজ্জীবীত হতে পারি।

বিভাজনকে অতিক্রম করে সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটাবার কাজটি সহজ নয়। সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নাশে সমস্যার নিরসন ঘটেনি, অন্তত বাংলাদেশের উদ্ভব ও পরবর্তী ঘটনাধারা সেটা তো ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। বিষবৃক্ষের শিকড় প্রবেশ করেছে মাটির অনেক গভীরে, নিরসনের প্রক্রিয়া যদি সেই গভীরে না পৌঁছতে পারে তবে সমাজদেহে বিষ যেমন থেকে যাবে, তেমনি বিষময়তার উদগারণও বারংবার ঘটে চলবে। উপমহাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশ শতক জুড়ে অনেক হানাহানি সংঘাত পীড়ন, বিশেষভাবে ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়েছে। তাতে কোনো পক্ষই কোনোভাবে লাভবান হয়নি; বরং প্রশ্ন জাগে সংঘাতময়তা কি উভয় পক্ষকে নির্দয়া অমানবিক করে তোলে না? বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী কী করে এমন নৃশংস ও বর্বর গণহত্যা পরিচালনা করতে পারলো, নারী-পুরুষ-শিশু থেকে শীর্ষ বুদ্ধিজীবী প্রবীণ অধ্যাপক যে-নির্মমতা থেকে কেউ রেহাই পায়নি, মানুষকে এতোটা নিষ্ঠুর করে তোলা কীভাবে সম্ভব হলো সেটা সমাজতাত্ত্বিক ও মনোবিশ্লেষকদের একটা জিজ্ঞাসা বটে। পাঞ্জাব বিভাজনে যারা নির্মমতার উদগাতা কিংবা নির্মমতার শিকার, উভয় দিকে নিশ্চয় বিদ্বেষের বিষভাণ্ড উপচে পড়েছিল। সেই বিষময়তাই কি পাঞ্জাবি সেনাবাহিনীকে বাংলায় এমন নৃশংস করে তুলেছিল? ভারতীয় পাঞ্জাবে সংঘাত যে নিষ্ঠুর পর্যায়ে পৌঁছেছিল সেখানেও কি সেই অতীত বিদ্বেষী অবস্থান ও সংঘাতের কোনো ছায়াপাত ছিল? অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের এক কোটি মানুষ বিতাড়িত হয়েছিল স্বদেশভূমি থেকে, জনবিনিময়ের অসমাপ্ত কাজেরই বুঝি আরেক প্রকাশ, তারা আশ্রয় পেয়েছিল পশ্চিমবাংলা, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরায়, ত্রিপুরার জনসংখ্যার চেয়ে শরণার্থীর সংখ্যা ছিল বেশি, কিন্তু এই বিপুল শরণার্থীর বোঝা বইতে ব্যাপক মানুষের মনে কোনো দ্বিধা বা সংশয় ছিল না, সেটা কি তাদের জীবনের দেশান্তরী উদ্বাস্তু অভিজ্ঞতার বেদনাময়তা থেকে সঞ্জাত, যে বেদনা জন্ম দিয়েছিল এমন অবিশ্বাস্য মানবিক শক্তির। দেশভাগকে আমরা পূর্ণমাত্রায় বুঝেছি কিনা সেই সন্দেহ তাই থেকে যায়। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই বিভাজনকে অতিক্রম করা ছাড়া আমরা মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে পারবো না, সীমান্তের এপার-ওপার কোনোখানেই নয়।

দেশভাগ ও সাংস্কৃতিক অভিঘাত

খুব বিস্ময়করভাবে, পাকিস্তান আমলে, দেশভাগ বিষয়ক আলোচনার ওপর এক ধরনের অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। অলিখিত বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, এর পেছনে প্রতাপশালী কর্তৃত্বের মদদ অনুভব করা যায়, একে হাতে-কলমে শনাক্ত করা যায় না। অপরদিকে এর থাকে এক ধরনের সামাজিক স্বীকৃতি, যে প্রবণতাকে অনেকে 'সোশ্যাল সেন্সরশিপ' হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। পীড়নমূলক এক যুগের এমনি বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত উদারবাদী অপর যুগে এসে অনেকের পক্ষে বুঝে-ওঠাও মুশকিল হয়ে পড়ে। কেউ হয়তো বলতে পারেন, কোথায় সেই সেন্সরশিপ দেখান আমাকে? আবার কেউ বলতে পারেন, সামাজিক কোনো গণ্ডি যদি টানা থেকে তো সেটা না মানলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়, মানতেই হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়ে রেখেছে? এর কার্যকারণের চুলচেরা বিশ্লেষণ বড় জটিল ও বহুমাত্রিক বিষয়, আমরা কেবল এই বৈশিষ্ট্যটুকু মেলে ধরতে পারি যে, দেশভাগ এক বিপুল প্রভাবসম্পন্ন পরিবর্তনের উৎসমুখ খুলে দিলেও, সেই পরিবর্তনের আকস্মিক আঘাতে বহু মানুষের জীবন তচনচ হয়ে গেলেও, এবং এমনকি এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবে উপমহাদেশ জুড়ে, বিশেষভাবে উত্তর ভারত ও বৃহৎ বঙ্গদেশ জুড়ে টালমাটাল সব পরিবর্তন ঘটলেও, এর সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ে ব্যাপক বিচার-বিশ্লেষণ তো দূরে থাক, সুস্থ স্বাভাবিক নির্মোহ অ্যাকাডেমিক আলোচনাও বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। ফলে পাকিস্তান আমলে দেশভাগ নিয়ে বইপত্র প্রকাশিত হয়নিই বলা চলে, এর রাজনৈতিক পটভূমি আলোচনা ছিল বিপজ্জনক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অভিঘাত বিষয়ক পর্যালোচনা এড়িয়ে চলাটা ছিল নিরাপদ। এখন যেমন মুক্তচিন্তার প্রকাশ ঘটলে দেশের ভাবমূর্তি অথবা ধর্মের পরমত্ব ক্ষুণ্ন হওয়ার অভিযোগ ওঠে, তখন ছিল 'অখণ্ড বাংলার' জুজু, সব কিছুতে টেনে আনা হতো সেই জুজু, দেশভাগ নিয়ে আলোচনায় ছিল তাই জুজুর ভয়।

অথচ আমরা জানি, দেশভাগ অনেক বড় ধরনের সংকটের জন্ম দিয়েছে, ঐতিহ্যগতভাবে পরস্পর পাশাপাশি মিলেমিশে যে জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা দীর্ঘকাল একত্রে বসবাস করে এসেছে, তাদের মধ্যকার বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা ও পার্থক্য ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে তারা যে

একক জাতিসত্তা হিসেবে জীবন পরিচালিত করে এসেছে সেক্ষেত্রে দেশভাগ কেবল একটি ভৌগোলিক বিভাজনরেখা হয়ে ওঠেনি, তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিভেদ ও দ্বন্দ্বের বিষধারা বইয়ে দিয়েছিল। ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য মানবগোষ্ঠীর সহজাত বৈশিষ্ট্য, জোর করে এই ভিন্নতা মোচন না করে পার্থক্যকে মান্য করে একত্রে চলবার মধ্যেই তো সভ্যতার সাধনা। বিপরীত পক্ষে ভিন্নতাকে চরম হিসেবে মেনে মিলনের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে মুখ্য করার ফলে বিভিন্ন সময় কত বিপুল মূল্যই না মানবগোষ্ঠীকে দিতে হয়েছে! এরই এক প্রবল প্রকাশ আমরা দেখি দেশভাগ ও তজ্জনিত সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ায়।

সংঘাতের কারণেই ঘটেছে দেশভাগ। সমাজে ধর্মপরিচয়ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যেসব সমস্যা দীর্ঘ ইতিহাস থেকে বহুবিধ কারণে ধীরে ধীরে জমা হয়েছিল তা দূর করবার বাস্তব ব্যবস্থাগুলো ক্রমে গৌণ হয়ে উঠলো, বিভাজনের মধ্য দিয়েই মিলবে এর সমাধান, এমন একটি বোধ হয়ে উঠেছিল সর্বগ্রাসী এবং কল্পিত জাতিসত্তাবোধ থেকে সৃষ্ট হানাহানি রক্তগঙ্গার পথ বেয়ে পরিণত হলো খাণ্ডবদাহনে। ক্রমসম্প্রসারিত দাঙ্গার তীব্রতা নগর ছাপিয়ে গ্রামসমাজেও বিস্তার লাভ করলো, গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর ধারাবাহিকতায় নোয়াখালী ও বিহারের গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো দাঙ্গা এবং বিমূঢ় রাজনীতিবিদদের কাছে সমাধানের অন্য সূত্রগুলো ম্লান হয়ে গেল, দেশভাগ হয়ে উঠলো অবধারিত।

কিন্তু দেশভাগ যে-সমস্যা মোচনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ঘটেছিল সেই সমস্যাকে তা আরো তীব্র করে তুলেছিল, জন্ম দিয়েছিল নতুনতর ও জটিলতর সমস্যার।

১৯৪৭-এর মধ্য-আগস্টে যে মুহূর্তে দেশভাগ ঘটলো তা চকিতে পাল্টে দিলো রাষ্ট্রের নিরিখে ধর্মসম্প্রদায়ের সংখ্যাগত অবস্থান। পৃথক আবাসভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে অখণ্ড উপমহাদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানরা রাতারাতি পরিণত হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে। অপর দিকে বাংলা প্রদেশে সেন্সর হিসেবে হিন্দু জনসংখ্যার তুলনামূলক লঘিষ্ঠতা আগেই দেখা গিয়েছিল এবং এর প্রতিফলন ঘটেছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার গড়ন ও প্রাদেশিক সরকারের চরিত্রে। মুসলিম প্রতিনিধিদের সংখ্যাগত প্রাধান্য এতে প্রতিফলিত হলেও তাতে ছিল আদর্শগত বিভিন্ন ধারা—শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল ছিলেন মিলন ও সম্প্রীতির বাণীবহ, অপরদিকে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের রক্ষণশীল অংশ ছিল বিভাজনকে মুখ্য করে তোলার প্রধান উদগাতা। পাকিস্তানের অংশী নবগঠিত পূর্ববঙ্গ প্রদেশে মুসলমানদের প্রাধান্য হলো নিরঙ্কুশ, অপর কোনো রাজনীতিক শক্তির সঙ্গে সমঝোতার অবকাশ থাকলো না। চল্লিশের দশকে বাংলা তথা ভারতীয় রাজনীতির টালমাটাল পথপরিক্রমণ শেষ পর্যন্ত কোথায় এসে উপনীত হলো তা আমরা জানি। সেই জটিল রাজনীতির পটভূমিকায় কংগ্রেস নেতৃত্বের ব্যর্থতা, সাধারণভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বিত্তবান হিন্দু বাঙালি বাবু রাজনীতিবিদদের বিদ্বিষ্ট মনোভাব, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানে অগ্রসর সমাজের অনীহা ইত্যাদি পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের অমোচনীয় রায় হিসেবে ঘটলো দেশভাগ।

অথচ হিন্দু-মুসলিম বিরোধের পাশাপাশি মিলনক্ষেত্র জোরদার করবার সৃষ্টিশীল প্রয়াসও তো রাজনীতিতে কম ছিল না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বহু দিক দিয়েই ছিল যুগান্তকারী। পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করবার লক্ষ্যে 'অ্যাফার্মেটিভ অ্যাকশন' গ্রহণের নীতি এখন বিশ্বজনীন স্বীকৃতি অর্জন করেছে। নেলসন মাণ্ডেলার দক্ষিণ আফ্রিকা এর এক অনুপম প্রয়োগ দেখাচ্ছে, যেখানে অর্থনীতিতে শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্য সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গরা ক্ষমতার জোরে সমাধান না করে অ্যাফার্মেটিভ অ্যাকশনের দীর্ঘ ও বেদনাময় পথ বেছে নিয়েছেন। সাম্প্রতিক ভারতে উচ্চশিক্ষায় ওবিসি বা নিম্নবর্গের প্রতিনিধিদের কোটা সংরক্ষণের যে নীতি ঘোষিত হয়েছে তা এই ইতিবাচক পদক্ষেপেরই আরেক দৃষ্টান্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, হিন্দু-মুসলিম ফারাক মোচনের জন্য ইতিবাচক পথে রাজনীতিবিদরা বিশেষ অগ্রসর হননি।

দাঙ্গার পটভূমিকায় দাঙ্গা-সমস্যা চিরতরে রোধের প্রত্যাশা নিয়ে ঘটেছিল দেশভাগ, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে দেশভাগের পর সহিংস দাঙ্গা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে ঘটনা সীমিত না থেকে তা ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে দুই রাষ্ট্রের সম্পর্কের বৈরিতা বাড়িয়ে পরিস্থিতি আরো জটিল করেছে। সবচেয়ে বড় যে সমস্যা দেশভাগের অব্যবহিত পরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, দেশবিভাজন নিয়ে মত্ত কোনো রাজনীতিবিদই যা আগে বুঝতে পারেননি, সেটা হলো উদ্বাস্তু সমস্যা। দেশভাগের ফলে পাঞ্জাব ও বাংলার বিপুল সংখ্যক মানুষকে রাতারাতি উদ্বাস্তু হয়ে ভিন্‌দেশে ভিন্‌ পরিবেশে আশ্রয় নিতে হয়। পাঞ্জাবে তো এটা সার্বিক জনবিনিময়ের রূপ নেয়, আর বাংলায় একমাত্র পঞ্চাশ সালের দাঙ্গার পরই প্রায় ৩৫ লক্ষ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে দেশত্যাগী হতে হয়। বিহার ও পশ্চিম বাংলা থেকেও বহু মুসলমান এসে আশ্রয় নেন পূর্ববঙ্গে। এমন ব্যাপক আকারের মানবিক ট্রাজেডি সমসাময়িক কালে আর ঘটেনি। এর প্রতিফলন শিল্পে-সাহিত্যে আমরা দেখি, তবে উর্দু ও পাঞ্জাবি সাহিত্যে বাংলার চেয়ে অনেক তীব্রভাবে ফুটে ওঠেছে দেশভাগের অভিঘাত। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয়, উদ্বাস্তু হয়ে যাঁরা পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল তাঁরা ফেলে আসা স্বদেশভূমির জন্য আকুতি বিশেষ প্রকাশ করেননি, কিংবা এমন আকুতি প্রকাশের সুযোগ হয়তো তাদের বিশেষ ছিল না। কেননা দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তানী রাষ্ট্রাদর্শের কাছে সমস্যাটি দেশভাগের ছিল না, বরং ১৯৪৭ ছিল পাকিস্তান নামক তথাকথিত 'ইসলামী' রাষ্ট্রের প্রসববেদনার কাল, নবজন্মের স্মারক। ফলে পাকিস্তানে দেশভাগ ছিল বিশেষ ইতিবাচক ঘটনা, তাই এর বেদনা কিংবা অভিঘাত নিয়ে গবেষণা, আলোচনা ও লেখালেখিতে এক ধরনের আড়ষ্টতা শুরু থেকে বিদ্যমান ছিল।

দেশভাগের ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী। পরবর্তী পঞ্চাশাধিক বছরে বিভক্ত উপমহাদেশে, বিশেষভাবে পাকিস্তান, পূর্ববঙ্গ ও পরবর্তী বাংলাদেশে অনেক বিকাশ নিশ্চিতভাবেই ঘটেছে কিন্তু সেই বিকাশ অতীতের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ঘটতে পারেনি। উপমহাদেশের শহরগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখি দেশভাগের ফলে অখণ্ড পাঞ্জাবের সংস্কৃতি কেন্দ্র লাহোর ধীরে ধীরে তার জৌলুস হারিয়ে নিষ্প্রাণ শহরে পরিণত হয়। লাহোরে প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল উপমহাদেশের প্রথম আর্ট স্কুল, লাহোর ছিল পশ্চিম ভারতে সঙ্গীত ও কাব্যচর্চার কেন্দ্র এবং লাহোর ছিল মুসলমান-হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের কলকাকলিতে সমভাবে মুখরিত। দেশভাগ কেড়ে নিয়েছিল লাহোরের সেই মিশ্র সংস্কৃতির গৌরব, এবং লাহোর এখন তার অতীতের প্রেতাত্মা মাত্র।

একই কথা বলা যায় পূর্ববঙ্গের জেলা শহরগুলো প্রসঙ্গে। মাপকাঠি হিসেবে আমরা যদি গণগ্রন্থাগারসমূহকে নির্বাচন করি তবে দেখা যাবে শতাধিক বছরের পুরনো পাঠাগারের গর্ব প্রকাশ করতে পারে বরিশাল, বগুড়া, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, পাবনা, রংপুরসহ আরো অনেক শহর। এমনকি বহু মহকুমা শহরেও ছিল সমৃদ্ধ পাঠাগার, যা সেই শহরের সংস্কৃতি-চর্চার উচ্চমানের প্রকাশক। দেশভাগের পর এই পাঠাগারগুলোর অধিকাংশের করুণ পরিণতির কথা আমরা জানি। এরই অনুষঙ্গ হিসেবে আমরা দেখতে পাই পূর্ববঙ্গ জুড়ে বিস্তৃত শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চমানের শিক্ষকদের উপস্থিতি। এইসব শিক্ষকদের বেশির ভাগ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য, অনেকে ছিলেন স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং প্রায় সর্বাংশে ছিলেন শিক্ষা কার্যক্রমে নিবেদিত। কোনো জাতির পক্ষে এমন এক বিশাল ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক গোষ্ঠী পাওয়া পরম ভাগ্যের ব্যাপার। সেই সৌভাগ্য আমরা দু-পায়ে ঠেলেছি এবং এই শিক্ষককুলের অধিকাংশকে তাঁদের প্রিয় স্বদেশভূমি ছেড়ে অনিশ্চিত উদ্বাস্তু জীবন বরণ করতে হয়েছিল, যা বিশাল মানবিক ট্র্যাজেডির পাশাপাশি ডেকে এনেছিল চরম সামাজিক বিপর্যয়।

দেশভাগ পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জন্য আদর্শগতভাবে আরেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। যে-দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রতিফলন হিসেবে দেশভাগ এবং 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি তার যৌক্তিকতা কিংবা অযৌক্তিকতা আরো সম্প্রসারিত করে পাকিস্তানী শাসকেরা দাবি করেছিল, যেহেতু মুসলমানরা এক 'জাতি', তাই তাদের হবে এক সংস্কৃতি, এক ভাষা। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাই সংখ্যালঘুজনের মাতৃভাষা উর্দুর প্রাধান্য তাদের কাছে মনে হয়েছিল স্বতঃসিদ্ধ। সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও তাই দাবি ওঠে নয়া তমুদ্দন গড়ে তোলার। এর জন্য কতো যে হাস্যকর প্রচেষ্টা চলে তার ইয়ত্তা নেই। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পালন, বৈশাখে নববর্ষ বরণ ইত্যাদি স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক প্রকাশকে দ্বিজাতিভিত্তিক বিকৃত চিন্তা দ্বারা গর্হিত কাজ হিসেবে গণ্য করা হতো। পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতির অবিভাজ্যতা প্রতিহত করতে রাষ্ট্রের শক্তির আশ্রয় নেয়া হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলা বই ও পত্রপত্রিকা আমদানি বন্ধ করে দেয়া হলো ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের পর। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও একই নীতির প্রয়োগ ঘটলো। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার সার্বিকভাবে চলছিল কূপমণ্ডূক ও বিকৃত এক সংস্কৃতিধারা গড়ে তুলবার আয়োজন।

এসবের বিপরীতে বাঙালি জাতির যে বিপুল জাগরণ সেটা তাই ধারণ করেছিল সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপ এবং সকল বাধা-বিপত্তি ঠেলে বিপুল আত্মদানের বিনিময়ে এদেশের মানুষ প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, উদার অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে শুরু হয় এর অভিযাত্রা। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা দ্বিজাতিতত্ত্বের

অস্বীকৃতি, বিভাজন ও বৈরিতার বিরুদ্ধে সম্প্রীতি ও মিলনের আদর্শ তা তুলে ধরে। তবে তার অর্থ এই নয় বাংলাদেশ আন্দোলন রাষ্ট্রের অখণ্ডতা কিংবা সীমানা নিয়ে কোনো নতুন চিন্তার জন্ম দেবে। রাষ্ট্র গড়ে ওঠে ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক ঘটনা পরম্পরায়। অপরদিকে সংস্কৃতি বিকশিত হয় আপন ঐতিহ্য ও বিশিষ্টতার ভিত্তিতে। রাষ্ট্রে চলে সীমানা পোক্ত করবার সাধনা, আর সংস্কৃতিতে চলে মিলন-মিশ্রণ-বিনিময়-বিকাশের ধারাবাহিকতা। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সংস্কৃতির সীমারেখা মান্য করে ঘটে না, বরং বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রেই দেখা যাবে বিভিন্ন সংস্কৃতির সহাবস্থান। তাই বাংলাদেশ গর্বের সঙ্গে তার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে চলবে, পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বৃহত্তর বাঙালি সংস্কৃতি এবং উপমহাদেশের অভিন্ন ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার স্বাভাবিক যোগ নিবিড় করে তুলতে সচেষ্ট হবে, সেটাই তো এক আদর্শ পরিস্থিতি। সেই উদার অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনো নাগরিককে তাঁর ধর্মবিশ্বাস কিংবা মতবিশ্বাসের জন্য নিগৃহীত হতে হবে না, কাউকে আপন স্বদেশে ভিটেমাটিচ্যুত হতে হবে না, কিংবা দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু জীবন বরণ করতে হবে না। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে বর্তমান বাস্তবতার চাইতে ভিন্নতর এক রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি আমাদের নির্মাণ করতে হবে।

দেশভাগের বাস্তবতার পথ বেয়ে উপমহাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে গেছে। দেশভাগের উপজাত পাকিস্তান রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সাংস্কৃতিক মানচিত্র পালটে দেয়ার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছিল এবং ঘৃণা ও সহিংসতার বর্বর উদাহরণ সৃষ্টি করে একাত্তরে বাংলার মাটিতে বিশ্বের নিষ্ঠুরতম এক গণহত্যার অবতারণা ঘটিয়েছিল। মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির দাবি নিয়ে যে-পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা সেই পাকভূমিতেই বিশ শতকের ইতিহাসের নৃশংসতম মুসলিমনিধন পর্বের অবতারণা ঘটিয়েছিল পাকিস্তানী শাসককুল সাল উনিশ শ' একাত্তরে। দেশভাগের যা কিছু নেতির দিক তা মোচন করবার লক্ষ্যেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব। সেই পথ অনুসরণ না করলে আমরা আবারও মৌলবাদী অন্ধত্ব দ্বারা আক্রান্ত হবো, যে-লক্ষণগুলো ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। ফলে দেশভাগ-জনিত ঐতিহাসিক বাস্তবতা যেন জাতি, মহাজাতি ও বিশ্বমানবের মধ্যে মিলনের পথে বাধা হয়ে না থাকে সেটাই আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। তবেই আমরা সাতচল্লিশের দাঙ্গা, হানাহানি, বিভাজন পেরিয়ে সত্যিকারভাবে একাত্তরের মুক্ত আকাশের নিচে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে পারবো।

দেশভাগ যে কতভাবে সমাজে প্রভাব সৃষ্টি করেছে তার হদিশ করা মুশকিল। একই জাতিসত্তার দুই ধর্মগোষ্ঠীর মিলিত অবস্থান ও অভিযাত্রা সম্ভব নয়, এমন এক প্রতিপাদ্যের ভিত্তিতে ঘটলো দেশভাগ। অথচ দেশভাগ কথাটা সহজে উচ্চারণ করা গেলেও, পেন্সিল দিয়ে ম্যাপের ওপর দাগা বুলিয়ে ভাগ চিহ্নিত করতে পারলেও, বাস্তবে জনগোষ্ঠীর জীবনে তো এমনি বিভাজন তৈরি করা সম্ভব নয়। ফলে প্রয়োজন হয়েছে জবরদস্তিতার এবং দেশভাগের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য দরকার পড়েছে দাঙ্গার, অনেক অনেক দাঙ্গার। দাঙ্গার ফলশ্রুতিতে ঘটেছে দেশান্তর, দেশান্তরী মানুষের সয়-সম্পত্তির ওপর লোভাতুর

দৃষ্টিদানের লোকেরও তো অভাব ঘটেনি, কোনো সমাজেই ঘটে না, দেশেরই একাংশ মানুষের সম্পত্তি হয়ে উঠেছে শত্রু সম্পত্তি। জাতি হিসেবে আমাদের এই লজ্জা আমরা মোচন করিনি, কেবল 'শত্রু' কথাটা উচ্চারণ করা থেকে রেহাই নিয়েছি, নাম দিয়েছি 'অর্পিত সম্পত্তি'।

দেশভাগ এমন অনেক পরিবর্তনের জন্ম দিয়েছে যা আমরা সাদা চোখে অনেক সময় লক্ষ্য করি না। যেমন আমাদের সংবাদপত্রে ও সাধারণ আলোচনায় 'অবহেলিত উত্তরবঙ্গ' বলে একটি কথা খুব চালু রয়েছে। এই ধারণাটিও এসেছে দেশবিভাগের পথ বেয়ে। দেশবিভাগ পূর্ববর্তী সময়ে বাংলার রাজধানী হিসেবে কলকাতার ছিল কেন্দ্রীয় অবস্থান। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে, বিশেষভাবে রেলযোগাযোগের স্টেশন বা জংশন রয়েছে যেসব শহরে, তাদের সাথে কলকাতার ছিল খুব স্বাভাবিক সংযোগ। সকালে তৈরি ফিরপোর পাউরুটি বিকেলে মিলতো যশোরে, এ-কথা জানতে পারি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর স্মৃতিকথায়। আবার দার্জিলিং মেল পাড়ি দিত কুষ্টিয়া শহর হয়ে, কিংবা রংপুর হয়ে রেল চলে যেত আসাম। তখন অবহেলিত এলাকা হিসেবে যদি কোনো অঞ্চল চিহ্নিত করা হয় তবে তা' ছিল পদ্মার অপর পারের পূর্ববঙ্গ। ঢাকার সঙ্গে অন্য জেলা শহর, বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গের জেলা শহরগুলোর যোগাযোগের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, উপায়ও ছিল দুর্বল। দেশভাগের ফলে রাতারাতি উত্তরবঙ্গ হারিয়ে ফেললো তার স্বাভাবিক যোগসূত্র, হয়ে পড়লো বিচ্ছিন্ন ও অবহেলিত।

পাবনার মেয়ে হামিদা খানম, খ্যাতনামা অধ্যাপিকা, বিলেত থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছেন দেশে-নবগঠিত পাকিস্তানে, ঢাকা যাওয়ার পথে ঈশ্বরদি স্টেশনে তাঁর অপেক্ষার এক অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেনঃ 'স্টেশন একেবারে ফাঁকা। দু'চারজন যাত্রী এদিক-ওদিক অপেক্ষা করছে। আসাম মেইল, দার্জিলিং মেইল এ-লাইন দিয়ে এখন আর যায় না। যাত্রীদের ছোটাছুটি, মিষ্টিওয়ালার মাথায় কাচের বাক্সভরা মিষ্টি, সোরাবজির তকমাপরা চায়ের ট্রে হাতে বেয়ারাদের দ্রুত চলাফেরা, লাল কোর্তা কুলিদের দৌড়াদৌড়ি—এসব দৃশ্য আর দেখা যায় না। আমার আশৈবব পরিচিত নানা মানুষের ভিড়ে-ভরা ঈশ্বরদি যেন নিরাভরণ বিষণ্ন। আমি কুলিকে মালপত্রগুলো প্লাটফর্মে রাখতে বলে আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমের দরজা একটু ঠেললাম। নির্জন ঘরে বড় বড় ভারী চেয়ার-টেবিলগুলো আলো-আঁধারে কেমন ভূতুড়ে দেখাচ্ছিল। ফিরে এসে আমার মালের ওপর একটু ঠেস দিয়ে বসলাম। যতোদূর চোখ যায় ফাঁকা রেললাইন দিগন্তে মিশে গেছে। এ-দিগন্ত আর আমাদের জন্য খোলা নেই। পথ কেটে ছোট করে দেয়া হয়েছে এ-ধারের মানুষের সীমানা।'

দেশভাগের কৃত্রিমতা ও বেদনার প্রকাশ হিসেবে লালগোলার পরিত্যক্ত রেললাইন আমরা দেখি ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা' চলচ্চিত্রে। ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে নানাভাবে প্রতিফলন ঘটেছে দেশভাগের, পরিত্যক্ত রেললাইনের প্রতীকী ব্যঞ্জনা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সেই অর্থে বাংলাদেশের অভ্যুদয় অনেক কৃত্রিম বিভাজন দূর করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত

করছে। রেল যোগাযোগের পুনরায় সচল হয়ে ওঠা তার মধ্যে একটি। আমরা বিভাজনের কৃত্রিমতা দিয়ে সংযোগ সূত্র কতটা বিনষ্ট করেছি তার পরিচয় মিলবে বাংলার রেলপথের ইতিহাসে, আবার কৃত্রিমতা মোচন করে স্বাভাবিক সংযোগ কতোটা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি সেই পরিচয়ও পাবো রেল যোগাযোগের বিকাশের ঘটনাধারায়।

দেশভাগের পরোক্ষ প্রভাবের আরেক চিত্র পাওয়া যায় যশোধারা বাগচি সম্পাদিত 'দি ট্রমা অ্যান্ড দি ট্রায়াম্প' জেন্ডার অ্যান্ড পারটিশন ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া গ্রন্থে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু নারীরা কীভাবে কলকাতার চেনা চেহারা পাল্টে দিয়েছিল তার কিছু বিবরণ তিনি দিয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে উদ্বাস্তু মেয়েদের বিপুল সংখ্যায় যোগদান মধ্যবিত্ত সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ পাল্টে দিয়েছিল, ট্রামে বাসে মেয়েদের চলাচলের জড়তাও তারা দূর করেছিলেন।

দেশভাগ যে সাম্প্রদায়িক ও কূপমণ্ডূক চিন্তার প্রাধান্য রচনা করতে চেয়েছিল তা' থেকে আমরা মুক্তি অর্জন করতে পারিনি। সেই পথে এগুতে হলে দেশভাগজনিত সকল নেতিবাচকতা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি দরকার। পূর্ববাংলার দূরবর্তী গ্রামের এক সাধারণ ছাপোষা মানুষের জীবনচিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে উপমহাদেশের ইতিহাসের বড় বাস্তবতা। দেশভাগের সাংস্কৃতিক অভিঘাত বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে তাই বড় বিষণ্ন মনে স্মরণ করতে হয় সম্প্রতি পঠিত এক ক্ষুদ্র জীবনভাষ্য। সিঙ্গাপুর থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাংলাদেশীদের এক স্মরণিকায় নিবন্ধটি লিখেছিলেন প্রবীণ পেশাজীবী ড. মোহাম্মদ আবদুল জব্বার। দীর্ঘ-উদ্ধৃতি হয়ে গেলেও তাঁর বক্তব্য প্রায় পুরোটাই এখানে পেশ করা গেল দেশভাগের সাংস্কৃতিক অভিঘাতের বাস্তব দলিল হিসেবে।

তিনি লিখেছেন:

> আমাদের মাস্টারবাবু ছিলেন বেশ বয়স্ক। তাঁর আসল বয়স যে কত ছিল তা আমরা কেউই জানতাম না। শৈশব থেকে তাঁকে 'মাস্টারবাবু' বলেই ডাকতে শুনেছি সবাইকে। আমরাও তাই বলেই ডাকতাম। ওঁর কিন্তু একটা নাম, সত্যিকারের নামও ছিল। কিন্তু সেই রাজেন্দ্রকুমার দাস নামটির কোনো ব্যবহার ছিল না—কেউ কোনোদিন তাঁকে রাজেন্দ্রকুমার বলে ডাকত না, রাজেন্দ্রবাবু বলেও না। তাঁর নাম একেবারেই ব্যবহৃত না হবার একটা যুক্তিযুক্ত কারণও ছিল। সবাই তাঁকে খুবই সম্মান করত; তিনি ছিলেন আমাদের পাঠশালার শিক্ষক ও আমাদের সকলের মাস্টারবাবু। তিনি শুধু আমাদেরই পড়াননি, শুনেছি আমার বাবা, চাচা, মামাদেরও পড়িয়েছেন। তিনি ছিলেন সবার শিক্ষক, তাই সবাই তাঁকে মাস্টারবাবু বলেই ডাকত। এই নামেই তিনি সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। এটা ছিল আমাদের সকলের দেয়া আদরের নাম।
>
> মাস্টারবাবু কি পাশ ছিলেন তা আমরা জানতাম না। শুনেছি এন্ট্রান্স পরীক্ষার ধারেকাছেও যেতে পারেননি, মাত্র প্রথম বৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। কিন্তু তা নিয়ে আমাদের কারো কোন মাথাব্যথা ছিল না। মাস্টারবাবু সবই জানতেন—স্কুলে পড়ানো, দলিল দস্তাবেজ লেখা, সমাজে বিচার-আদালত করা, সবই ছিল ওঁর কাজ। মাস্টারবাবু যে মতামত দিতেন তা সবাই মেনে নিত, আমাদের গ্রামে মাস্টারবাবুর রায়ই ছিল সর্বোচ্চ রায়।

আমাদের গ্রামের স্কুলঘরটি ছিল নদীর পাড়ে। একটাই মাত্র ঘর, আর একজনই মাত্র শিক্ষক। আমরা স্কুলে যেতাম খুব সকালে। হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা এবং আরো নানান ধরনের খেলাধুলো করাই ছিল স্কুলে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য। তারপর ঝাঁপ দিয়ে পড়তাম নদীতে; লাফালাফি, সাঁতার এসব করতেই সকাল পেরিয়ে দুপুর। মাস্টারবাবুর স্কুলে আসার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। কোনো কোনো দিন এমনও হতো যে খেলাধুলো করে, নদীতে ঝাঁপাঝাপি সেরে আমরা ক্লান্ত হয়ে যখন বাড়ি ফিরতে যাব তখন হয়ত মাস্টারবাবু এসে হাজির হলেন—এগারোটা, বারোটা, কিংবা একটাই হয়তো বাজে। আবার এক একটা দিন হয়তো এলেনই না। সকলের জন্য একজনই তো শিক্ষক, তিনিই পড়ান, তিনিই পরীক্ষা নেন। পরীক্ষাতে আমরা সবাই পাশ করতাম। আমাদের পরীক্ষা হতো শীতকালে; বছরে একটাই পরীক্ষা। সেই পরীক্ষাও ছিল দারুণ মজার। সবাইকে একটা করে গল্প বলতে হতো, নয়তো একটা কবিতা আবৃত্তি। কয়েকটা শব্দের বানান বলতে হতো, এবং শব্দগুলো লিখতে হতো। ব্যস্! আর ছিল হাতের কাজ, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের কখনই কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। তার কারণ ছিলেন আমাদের মাসীমা। পরীক্ষার মৌসুমে তাঁকে আসতেই হবে। বেলেমাটি দিয়ে সারি সারি আম, কাঁঠাল, জামরুল ইত্যাদি বানিয়ে আঙিনা ভরিয়ে ফেলতেন। কী সুন্দর যে সেগুলো হতো! এই কাজে মাসীমার কোনো জুড়ি ছিল না। পশু-পাখিও বানাতেন। হাতের কাজে আমরা সবসময়ই পুরো নম্বর পেয়ে যেতাম। মাস্টারবাবু কোনোদিনই সে নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। আমাদের সব কাজের প্রশংসা করতেন মাস্টারবাবু। ছেলেমেয়েদের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল ষোল আনা। তাঁর ছাত্রছাত্রীরা সবাই যে একদিন একটা কিছু হয়ে যাবে, দেশ ও দশের জন্য তারা যে অনেক কিছু করতে পারে ও করবে সে ব্যাপারে মাস্টারবাবুর মনে কোনো সংশয় ছিল না। দেশের ভবিষ্যৎ কারিগর তৈরি করছেন ভেবেই হয়তো তিনি সবসময় হাসিখুশি থাকতেন।

আমাদের মাস্টারবাবুর গল্প পঞ্চাশ বছরের পুরনো। কিন্তু তার থেকেও পুরনো আর একটা ঘটনা মাস্টারবাবুর জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। সেই ঘটনাটি ঘটে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে। ব্রিটিশ শাসকদের প্ররোচনায় এবং এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ীর ইন্ধনে আমাদের সোনার বাংলাকে ভাগ করে সৃষ্টি করা হলো দুটো ভিন্ন দেশ। বাঙালিরা নিজের দেশেই দেশান্তরিত হলো যেন। যে ভূখণ্ড কয়েক দিন আগেও ছিল আমাদের জন্মভূমি, সেটা হয়ে গেল কেবলমাত্র আমাদের দেশ। দেশভাগ তো নয়, যেন আমাদের হৃদয়টাকে কেটে দু'ভাগ করা হলো। এতদিন ছিল আমাদের দেশ, হয়ে গেল আমার দেশ নয়তো তোমার দেশ। দেশমাতার বুকের উপর দাগ টেনে চিহ্নিত করা হলো দেশ এবং দেশান্তর। ঈদ, পুজো দুটোই ছিল আমাদের উৎসব; সেখানে দাগ কেটে ভাগ করা হলো মসজিদ, মন্দির। ভাগ হলো জল-পানি, ভাগ হলো মাসী-খালা, পিসী-ফুপু, রবীন্দ্র-নজরুল। দুষ্ট লোকে হাসলো; কাঁদলো আমাদের পরেশ, গণেশ, আমাদের পিসীমা, ও আমাদের সদাহাস্য মাস্টারবাবু।

তারপর অনেকদিন পার হয়ে গেছে। অনেক জল গড়িয়েছে পদ্মা-মেঘনায়, সুরমা-কুশিয়ারায়। পরেশরা চলে গেছে আসামে। শুনেছি অরবিন্দ গিয়েছিল কোলকাতায়। তরণী কাকাও গিয়েছিলেন; জন্মভূমিতে শেষ নিশ্বাস ছাড়বেন বলে আবার ফিরে

এসেছিলেন শেষ বয়সে। মাস্টারবাবু ত্রিপুরা থেকে কোনাদিন ফিরে আসেননি। সাজ্জাদ চাচাকে চিঠি লিখেছিলেন একবার। চাচা সেই চিঠি পকেটে নিয়ে ঘুরতেন, পড়ে শোনাতেন সবাইকে। মাস্টারবাবু লিখেছিলেন, 'তোমাদের সকলের বাবু, মাস্টারবাবু, এখানে জনসমুদ্রে হারিয়ে গেছে।'

দেশভাগ হচ্ছে আমাদের জন্য লস অব আইডেনটিটি, সত্তা হারিয়ে ফেলা। জীবনানন্দ দাশের পঙ্‌ক্তি অনুসরণ করে বলা যায়, সত্তা হারানোর পর, "তবুও তো মানব থেকে যায়।" সেই মানবতার শক্তিতে সত্তার পুনর্নির্মাণে মেলে আমাদের জীবনসাধনার পরিচয়। সত্তানুসন্ধানের কঠোর ব্রতপালনে 'দেশভাগ' অধ্যায়টি তাই দাবি করে আরো নিবিড় ও ব্যাপক পর্যালোচনা।

বেঙ্গল পার্টিশন: সাহিত্য ও চলচ্চিত্রালেখ্য

মিসটেক

ছুরির টানে চিরে গেল তাঁর তলপেট। ফিতে টুকরো হয়ে খসে পড়ল পরনের পাজামা। আর সেদিকে চোখ যেতেই হত্যাকারী আফসোসের স্বরে বলে উঠল, 'ছি, ছি, ছি, মিসটেক হয়ে গেছে।'

—*সাদাত হাসান মান্টো*

ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভের পঞ্চাশৎ বার্ষিকীতে মার্কিন সাময়িকী *টাইম* লিখেছিল যে, স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের ওপর যে বাংলা বণ্টন করে দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তার কারণ হতে পারে এই ভদ্রলোক এর আগে কখনো ভারতে আসেননি। অর্থাৎ ভারত তথা বাংলার জটিল ইতিহাস ও সমাজবিন্যাস সম্পর্কে যিনি বিশেষ অবহিত নন তিনিই এই ভাগাভাগির কাজটি করে দেয়ার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি হতে পারেন। হালকা চালেই পত্রিকা লিখেছিল এই কথা, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত বক্তব্য মোটেই হালকা ছিল না। এক্ষেত্রে আমরা স্মরণ করতে পারি অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেই অবিস্মরণীয় ছড়া, বুড়ো খোকাদের ধিক্কার জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'তেলের শিশি ভাঙলে পরে খুকুর 'পরে রাগ করো,' কিন্তু ভারত ভেঙে ফেলার ক্ষেত্রে কী হবে! বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাজনের অনেক দিকই যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, অন্তত রাজনীতিবিদরা, তা সে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী, ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কিংবা মুসলিম লীগ নেতৃত্ব যেই হোন-না কেন, যেসব যুক্তি হাজির করেছিলেন তা তৎকালীন উত্তপ্ত রাজনীতির উন্মাদনায় হয়তো অনেকের কাছে তেমন অবাস্তব ঠেকেনি, কিন্তু ইতিহাসের দূরত্বে দাঁড়িয়ে কিংবা মানবভাগ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে দেখলে সেসবের অর্থহীনতা স্পষ্টতর হয়ে ধরা দেয়াটা স্বাভাবিক। রাজনীতিকরা যেমনই ভাবুন, শিল্পী-সাহিত্যিকরা বিষয়টিকে আশু সুবিধা কিংবা ফায়দা-লাভের গণ্ডিতে রেখে বিচার করেননি। আর তাই সাতচল্লিশের স্বাধীনতার প্রভাতকে কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের মনে হয়েছিল, এই ভোর সেই ভোর নয় যার প্রতীক্ষায় আমরা সবাই ছিলাম, এ-যে অন্ধকারের দাগ-কাটা ভোর—ইয়ে

দাগ দাগ উজালা। দেশভাগের বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়ে অসাধারণ কিছু গল্প লিখেছিলেন সাদাত হাসান মান্টো, তাঁর বিখ্যাত 'টোবাটেক সিং' গল্পে ভাগকারীরা হঠাৎ আবিষ্কার করে সহায়-সম্পদ সবই বণ্টন হলো কিন্তু উন্মাদ আশ্রমের পাগলদের মধ্যে কারা পাকিস্তানের আর কারা হিন্দুস্তানের সেটা তো ভাগ হয়নি। এমন এক পাগল টোবাটেক সিং, অসংলগ্ন কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় না তাঁর প্রকৃত দেশ ভারতে না পাকিস্তানে, তাঁকে নিয়ে ঘটে সমূহ বিপদ এবং শেষ পর্যন্ত পাগলের অশ্রাব্য গালিগালাজই মনে হয় অর্থবহ, বণ্টনকারীদের শীতল যুক্তিবিচার ঠেকে চূড়ান্ত পাগলামি হিসেবে।

ব্রিটিশ বিদায়ের সঙ্গে ভাগ হয়েছিল পাঞ্জাব ও বাংলা। পাঞ্জাবে সরকারিভাবে গৃহীত হয়েছিল জনবিনিময় নীতি, অর্থাৎ পাকিস্তানের ভাগের হিন্দুরা যাবে ভারতে এবং ভারতীয় পাঞ্জাবের হিন্দুরা পাকিস্তানে, ভয়ঙ্কর দাঙ্গার বিস্তার যে জনবিনিময়কে রক্তগঙ্গায় ভাসিয়ে ঘটনা আরো ত্বরান্বিত করলো। সম্প্রতি ইসলামাবাদ থেকে পাঞ্জাব বিভাজন নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি বই। এতে পাঞ্জাবের দুই অংশের লেখকদের রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেমন আছে চিত্রশিল্পী সতীশ গুজরালের অভিজ্ঞতার কথা, তেমনি সাহিত্যিক ইনতিজার হোসেনেরও। গ্রন্থের নাম দেয়া হয়েছে '*অপারেশন উইদাউট অ্যানাসথেসিয়া*' অর্থাৎ বিবশকরণ ছাড়াই ঘটেছে ব্যবচ্ছেদ এবং সেই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার পরিচয় ফুটে উঠেছে গ্রন্থভুক্ত বিভিন্ন রচনায়। তুলনায় বাংলা বিভাজনের যন্ত্রণা হয়তো কম রক্তাক্ত, যদিও দাঙ্গার বর্বরতার কম-বেশি বিচার করা খুব সঙ্গত নয়, কিন্তু বাংলা বিভাজনের ক্ষেত্রে ক্ষত এখনও দগদগে, রক্তক্ষরণ আজো বন্ধ হয়নি এবং এর বেদনা নানা সংঘাত ও হিংস্রতার মধ্য দিয়ে বারবার ফুটে উঠছে, বিশেষভাবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নে।

১৯৪৬ সালের মধ্য-আগস্টে কলকাতায় সংঘটিত দাঙ্গা এবং এর পরপর নোয়াখালী ও বিহারে যে রক্তক্ষয় শুরু হয় তা' দেশভাগকে ত্বরান্বিত করেছিল। রাজনীতিবিদরা ভেবেছিলেন দেশ বিভাজন দ্বারা তারা সংঘাত এড়াতে পারবেন, যেটা কেবল ভুল প্রমাণিত হয়নি, দেশভাগ এমন এক নতুন সমস্যার জন্ম দিলো যে জটিলতার দিকটি কারো কল্পনাতেও ছিল না—দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো উদ্বাস্তু মানুষের ঢল নামা, রাতারাতি বাস্তুচ্যুত হয়ে হাজার হাজার মানুষ পাড়ি জমালো অজানার উদ্দেশে। বিশাল এক সমস্যা উভয় দেশকে জরাজীর্ণ করে ফেললো। কোনো রাজনীতিবিদের ভাবনা-চিন্তার পরিধিতে ছিল না যে-সমস্যা তা গ্রাস করলো ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে, জন্ম দিলো বিশ শতকের বৃহত্তম উদ্বাস্তু ঘটনার।

পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ সঞ্জাত রক্ত ও বেদনার পরিমাপ ও তুল্যবিচার নিশ্চয় সম্ভব নয় কিন্তু ভারতের দুই প্রান্তের একক সংস্কৃতিবান দুই প্রদেশের ধর্মভিত্তিক বিভাজন যেসব জটিলতার জন্ম দিয়েছিল তার তুলনামূলক বিচার বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক হতে পারে। পাঞ্জাব বিভাজন সাহিত্যিকদের আলোড়িত করেছিল প্রবলভাবে। সাদাত হাসান মান্টো, কৃষাণচন্দর, খুশবন্ত সিং, কমলেশ্বর, ইসমাত চুঘতাই, খাজা আহমেদ আব্বাস,

কুররাতুল আইন হায়দার, অজিত কৌর প্রমুখ তো অনেক বিখ্যাত গল্প-উপন্যাসের জন্ম দিয়েছেন দেশভাগকে কেন্দ্র করে। মমতাজ দৌলতানা '*দি ডিভাইডেড হার্ট*' নামে যে বিশাল উপন্যাস লিখেছিলেন পাকিস্তানে তা' লেখিকার মুসলিম লীগ পক্ষপাতিত্ব ছাপিয়ে আন্তধর্মীয় মিলন ও বিচ্ছেদের করুণ আখ্যান হয়ে ওঠে। ইতিহাসের প্রধান কুশীলবদের নিয়ে নয়, বরং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও পাঞ্জাব বিভাজনের মানবিক মাত্রার বহুকৌণিক বিশ্লেষণের দেখা আমরা পাই। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় জ্ঞানেন্দ্র পান্ডের '*রিমেমবারিং পার্টিশন,*' এস. সেত্তার ও ইন্দিরা বাতিস্তা গুপ্তের '*প্যাংস্ অব পার্টিশন*', রবিকান্ত ও তরুণ সেইন্টের '*ট্রানশ্লেটিং পার্টিশন*', মুশিরুল হাসানের '*ইনভেন্টিং বাউন্ডারিজ*', কমলা ভাসিন ও রিতু মেননের '*বর্ডার্স অ্যান্ড বাউন্ডারিজ*', সুবীর কউলের '*দি পার্টিশন্স্ অব মেমোরি*', উর্বশী বুটালিয়ার '*দি আদার সাইড অব সাইলেন্স*' ইত্যাদি। পাঞ্জাব বিভাজনের রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, মানবিক দিকগুলো বিবেচিত হয়েছে এইসব গ্রন্থে। যেমন উর্বশী বুটালিয়া উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরে প্রেরিত চিঠিপত্র ঘেঁটে বের করতে চেয়েছেন পরিবারের নারীদের দুর্গতির বিবরণ, যারা প্রচলিত ইতিহাসে নীরব থেকে গেছেন।

তুলনামূলকভাবে, খুব আশ্চর্য হয়ে আমরা লক্ষ্য করি, বাংলা ভাগ নিয়ে লেখালেখি হয়েছে বিশেষ কম। এই স্বল্পতা পূর্ববঙ্গে বা বর্তমান বাংলাদেশে যেমন লক্ষণীয়, তেমনি তা' পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও বাস্তব। অথচ পূর্ববঙ্গ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যাপক দেশত্যাগ তো কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের জীবন একেবারে তচনচ করে দিয়েছিল, দাঙ্গার পৌণঃপুনিকতা সীমান্তের উভয় দিকেই ছিল বাস্তব। পাঞ্জাব বিভাজন ও বাংলাভাগের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তু সমস্যার মাত্রা ছিল প্রায় সমতুল্য। পাঞ্জাবে উভয় দিক মিলিয়ে প্রায় ১ কোটির বেশি মানুষ দেশ ছেড়েছিল। পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল প্রায় ৬০ লক্ষ উদ্বাস্তু এবং ১৯৫১ সালের সেন্সাসে দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তানের এক-পঞ্চমাংশ মানুষ উদ্বাস্তু। আর পূর্ববঙ্গ থেকে কেবল ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত হিসেবে প্রায় ৩৪ লক্ষ মানুষ দেশান্তরী হয়েছিল। তুলনায় পূর্ববঙ্গে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা অবশ্য অনেক কম। ১৯৫০ সালে উদ্বাস্তু প্রবাহ বন্ধের জন্য স্বাক্ষরিত হয় লিয়াকৎ-নেহরু চুক্তি। এই সময়ে পূর্ববঙ্গে এসেছিল ২ লক্ষ মুসলমান উদ্বাস্তু, আর পশ্চিমবঙ্গে গিয়েছিল ১৬ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু। পরবর্তীকালে এই প্রবাহ বিশেষ বন্ধ হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ১৯৭০ সালে হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৬০ লক্ষ।

১৯৯৯ সালে সাহিত্য অকাদেমীর পক্ষে দেশভাগ বিষয়ক গল্প-সংকলন '*রক্তমণির হার*' সম্পাদনাকালে এ-বিষয়ে লেখালেখির স্বল্পতার দিকটি রূঢ়ভাবে ধরা পড়েছিল সম্পাদক কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়ের কাছে। বাংলা-সাহিত্যে শিল্পসচেতন ক্ষমতাবান লেখকের তো অভাব ছিল না, দেবেশ রায়ের বিবেচনায় বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সতীনাথ ভাদুড়ী প্রত্যেকেই তখন সৃষ্টিমান ও দুর্দমনীয়। এমন অবশ্য নয় যে দেশভাগ বিষয়ে তাঁরা কিছুই লেখেননি, তারাশঙ্করের 'শবরী', বিভূতিভূষণের

'কুশল পাহাড়ী', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আপদ' কিংবা সতীনাথের 'পরিচিতা' গল্প তো ঐ সংকলন গ্রন্থেই জায়গা পেয়েছে। তবু দেবেশ রায়ের মনে হয়েছে:

"এই চারজনের কেউই, বা প্রথম মহাযুদ্ধের কাছাকাছি সময় থেকে তিরিশ সাল নাগাদ যাঁদের জন্ম, যাঁরা এই ৪৭ সালেরই কিছু আগে গল্প-উপন্যাস লেখা নিজেদের মতো শুরু করেছিলেন সেই নবীনরাও কেউই, দেশভাগ-স্বাধীনতাকে একটা পরিণতিবিন্দু বা আরম্ভবিন্দু হিসেবে আবিষ্কার করেননি। করেননি যাঁরা বিশের দশকে আধুনিকতার একটা ধারণা থেকে গল্প-উপন্যাস লিখছিলেন। অথচ এই তিন-বয়সী লেখকরা প্রায় প্রত্যেকেই মাত্র এক বছর আগের (১৯৪৬) দাঙ্গা নিয়ে, মাত্র চার বছর আগের দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩) নিয়ে, এমনকি ৪৫ থেকে ৪৭ পর্যন্ত নানা রকমের তুঙ্গ রাজনৈতিক আন্দোলন (রশিদ আলি দিবস, নৌবিদ্রোহ, সরকারি কর্মী ধর্মঘট) নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখছিলেন। অথচ তাঁরা কেউই দেশভাগের মতো ঘটনার যে-অচিন্ত্যপূর্বতা, লক্ষ লক্ষ মানুষের যে উদ্বাসন, পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসে যে-অভাবিত আলোড়ন সেই আঁকাড়া বাস্তবকে গল্পকার-ঔপন্যাসিকের দাপটে আঁকড়ে ধরলেন না। বিবেচ্য এই অভিজ্ঞতাটুকু যে যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গায় বাংলা গল্প-উপন্যাস যে নৈতিক জিজ্ঞাসায় কাতর হয়ে আধেয়-কল্পনার মৌলিক বদল ঘটিয়েছিল, দেশভাগ-স্বাধীনতায় তা' ঘটলো না। এই নীরবতার কারণ নানাজন নানাভাবে খুঁজতে পারেন। সত্য হয়তো ছড়িয়ে আছে সেইসব সন্ধানের মধ্যে। আমাদের শুধু এই সত্যটুকু স্বীকার করে নেয়া—সেই মুহূর্তে বাংলা গল্প-উপন্যাস বস্তুত নীরবই ছিল।"

দেবেশ রায়ের এই বিবেচনার পাশাপাশি আমরা দাখিল করতে পারি নিয়াজ জামানের বক্তব্য, ২০০০ সালে ইউপিএল কর্তৃক প্রকাশিত '*দি এস্কেপ অ্যান্ড আদার স্টোরিজ অব নাইন্টিন ফরটি সেভেন*' গল্প-সংকলন সম্পাদনাকালে তাঁর উপলব্ধি ছিল:

"১৯৪৭ সালের দেশভাগ ভারত ও পাকিস্তানের লেখকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার হয়ে আছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঘটনা তা' নয়, যেখানে প্রথম ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং পরে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সেই মিথ ও সম্পদ গঠন করেছে যা একটি জনগোষ্ঠীকে সংহত করে কিংবা লেখক-শিল্পীরা যে ভাণ্ডার খুঁড়ে সম্পদ আহরণ করে চলেন। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বাঙালি/বাংলাদেশী সত্তা নিরূপণে এই দুই ঘটনা অবদান রেখেছে—কিংবা ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণত এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ প্রকাশিত তিন খণ্ডের '*বাংলাদেশের ইতিহাস*' গ্রন্থে ৪৭-এর পর্ব এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। গল্প-উপন্যাসেও এই এড়িয়ে যাওয়া লক্ষণীয়। যেমন রিজিয়া রহমানের '*বঙ থেকে বাংলা*' উপন্যাসে পূর্ববঙ্গ/বাংলাদেশের ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে এবং মোঘল, পর্তুগিজ ও ব্রিটিশদের আগমন বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তিনি বাদ দিয়েছেন দেশভাগের বিবরণী।... ভারত ও পাকিস্তান, যেখানে দেশভাগ হয়ে রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ মিথ, যা ফিরে দেখা হচ্ছে, যার পুনর্মূল্যায়ন ঘটছে—দেশভাগের পঞ্চাশতম বার্ষিকী যেখানে প্রচুর লেখালেখির প্রেরণা যোগাচ্ছে—সেরকমভাবে দেশভাগ আর বাংলাদেশীদের সজীব স্মৃতির অংশ হয়ে নেই।"

ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দুই সম্পাদকের একই ধরনের বাস্তবতার উদঘাটনের পেছনের কার্যকারণ অনুসন্ধান অনেক জটিল ব্যাপার। দেশভাগ বিবেচনায় নেয়ার ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার পটভূমিকায় মৌলিক কিছু ফারাকও ছিল। পশ্চিম বাংলার উদ্বাস্তু ঢল হয়ে উঠেছিল প্রধান এক সমস্যা। উদ্বাস্তু সমস্যা স্থানীয় সমাজে সাম্প্রদায়িক সমস্যা হিসেবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার আশঙ্কা সব সময়েই বিদ্যমান ছিল। দেশান্তরী হতে বাধ্য হওয়া মানুষের অন্তরে যে ক্ষোভ ও বেদনা পুঞ্জিভূত থাকে তা' সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে রূপান্তরিত করা বা হয়ে যাওয়া অধিকতর সহজ। পঞ্চাশ সালে যে দাঙ্গা বাধে তার পেছনে বাস্তব উস্কানির ছিল বড় ভূমিকা। ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা যেমন ছিল ব্যাপক আকারের তেমনি তার একটি বিপজ্জনক দিকও ছিল। এর সাহিত্যিক প্রতিফলন সমস্যার মাত্রা অনুধাবনে সহায়তার পাশাপাশি অপব্যবহারের সুযোগও সৃষ্টি করতে পারে। তাই শিল্পী-সাহিত্যিকদের পক্ষে কেবল শৈল্পিক বিবেচনা থেকে সমস্যা-চিত্রণে কতক জটিলতা ছিল যা হয়তো বাস্তবের রূপদানে জড়তা সঞ্চার করতে পারে। পক্ষান্তরে পূর্ববাংলায় শুরু থেকে যে অবাঙালি কর্তৃত্ব আরোপের চেষ্টা হয় সেক্ষেত্রে বিহারি শরণার্থীদের বরণে সরকারি প্রচেষ্টায় ঘাটতি না থাকলেও বাঙালি বিশেষভাবে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তুদের অনেকটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছিল। এই গোষ্ঠীর নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আগমন নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছিল, পঞ্চাশের দাঙ্গায় বর্ধমানের বাড়ি দগ্ধ হলে আবুল হাশিম চলে আসেন পূর্ববাংলায় এবং অচিরে তাঁর স্থান হয় কারাগারে। এমনকি ষাটের দশকে এসে দেখা যায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে মীরপুর মোহাম্মদপুরে জমি বরাদ্দ হলে তার সিংহভাগ জোটে অবাঙালি শরণার্থীদের এবং বাঙালি উদ্বাস্তু সেখানে একান্তই সংখ্যালঘিষ্ঠ। ফলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি মুসলিম উদ্বাস্তু তাদের মর্মবেদনা প্রকাশের কোনো সুযোগ পাননি। ষাটের দশকে দক্ষিণারঞ্জন বসুর সম্পাদনায় কলকাতার দৈনিক যুগান্তরে 'ছেড়ে আসা গ্রাম' পর্যায়ে মাতৃভূমির জন্য উদ্বাস্তুদের আকুতি প্রকাশ পেলেও পূর্ব পাকিস্তানে তেমন ঘটনা রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে গণ্য হওয়ার মতো ছিল। ফলে দেশভাগ প্রশ্নকে সামগ্রিক বিবেচনায় নেয়াটা শিল্পী-সাহিত্যিকদের জন্য ছিল বিপজ্জনক কাজ। তাই পূর্ব কি পশ্চিমবাংলায় দেশভাগ বিষয়ে শৈল্পিক মূল্যায়নে যে ঘাটতি তার পেছনে অনেকতর অশৈল্পিক বাস্তবতা কাজ করেছে।

দেশভাগ বাংলার সমাজমানসে যে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল এবং করে চলেছে তার কোনো সরল ভাষ্য দাঁড় করানো দুষ্কর। তবে এটুকু আমরা বুঝি এর বহুমাত্রিকতা ও গভীরতর প্রভাবকে নানাভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে এবং স্মৃতিতে এর সজীব উপস্থিতি ব্যতীত দেশ ও সমাজের বহু জটিল বিন্যাস আমরা অনুধাবন করতে সক্ষম হবো না। স্বাধীনতা-উত্তরকালে শিল্পী-সাহিত্যিকরা যে বারবার ফিরে আসছেন দেশভাগের এই পর্ববিচারে সেটা এই অসমাপ্ত বোঝাপড়া সম্পন্ন করার তাগিদ থেকেই সঞ্জাত হচ্ছে। এই পর্বে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য রচনার দেখা আমরা পাই, এর মধ্যে রয়েছে আবু জাফর শামসুদ্দীনের '*পদ্মা মেঘনা*

যমুনা, শামসুদ্দীন আবুল কালামের '*কাঞ্চনগ্রাম*', আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের '*খোয়াবনামা*', রশীদ করীমের '*মায়ের কাছে যাচ্ছি*', শওকত আলীর '*ওয়ারিশ*' ও '*দলিল*', সৈয়দ শামসুল হকের '*গল্প কোলকাতার*', মকবুলা মঞ্জুরের '*কালের মন্দিরা*', সেলিনা হোসেনের '*কাঁটাতারে প্রজাপতি*', মাহমুদুল হকের '*কালো বরফ*', তসলিমা নাসরিনের '*ফেরা*', রাহাত খানের '*ফিরে আসা*', এখ্‌লাসউদ্দীন আহমদের '*ফিরে দেখা*', কায়েস আহমদের '*নির্বাসিত একজন*', ইমদাদুল হক মিলনের '*দেশভাগের পর,*' আনিসুল হকের '*চিয়ারি বা বুদু ওঁরাও কেন দেশত্যাগ করেছিল*', সালাম আজাদের '*দেশভাগের গল্প*' ইত্যাদি। অমিতাভ ঘোষের সুপরিচিত ইংরেজি উপন্যাস '*সার্কেল অব রিজন*'-এ আমরা দেখি ঢাকায় সংঘটিত '৬৪ সালের দাঙ্গার প্রতিফলন। অতি সম্প্রতি কলকাতার 'স্ত্রী' সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে যশোধারা বাগচি ও শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদিত গ্রন্থ '*দি ট্রমা অ্যান্ড দি ট্রিউম্প-জেন্ডার অ্যান্ড পার্টিশন ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া*', দেশভাগে দুর্গত নারীদের সংগ্রামশীলতার অনবদ্য দলিল। ২০০২ সালে শ্রীলঙ্কা থেকে প্রকাশিত হয়েছে '*মেমোরিজ অব জেনোসাইডাল পার্টিশন*', যেখানে নোয়াখালীর গান্ধী আশ্রমের ঝর্ণাধারা চৌধুরীর মর্মস্পর্শী সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অধ্যাপিকা আমিনা মহসিন, যতোটুকু না শুনেছেন তার চেয়ে বেশি অনুভব করেছেন নীরবতা থেকে। আমরা সঙ্গতভাবেই ধারণা করতে পারি দেশভাগের বিষয়টি আগামী দিনে আরো নিবিড় ও নিবিষ্ট শৈল্পিক বিবেচনা লাভ করবে এবং বাঙালির জাতীয় ইতিহাসকে পূর্ণতা দিতে হলে এই ঐতিহাসিক জটিলতা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

উপরোক্ত পটভূমিকা স্মরণে রেখে আমরা দেশভাগ বিষয়ক চলচ্চিত্রের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি এবং এক্ষেত্রেও আমরা দেখবো একাত্তর-পরবর্তী সময়ে দেশভাগের পটভূমিকা বুঝে নেয়ার প্রয়াসে চলচ্চিত্র নির্মাণে ঘাটতির পরিবর্তে ক্রমপ্রসারমাণ আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

দেশভাগ নিয়ে নির্মিত প্রথম ছায়াছবি নিমাই ঘোষ পরিচালিত '*ছিন্নমূল*' (১৯৫০)। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কর্মী নিমাই ঘোষ উদ্বাস্তু স্রোতে ভাসমান মানুষজনের দুঃখবেদনা চিত্রিত করতে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের কাহিনী অবলম্বনে নির্মাণ করেন এই ছবি। চিত্রায়ন ও কাহিনী বিন্যাসে অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও উদ্বাস্তু-বহনকারী ট্রেন, রিফিউজি অধ্যুষিত শিয়ালদা রেলস্টেশনের জীবন ইত্যাদি বাস্তব দৃশ্য ছবিটিকে আলাদা মাত্রা যুগিয়েছে। সলিল সেনের '*নতুন ইহুদী*' ১৯৫১ সালে প্রথম মঞ্চস্থ হয় নাটক হিসেবে, পরে তিনি এর চলচ্চিত্ররূপ ধারণ করেন। তবে দেশভাগ বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন ঋত্বিক ঘটক যিনি নিজেই ছিলেন বেঙ্গল পার্টিশনে বিদীর্ণ সত্তা। ঋত্বিকের ছবিতে বারবার ফিরে এসেছে দেশভাগের অভিঘাত, ১৯৬১ সালে নির্মিত '*কোমল গান্ধার*' ছায়াছবিতে নাটকের দল যখন আসে পদ্মার তীরে মুর্শিদাবাদের লালগোলা শহরে তখন যতোটা সংলাপ ও গল্পের সংঘাত তার চেয়ে বেশি নদীর এপার-ওপার বিভাজিত বাংলার বাস্তব পটভূমি মুখর হয়ে ওঠে। নদীতীরে এসে পৌঁছেছে যে ধাতব রেললাইন তা এখন

পরিত্যক্ত, কোলাহলহীন স্টেশন, কেননা কোনো ট্রেনের আর নদীতীরে পৌঁছবার তাগিদ নেই, স্টিমার-ঘাট শূন্য, যাত্রীদের ওপারে যাওয়ার আর অবকাশ নেই, কাছের জায়গাগুলো হয়ে গেছে দূরের, ধরাছোঁয়ার বাইরের। নাটকের দলের মধ্যে দেখা দিয়েছে ভাঙন, অনুসূয়া ও ভৃগুর প্রেমের মধ্যে ফাটল এবং বিভাজিত হয়ে গেছে দেশ—এমনি সার্বিক ভাঙনের পটভূমিকায় নির্মিত ছায়াছবি '*কোমল গান্ধার*', পরে যে ছবি সম্পর্কে ঋত্বিক বলেছিলেন যে, *কোমল গান্ধারে* বিভিন্ন স্তরে কাজ করার সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে আমাকে, একই সঙ্গে আমি আঁকতে চেয়েছি অনুসুয়ার হৃদয়ের দোটানা, গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বের ভাঙন এবং বাংলার বিভাজন। ঋত্বিক ঘটকের পরবর্তী ছবি '*সুবর্ণরেখা*' আরো বড় ক্যানভাস মেলে ধরে, ক্রুদ্ধ পরিচালক এই ছবিতে যেন আধুনিক নগরসভ্যতার বিরুদ্ধে পরশুরামের কুঠার হাতে তুলে নেন। তবে এ-ছবিরও যাত্রাবিন্দু উদ্বাস্তু পরিবার এবং নতুন জীবনের সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রয়াস, যা কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে না, এমনকি আপাত স্থিতি অর্জিত হলেও নিয়তির অমোঘ টানে চোরাবালির পথে তা' আবার হারিয়ে যায়। এখানেও কাহিনী খেলা করে নানা স্তরে, তবে পরতে পরতে মিশে থাকে উদ্বাস্তু জীবনের বেদনা।

পরবর্তী ছবি '*মেঘে ঢাকা তারা*' উদ্বাস্তু পরিবারের অসহায়ত্ব ও পঙ্গুত্বকে আরো তীব্রভাবে মেলে ধরে। জীবনের সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করে চলা নীতা যখন যক্ষাক্রান্ত হয়ে বাঁচবার আকুতিতে প্রবল হয়ে ওঠে, তাঁর কঠিন পথচলার একমাত্র নির্ভর অগ্রজের হাত ধরে বলে, 'দাদা, আমি বাঁচতে চাই', তখন সেই আকুতি যেন লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষের প্রবল জীবনাকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠে। অসাধারণ অভিনয় ও তার চেয়েও অসাধারণ চিত্রায়নের গুণে এই দৃশ্য বাংলা চলচ্চিত্রের সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে আছে। পরবর্তী ছবি '*যুক্তি, তক্কো, গপ্পো*'-তেও দেখা যায় দেশভাগের ছায়াপাত।

১৯৫৯ সালে শান্তিপ্রিয় মুখার্জি নির্মাণ করেন ছায়াছবি '*রিফিউজি*'। ১৯৭০ সালে নির্মিত বিমল বসুর '*নবরাগ*' ছবিতেও দেশভাগের দিকটি উঠে এসেছে। পরবর্তীকালে দেশভাগ বিষয়ে যেসব ছায়াছবি আমরা পাই তার মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় প্রবীণ চিত্রপরিচালক রাজেন তরফদারের '*পালঙ্ক*' (১৯৭৫)। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে নির্মিত এই ছবির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বিভাজিত পরিবার, পরিবার-প্রধান থেকে গেছেন পূর্ববঙ্গে এবং সদস্যরা হয়েছেন দেশান্তরী। পটভূমিকায় আছে বিভাজিত সমাজ যেখানে ধর্মবিভাজন ও বিত্তবিভাজন মিলে পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে। আর সবকিছু ছাপিয়ে আছে বাংলাদেশের নিসর্গ, গাঢ় সবুজ ধানের ক্ষেত, নদী-খাল উপচানো জলের খেলা, নিঃসঙ্গ জমিদারের সাবেকী বাড়ি ইত্যাদি। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত এই ছবিতে রাজমোহন ও মকবুলের ভূমিকায় উৎপল দত্ত ও আনোয়ার হোসেনের অভিনয় স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বাংলার উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে আরেক ব্যতিক্রমী ছায়াছবি কেরালার অকালপ্রয়াত যশস্বী চিত্রপরিচালক জি. অরবিন্দন নির্মিত মালয়ালম ছবি '*বাস্তুহারা*'। দক্ষিণ ভারতীয় এই পরিচালকের পিতা পঞ্চাশের দশকে সীমান্ত এলাকায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত রিফিউজিদের

মধ্যে কাজ করেছেন। সেই বাল্যস্মৃতির দায় মেটাতে অরবিন্দনের চিত্রপ্রয়াস '*বাস্তুহারা*'। ১৯৯২ সালে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত নির্মাণ করেন '*তাহাদের কথা*', কমলকুমার মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে। দেশভাগ-উত্তর বাস্তবতার নিরিখে পূর্ববঙ্গের এক প্রাক্তন বিপ্লবী কেবল বাস্তুচ্যুত নন, অনৈতিকতা ও ক্ষুদ্রতার প্রতিষ্ঠায় জীবনপ্রবাহ থেকেও চ্যুত হয়ে পড়েন, হয়ে যান একান্ত আউটসাইডার। তাঁর ব্যক্তিজীবনের বৈকল্য আমাদের দেখিয়ে দেয় স্বাধীন দেশে নবপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক মূল্যবোধের বৈকল্য।

সংঘাত, হিংস্রতা ও রাজনৈতিক কুটিলতার আবর্তে অসহায় মানুষের যে দেশত্যাগ অব্যাহত রয়েছে তার প্রতিফলন বিভিন্ন ছবিতে নানাভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। মৌলবাদী হিন্দুদের দ্বারা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পটভূমিকায় মৌলবাদী মুসলিম গোষ্ঠী যে হানাহানির অবতারণা ঘটায় বাংলাদেশে তার ফলে দেশান্তরী পরিবার হাজির হয় গৌতম ঘোষের সাম্প্রতিক ছবি '*দেখা*'-য় (২০০১)। এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা দেশান্তরী গোষ্ঠীর তরুণ সদস্যের মনে যে অভিঘাত ঘটায় তার ফল হিসেবেই বুঝি দেখি এই যুবক মানবসমাজের চাইতে পক্ষীসমাজেই অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। সাম্প্রতিক আরো কতক ছবিতে উদ্বাস্তু চরিত্রের এমনি উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

দেশভাগ নিয়ে অতি সম্প্রতি নির্মিত আরেক ছায়াছবি '*ফেরা*' (২০০৩), তরুণ চিত্রপরিচালক সুপ্রিয় সেন বরিশালের গ্রাম থেকে দেশান্তরী হয়েছিলেন পিতার হাত ধরে এবং দন্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু শিবিরে বড় হয়েছেন। এতোকাল পর তাঁর আবার গ্রামে ফিরে আসার ঘটনা অবলম্বন করে নির্মিত হয়েছে এই ডকু-ফিকশন। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদ আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সুপ্রিয় সেন নির্মিত ছৌ-নাচের তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল।

সীমান্তের আরেক দিক অর্থাৎ বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বেঙ্গল পার্টিশন বিবেচনা করার মতো কোনো ছায়াছবি আমাদের ছিল না। ইতিহাসের এই বড় ঘটনা প্রথমবারের মতো সার্থকতার সঙ্গে চিত্রায়িত করলেন তানভীর মোকাম্মেল, তাঁর নিজেরই কাহিনী নিয়ে নির্মিত হলো ছায়াছবি '*চিত্রা নদীর পারে*' (১৯৯৯)। ষাটের দশকের গোড়ায় হিন্দু-মুসলমান মিলিত আবহে পূর্ববঙ্গের দূর মফস্বলের জীবনপ্রবাহকে পরিচালক দেখেছেন এক নস্টালজিয়া-আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে। ছোট্ট শহরের কোল ঘেঁষে বয়ে যাওয়া নদী, নদীতীরবর্তী একদা-সমৃদ্ধ বর্তমানে-বিবর্ণ দালানকোঠা, পড়ে আছে শূন্য খাঁচার মতো, মানুষজন অনেকেই নেই, থেকে গেছেন কেবল পরিবারের অসহায় সদস্যদের কেউ কেউ। দেশভাগের অভিঘাত সামলে আবারও আশা বুকে নিয়ে চলতে চায় এই শহর, শহরের নবীন-নবীনারা, মিনতি, সালমা, বাদল, নাজমা, বাসন্তী, কিন্তু '৬৪ সালের দাঙ্গা ছত্রখান করে দেয় সব স্বপ্ন, ঠাকুরমাকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় মিনতি, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর ভিড়ে যোগ হয় আরো দুটি নাম।

পাকিস্তান আমলে দেশভাগ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা ভাববার কোনো সুযোগ ছিল না, তবে বিষয় দেশভাগ না হলেও দেশভাগ-জনিত উদ্বাস্তু সমস্যার মানবিক মাত্রার

প্রতিফলন আমরা দেখি জহির রায়হানের অসমাপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী চলচ্চিত্র '*লেট দেয়ার বি লাইট*'-এ। এই বিক্ষুব্ধ শিল্পীই উনিশ শ' একাত্তর সালে নির্মাণ করেন অসাধারণ দরদি তথ্যচিত্র '*স্টপ জেনোসাইড*' যেখানে মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানী বর্বরতা ও তজ্জনিত উদ্বাস্তু হওয়া জীবনের তীব্র প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায়।

দেশভাগ ঘটেছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে, দুই সাংস্কৃতিক জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার ধর্মফারাককে মুখ্য করে। পূর্বপ্রান্তে এর অন্তর্নিহিত অসঙ্গতির মোচন ঘটেছে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের উদ্ভবে। কিন্তু দেশভাগ সমাজের মধ্যে যে বিভাজন, দূরত্ব, সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং এইসব নেতিসঞ্জাত সহিংসতার জন্ম দিয়েছিল তার মূলোৎপাটন ঘটেনি, কি ভারতে, কি বাংলাদেশে। শিল্পী-সাহিত্যিকরা যখন বিবেচনায় নেন দেশভাগ তখন মমত্ব, সংবেদনশীলতা, প্রেম ও মানবতাই সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে। বিভাজিত সমাজকে ঐক্যের সমাজ, দ্বন্দ্বপীড়িত সমাজকে সংহত সমাজ করে তুলবার যে অব্যাহত প্রক্রিয়া সেখানে অবদান রচনা করে এইসব প্রয়াস। বাংলা বিভাজন ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু বাংলার সমাজে এক সম্প্রদায় কর্তৃক অপর সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বিষ্ট হওয়া কোনো ঐতিহাসিক নিয়তি নয়। বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতির পারস্পরিক সহাবস্থান ও মিলন-মিশ্রণেই জোর পায় রাষ্ট্র ও সমাজ। বিদ্বেষ ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সংবেদনশীলতা ও প্রীতির আদর্শ প্রতিষ্ঠা তাই অপরিহার্য। আর এজন্য দেশভাগের বহুকৌণিক বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ ও বিচার-বিবেচনা বিশেষ জরুরি। যাঁরা এই দায়িত্ব শৈল্পিকভাবে পালন করেছেন তাঁদের জানাই অভিনন্দন, কামনা করি আগামীতে এর আরো নতুনতর প্রতিফলন ও মূল্যায়ন। কেননা বাংলা বিভাজন এখনও দাবি করে আরো বহুতর বিভিন্নমুখী বিচার-বিবেচনা ও বিশ্লেষণ। পঞ্চাশের দশকে ময়মনসিংহ শহরে দাঙ্গা ও হিন্দুসমাজের দেশত্যাগের পটভূমিকায় হৃদয় মথিত-করা গল্প লিখেছেন রাহাত খান, গভীরতর চৈতন্য থেকে গল্পের নাম তিনি দিয়েছেন '*আমাদের বিষবৃক্ষ*'। সেই বিষবৃক্ষের শেকড় তো সমাজের গভীরে জারিত হয়ে আছে, শিল্পীকে সেখানে পালন করতে হয় বিষহরির ভূমিকা। বাংলা বিভাজনের শৈল্পিক বিচার সামাজিক কলুষ দূর করার জন্য তাই একান্ত জরুরি।

দেশভাগ ও রশীদ করীমের উপন্যাস

রশীদ করীম দেশভাগ নিয়ে কিছু লেখেননি, তিনি দেশভাগ ছাড়া আর বিশেষ কিছু নিয়ে লেখেননি—এমন বক্তব্যে কূটাভাস খুঁজে পাবেন অনেকে। তবে এটা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধিতা, এর আড়ালে এক বড় সত্য রয়েছে যা রশীদ করীমের সমগ্র সাহিত্য বিবেচনায় নিলে নজরে না পড়ে পারে না। রশীদ করীম মূলত ঔপন্যাসিক এবং উপন্যাস রচনায় কাহিনী কাঠামোর দিক দিয়ে তিনি ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুগামী। আর চরিত্র নির্মাণে কিংবা ব্যক্তিমানবের মনের গহিনে আলোকপাত ঘটাতে তিনি বিশ শতকীয় আধুনিকতার শরিক হয়ে রয়েছেন। বর্ণনাভঙ্গি ও ভাষা-ব্যবহারে নির্মেদ ঝকঝকে ভাব রশীদ করীমের প্রতিটি উপন্যাসকে বিশিষ্ট করে রেখেছে। তাঁর উপন্যাসে নরনারীর সম্পর্কের ওপর যে জোর পড়ে এবং উপন্যাসের পটভূমিকায় সমাজের যে অমোঘ অথচ অ-সোচ্চার উপস্থিতি সেটা প্রায়শ বিভ্রমের সঞ্চার করে। তিনি মানব-মানবীর কথাই বলতে চেয়েছেন উপন্যাসে এবং তাঁর উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা যে পটভূমিকায় বেড়ে উঠেছে সেখানে দেশভাগ ও তার পূর্বাপর সময়ের ছায়াপাত রয়েছে অনিবার্যভাবে; কিন্তু উপন্যাসের শরীরে একান্ত স্বাভাবিকভাবে এর সম্পৃক্তি আমাদের দৃষ্টি সেদিকে আলাদাভাবে টানে না। তেমনভাবে টানবার কথাও অবশ্য নয়, কেননা ঔপন্যাসিকের কাজ ইতিহাসের ধারাক্রম তুলে ধরা নয়, মানুষের জীবনরূপ মেলে ধরা। কিন্তু রশীদ করীম উপন্যাসে মানুষ ও জীবন উভয়কে বিম্বিত করলেও, খুব আশ্চর্যজনকভাবে, তাঁর উপন্যাসে সময়, বিশেষভাবে দেশভাগের অভিঘাত, প্রায়শ আলোচনার বাইরে থেকে গেছে।

বাইরে যে থেকে গেছে তার একটি বড় কারণ আমাদের সাহিত্যদৃষ্টিভঙ্গির স্বআরোপিত কতক সীমাবদ্ধতা, যা আমাদের খণ্ডীকরণের দিকে অনেক বেশি প্ররোচিত করে এবং সমগ্রদৃষ্টি ব্যাহত করে। দেশভাগের উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি তেমন উপন্যাস রশীদ করীম লেখেননি, কিন্তু তাঁর মতো করে আর কারো উপন্যাসে দেশভাগের এমন দীর্ঘ ছায়াপাত ঘটেছে বলেও তো মনে হয় না। এই বক্তব্যের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রয়োজন, তবে তার আগে এটাও আমাদের লক্ষ্য করতে.হয় রশীদ করীমের জন্ম ১৯২৫ সালের ১৪ আগস্ট কলকাতায় এবং তিনি বড় হয়েছেন অবিভক্ত বাংলার এই কেন্দ্রীয় শহরে।

তাঁর পড়াশোনাও এখানে এবং বাল্য-কৈশোর-যৌবনের স্মৃতি বলতে মূলত রয়েছে নাগরিক স্মৃতি। লেখালেখিতে তাঁর হাতেখড়ি ঘটে কলকাতাতেই। কৈশোর-যৌবনের সেই সন্ধিক্ষণে বাংলার সমাজে টালমাটাল সব ঘটনা ঘটে চলেছে, বাড়ছে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত অনিবার্য হয়ে উঠলো দেশভাগ। রশীদ করীম দেশভাগের পর ঢাকায় এসে পেশায় স্থিত হতে সচেষ্ট হন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর পূর্ববাংলা তখন পাকিস্তানের অংশ হিসেবে টানাপোড়েনে জর্জরিত পতন-অভ্যুদয়ের এক যাত্রা সূচিত করেছে। এই সময়ে দীর্ঘকাল রশীদ করীম সাহিত্যরচনা থেকে দূরে ছিলেন এবং তুলনামূলকভাবে সাহিত্যপাঠে অধিক নিবিষ্ট ছিলেন। দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস *উত্তম পুরুষ*, কাহিনীর পটভূমি চল্লিশের দশকের কলকাতা, অভিজাত মুসলিম সমাজের বৃত্তে আবর্তিত এই কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ এবং চড়া সুরে বাঁধা তৎকালীন রাজনীতির উত্তাপ।

বাস্তববাদী লেখক হিসেবে *উত্তম পুরুষ* রচনা করেছেন রশীদ করীম। তাঁর কাহিনীর উপজীব্য যে সময় ও সমাজ, চল্লিশের দশকের সেই কয়েকটি বছরে ভারত তথা বাংলার রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ তীব্রভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং মুসলিম লীগ হয়ে পড়ে মুসলমানদের একান্ত কণ্ঠ, যে হয়ে-ওঠা বিষয়টির মধ্যেই থেকে যায় সমাজের বিকাশে এক অসুস্থতার লক্ষণ। এমনি অসুস্থতা কোন্ কারণে গড়ে উঠেছিল এবং এই বিকৃতি সমাজমানসকে কীভাবে আচ্ছন্ন করেছিল তাঁর ব্যাখ্যাদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেননি রশীদ করীম। তবে এমনি ব্যাখ্যা যাঁরা দিতে চাইবেন তাঁরা রশীদ করীমের জীবনচিত্রণে পাবেন ভাবনার অনেক উপাদান। বাংলার সমাজে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ফারাক সৃষ্টি হওয়ার পেছনে সমাজের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে যে অহমিকা ও ক্ষুদ্রতা কাজ করেছিল, বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের বিত্তবান শিক্ষিত সফল সদস্যদের বলয়ে এবং এর জের হিসেবে উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্তের মানস যে-ভাবে খর্বিত ও বিকৃত হয়েছিল এবং শক্তিবৃদ্ধি করেছিল ধর্মপরিচয়ভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের, তার প্রতিফলন রয়ে গেছে *উত্তম পুরুষ*-এ। অণিমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপন্যাসের নায়ক শাকের যোগ দিয়েছিল অনেক দ্বিধা কাটিয়ে। কলকাতার এলিট গোষ্ঠীর এই আয়োজনে শাকের কিছুটা যেন বহিরাগত, নবাগত এক অতিথি, অনেকটাই জায়মান বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বুঝি সে। সহপাঠীদের নিয়ে আয়োজিত এই পার্টিতে বন্ধু মুশতাকই তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, হালে যে ধরেছিল সিগারেট, ডি লুক্স টেনর। এই পার্টিতে আসার কথা রয়েছে সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়ের, এলে গান জমবে ভালো। মিত্র তিনি তখনো হননি এবং এসব বর্ণনা শহরের ওপর মহলের ভেতরের খবর প্রকাশ করে। ওপরে মাঝ-সাইজের একটি কামরায় উপস্থিত হয়ে শাকের দেখল, লেখকের জবানিতে, "সেখানে সাত-আটজন ছেলেমেয়ে বসে গল্প করছিল। অর্থাৎ একজন আরেকজনের রুমাল কেড়ে নিচ্ছিল; তৃতীয়জন চতুর্থজনের চোখ টিপে ধরছিল: পঞ্চমজন ষষ্ঠের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করছিল: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ'।" এই বয়ানে লেখকের রচনাকুশলতা ছাড়াও তাঁর নির্মোহ বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি চমৎকারভাবে

প্রতিফলিত হয়েছে। এরপরই ডি-কের সঙ্গে পরিচয় ঘটে শাকেরের, প্রেসিডেন্সির ইতিহাস অনার্সের অহমিকা-পীড়িত এই 'তুখোড়' ছাত্রের সঙ্গে শাকেরের আলোচনায় অনিবার্যভাবে এসে পড়ে পাকিস্তান প্রসঙ্গ এবং দীর্ঘ সেই বাদানুবাদ উপন্যাস ঘিরে অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। তবে যে-নির্মোহতা ঔপন্যাসিকের কাছে আমাদের কাম্য তার প্রতিফলন হিসেবে এই অধ্যায়কে দেখা সঙ্গত এবং সেই বিবেচনায় পাত্রপাত্রীর সংলাপের মধ্যে সত্যসন্ধান না করে সামগ্রিক বাস্তবতার মধ্যে ইতিহাসের সত্য খুঁজে দেখা দরকার। অন্যদিকে ডি-কের চরিত্রচিত্রণে লেখক পুরোপুরি নির্মোহ থাকতে পেরেছেন কিনা সে প্রশ্ন থেকে যায় এবং এই চরিত্রটি শাকেরের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হলেও লেখক এখানে পক্ষপাতহীন অবস্থান বোধকরি শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারেননি।

আগেই বলেছি, উপন্যাস বিচরণ করে ভিন্নতর স্তরে, ইতিহাস অপর স্তরে। উপন্যাস বহুমাত্রিকতা নিয়ে পরিশীলিত শিল্পিত ভাষ্য দাঁড় করায় ইতিহাসের ঘটনাধারার। ফলে *উত্তম পুরুষ*-এ আমরা নরনারীর জীবনের জটিল সম্পর্কজালের গহিনে তলিয়ে যেতে যেতেও বুঝতে পারি বিশেষ সময়ের অভিঘাত, নানাভাবে নানাদিক দিয়ে যা বিচ্ছুরিত হয়। এমনকি ষাটের দশকের গোড়ায়, পাকিস্তানী মৌলবাদী ইতিহাসবিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রশাসনের আওতায় কলকাতার পটভূমিকায় কাহিনীর উন্মোচন, তা প্রতিটি ডিটেলে, জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও সমস্যার অন্যতর মাত্রা তুলে ধরেছিল। এদিক দিয়েও *উত্তম পুরুষ*-এর ছিল এক আলাদা তাৎপর্য, যা পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজের বিকাশের ধারাবাহিকতার প্রত্যয়ন করেছিল, যে ধারাবাহিকতা পাকিস্তানী রাষ্ট্রাদর্শের অনুকূল ছিল না। রশীদ করীমের লেখার ছত্রে ছত্রে ফেলে আসা কলকাতা এমনভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল, যার মধ্যে দেশভাগজনিত বেদনার প্রতিফলন হয়তো কেউ সহজে খুঁজে পাবেন না, কিন্তু গভীরতরভাবে সেটাও ছিল দেশভাগ নিয়ে এক ধরনের স্টেটমেন্ট, কোনো সোচ্চার বক্তব্য যদিও নয়, এমনকি প্রকাশ্য অবস্থানও নয়। কিন্তু মানবজীবনের বিশাল টানাপোড়েনকে সংযম ও শিল্পচেতনায় জারিত করে প্রকাশে তাঁর শক্তিময়তায় অর্জন ছাড়িয়ে যায় উদ্দিষ্টকে। উদাহরণ হিসেবে সরল এক বর্ণনা দাখিল করা যায়: "উভয়েই এসপ্লানেডের ট্রামে উঠলাম। তখনো আমীর আলী এভিনিউ, গড়িয়াহাট রোডে ট্রাম লাইন বসেনি। তাই পার্ক সার্কাস থেকে এসপ্লানেড ঘুরে বালীগঞ্জ যেতে হতো। অবশ্য দশ নম্বর বাস ধরতে পারতাম, কিন্তু বাসে এত ভিড় যে সে প্রস্তাব মনেও আসে না। এসপ্লানেড পৌঁছলে মুশতাক বলল, আগে একবার নিউ মার্কেট যেতে হবে।"

পাকিস্তান আমলে, কলকাতা যখন প্রায় এক নিষিদ্ধ নগরী, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কে সন্দেহ আর অবিশ্বাস হয়ে আছে বিবেচনার মাপকাঠি তখন এমনি বাস্তবতার উপস্থাপন একটি স্টেটমেন্ট বটে। তদুপরি আমাদের মনে রাখতে হবে উদ্বাস্তু হয়ে আসা কক্ষচ্যুত এক তরুণ স্মৃতিভারাতুরভাবে লিখেছেন এই উপন্যাস, কিন্তু কোথাও স্মৃতিকাতরতার পরিচয় দেননি। পূর্ববাংলায় এসে পেশাদারি জীবন শুরু করেছেন রশীদ করীম কৃতিত্বের সঙ্গে, কর্মসাফল্য তাঁর করায়ত্ত ছিল, ছিল নিষ্ঠার সঙ্গে সাফল্যের পথ বেয়ে এগিয়ে চলা। ফলে

পিছুটান যাকে বলে সে-ধরনের অবকাশ রশীদ করীমের মধ্যে ছিল না। সেজন্য তেমনভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে দেশভাগ তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য কখনো হয়নি। অথচ দেশভাগের বিষণ্ন এক ভিন্নতর ছায়াপাত তাঁর উপন্যাসের পরতে পরতে মিশে থেকেছে, যা আলাদাভাবে শনাক্ত করা যায় বটে, কিন্তু একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যায় না।

উত্তম পুরুষ যেমন প্রত্যক্ষভাবে দেশভাগের পূর্ব পর্বের কাহিনী, পরবর্তী উপন্যাস *প্রসন্ন পাষাণ* ঠিক ততটা প্রত্যক্ষ রূপায়ণ না হলেও এক্ষেত্রে সমাজ ও সময়ের পটভূমিকা অনেকটাই এক। তবে এখানে কাহিনী বলা হয়েছে অগ্রসর এক মুসলিম পরিবারের শিক্ষিত তরুণীর দৃষ্টিকোণ থেকে, যেখানে কলকাতা এবং হিন্দু-মুসলিম জীবনসাধনার জটিলতা উভয়েরই পরিচয় আমরা পাই। এক হিসেবে বলা যেতে পারে *উত্তম পুরুষ*-এর অনুগামী উপন্যাস এটি, সেকুইয়েল।

পরবর্তী উপন্যাসসমূহে রশীদ করীম ফিরে এসেছেন সমকালীনতায়, *আমার যত গ্লানি* স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থানের পটভূমিকায় বিন্যস্ত উপন্যাস। এই রচনায় যেমন ব্যক্তিকে তেমনি সমকালকে ধারণ করতে সচেষ্ট ছিলেন লেখক। ফলে ঘটনা ও চরিত্রচিত্রণে সমকালীন রাজনীতির অভিঘাত অনেক সরাসরি, সামরিক শাসনপীড়িত দেশের বেদনা ও জনগণের মুক্তির উদ্বেলতা নানাভাবে কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে। 'আমি লোকটা আসলে একটা খচ্চর' বলে যার জবানিতে কাহিনী বলা হয়েছে তাঁকে সমালোচকদের অনেকে আউটসাইডার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এই লোকটি, যার কোনো পিছুটান নেই, তাঁরও এক কলকাতাস্মৃতি উপন্যাসে চকিতে ভেসে ওঠে, সাত বছর বয়সে বেড়াতে এসেছিল গোরাচাঁদ রোডের এক বাড়িতে, তারপর সকালের স্টেটস্‌ম্যান, ময়দানে গোরাদের ফুটবল খেলা, হেদুয়ার পুকুরে সাঁতার, আর আঙুলে সোনার আংটি ও বিদেশী সিগারেটের টিন হাতে সুশোভিত ভদ্রলোকের স্মৃতি তাঁকে আপ্লুত করে ফেলে। স্মৃতিতে ভেসে আসা এই ছেলেটির সঙ্গে আমাদের আজকের নায়কের এতোটাই ফারাক ও বিযুক্তি ঘটে গেছে যে অতীতের পরিবেষ্টনে তাঁর অস্তিত্ব আর আপন অস্তিত্ব মনে হচ্ছে না। চকিত এই অতীতচারিতাকে ভিন্নতর মাত্রা যুগিয়ে রশীদ করীম অবিস্মরণীয়ভাবে লেখেন:

> এই যে ছেলেটির কথা বললাম, সে মনের দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো কোথা থেকে? একেবারে অবাস্তব কোনো বস্তুকে এতো পরিষ্কার তো দেখা যায় না।
>
> তাহলে কি ছেলেটি কোথাও আছে? আমার স্থির বিশ্বাস, আছে।
>
> আমার মনে হয় সেই ছেলেটি আরেকটি আমি। আমার অস্তিত্ব থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া আমারই কোনো অংশ সেই ছেলেটি। তাকে চোখে দেখিনি। কিন্তু সে আমারই মধ্যে কোথাও ছিল বা আছে। এমনকি খুঁজে বেড়ালে হয়তো কোথাও কোনোদিন তার দেখা পেয়ে যাব। অবাক হয়ে দু'দণ্ড তাকিয়ে থাকবো পরস্পরের দিকে। দু'জনই ভাববো, এও কি সম্ভব? তারপর দু'জন দু'দিকে চলে যাবো।

আমার যত গ্লানি এমনিভাবে খুব সামান্যের মধ্য দিয়ে দেশভাগজনিত বাস্তবতার অনুপম প্রকাশ ঘটিয়েছে এবং উপন্যাস যে বিপুল মাত্রা বহন করে ও সমাজসত্যকে

বহুবিচিত্রভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ সেই পরিচয় তুলে ধরেছে। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত নভেলেট *শ্যামা*-র উপজীব্য স্থিত হতে-না-পারা এক রুচিবান শিক্ষিত নারীর জীবন-যন্ত্রণা। শ্যামা ক্যান্সারে আক্রান্ত, তাঁর আয়ু ফুরিয়ে আসছে এবং শ্যামা পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চপদস্থ স্বামীর সংসার থেকে ফিরে আসে ঢাকায়, তাঁর কৈশোর যৌবনের স্মৃতির ভালোবাসার মধুময়তায় আবারও চায় বুঁদ হতে। মৃত্যুর আগে আশ্রয়কাঙালিনী এই শ্যামা বাংলা উপন্যাসের এক স্মরণীয় চরিত্র। তাঁর সম্পর্কে গোড়ায় চকিতে কিছু তথ্য দেন লেখক, শ্যামার বাবা খ্যাতনামা ব্যারিস্টার, স্কুলজীবনে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়েলের পরিবর্তে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন এবং কলেজ জীবনে লেডী ব্রাবোর্নের পরিবর্তে বেথুন কলেজে পড়েছিল বলে শামীম হয়ে গিয়েছিল শ্যামা। এরপর দ্রুতই আমরা পৌঁছে যাই ছেচল্লিশের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে, দাঙ্গা ও দেশভাগে। কলকাতা ছেড়ে আমাদের নায়ক চলে আসে ঢাকায়, শ্যামা চলে যায় করাচি। দীর্ঘকাল পর আবার শ্যামার প্রত্যাবর্তন ঢাকায়, যে প্রত্যাবর্তন আসলে উৎসের কাছে ফেরার আকুতি, যে উৎস থেকে অনেক আগে বৃন্তচ্যুত হয়ে গেছে উপন্যাসের পাত্রপাত্রী প্রবল সামাজিক বিলোড়নে। ক্ষুদ্রকায় এই উপন্যাস একান্তভাবে মানব-মানবীর কাহিনী, কিন্তু এখানেও তো দেশভাগের পটভূমিকার চকিত অথচ সর্বগ্রাসী উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই।

দেশভাগ সবচেয়ে বড়ভাবে এসেছে রশীদ করীমের বৃহদায়তন উপন্যাস *মায়ের কাছে যাচ্ছি*-তে। এই উপন্যাসে সমাজ বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং পাত্র-পাত্রীরা বিভিন্নভাবে ইতিহাসের প্রধান ঘটনাধারার ওপর আলোকপাত ঘটাতে চেষ্টা নেয়। *উত্তম পুরুষ*-এ যা ছিল পটভূমিকায় এখানে তা যেন পাদপ্রদীপের সামনে। রশীদ করীমের বৃহদায়তন এই উপন্যাস, লেখকের ম্যাগনাম ওপাস, দাবি করে পৃথক ও বিস্তারিত আলোচনা। এই উপন্যাসেও আছে ফেরার তাগিদ, কিন্তু সেইসঙ্গে রয়েছে সামনের দিকে তাকানো, বিভাজনের অতীত পেরিয়ে বাঙালি জাতির সম্মিলিত সাধনায় রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা ও আগামীর জটিল অভিযাত্রা। এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে কামর সাহেবের অবস্থান, কলকাতার অতীত ছেড়ে নয়, বহন করে এনে তিনি স্থিত হয়েছেন পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে। বিপুল পরিবর্তনময়তার মধ্যেও তিনি খুঁজছেন অগ্রগতির পথের ইশারা। আরো অসংখ্য চরিত্রের আনাগোনা ঘটেছে উপন্যাসে। *উত্তম পুরুষ* যদি-বা কোনো ধোঁয়াশার মধ্যে থেকে থাকে, কামর সাহেব সেই তুলনায় বিশেষ স্বচ্ছদৃষ্টির অধিকারী, কেননা ইতিহাসের গতিধারা ততদিনে অনেক বিভ্রান্তির কুহক দূর করতে সমর্থ হয়েছে। অবশ্য দ্বন্দ্বের বিষয়ও ইতিমধ্যে পাল্টেছে, চল্লিশের দশকে বাঙালি মধ্যবিত্ত পীড়িত হয়েছিল হিন্দু এলিটদের দ্বারা, *উত্তম পুরুষ*-এ ক্রোধে বিস্ফোরিত হয়েছিল ডি-কে, শেষমেষ বলেছিল, "যাও যাও। একজন নেড়েকে ডেকে এনে বাড়ির মেয়েদের মধ্যে ভিড়িয়ে দিতে তোমাদের লজ্জা করে না। যখন কাউকে নিয়ে ইলোপ করবে তখনই তোমাদের শিক্ষা হবে।" আর *মায়ের কাছে যাচ্ছি*-তে ঢাকার নব্য-এলিটদের পার্টির বিবরণ আমরা পাই, সেখানে আছেন আখন্দ সাহেব। তাঁর সম্পর্কে রশীদ করীম লিখেছেন: "পরনে সাফারি সুট। চোখ দুটি ক্ষুদে।

দৃষ্টি ঠাণ্ডা। ব্যবহার খুব ভালো। তাঁর স্ত্রী ছাড়া, অন্য কেউ, তাঁকে কখনো মেজাজ খারাপ করতে দেখেনি। তাই লোক হিসেবে সকলেই তাঁর তারিফ করেন।" গাল-গপ্পের এক পর্যায়ে হানিফ মোহাম্মদের বিপরীতে রনজির ক্রিকেট দক্ষতার প্রশংসায় মেতে উঠলেন কামর। তখনই ভ্রূ কুঞ্চিত হয়েছিল আখন্দ সাহেবের। পরে কামর আরো বললেন, "এই তো সেদিনও আমরা সকলেই ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সাবজেক্ট ছিলাম। ইন্ডিয়া, পাকিস্তান আর বাংলাদেশের অনেক কমন য়্যাসোসিয়েশন আছে। এই যে তো এতো ঝগড়াঝাঁটি হয়, সে-ও আসলে একটা লাভ হেট রিলেশনশিপ। তিনটি আলাদা সভরেন স্টেট থাকুক, খুব ভালো কথা। কিন্তু লড়াই ফ্যাসাদ ঝগড়াঝাঁটি একদিন বন্ধ হয়ে যাবে। ইউরোপের বহু দেশের মধ্যে যেমন হয়েছে। শিল্প-সংস্কৃতিতে যেখানে যা কিছু ভালো তাকেই আপন করতে হবে। শিল্প-সংস্কৃতির স্বভাবই হচ্ছে তাই। ইউরোপে কতো দেশ আর কতো ভাষা। তবুও ইউরোপিয়ান সিভিলাইজেশন বলে একটা জিনিস আছে। তিনটি আলাদা সভরেন স্টেট থেকেও তিন দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব হবে।"

এবার জবাবে সাফারি-শোভিত ভদ্রজন আখন্দ সাহেব চল্লিশের দশকের ডি-কের প্রেতাত্মার মতো বলে ওঠেন: "আসলে ইন্ডিয়ার প্রতি আপনার একটা টান আছে। শুনেছি, শত শত বছর আগে আপনাদের বংশের কোনো এক মা হিন্দু মহিলা ছিলেন। আপনার শরীরে হিন্দু রক্ত রয়েছে।"

মায়ের কাছে যাচ্ছি দাবি করে অনেক বিশদ বিবেচনা বিশ শতকের এক বিশাল সময় জুড়ে বাঙালি সমাজের বিবর্তনময়তা যে উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে তার আলোচনা সংক্ষেপে করা দুরূহ। ব্যক্তিজীবনের গভীরতা ও সমাজজীবনের প্রসারতা একই উপন্যাসে মেলে, তেমন কাজ খুব বেশি পাওয়া যাবে না। *মায়ের কাছে যাচ্ছি* সেদিক দিয়েও এক ব্যতিক্রমী উপন্যাস, তবে সেই তুলনায় উপন্যাসটি সমালোচকদের যোগ্য মনোযোগ লাভ করেছে বলে মনে হয় না।

সব মিলিয়ে এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, দেশভাগের অভিঘাত স্বীয় জীবন ও রচনায় পরিশীলিতভাবে আত্মস্থ ও প্রকাশে সমর্থ হয়েছেন রশীদ করীম, সেই কাজের সঙ্গে তুলনীয় কিছু খুঁজে পাওয়া ভার। বহুমাত্রিকতা নিয়ে রচিত তাঁর উপন্যাসসমূহ তাই কখনো অনুজ্জ্বল হবে না, বরং ক্রমেই উদ্ভাসিত হবে এর বিভিন্ন মাত্রার তাৎপর্য, যার ভরকেন্দ্রে রয়েছে দেশভাগের মানুষ।

'কালো বরফ': জীবনের নীলকণ্ঠ উপাখ্যান

প্রায় খেলাচ্ছলেই যেন সবকিছুর শুরু। তারপর সর্বনাশের আভাস বুঝে ওঠার আগে, কোনোকিছু টের না পেতেই ভয়ঙ্কর আরেক নিষ্ঠুর খেলায় জড়িয়ে পরে সবাই। জীবন মানুষ গড়ে নিতে চায় একরকম, সমাজ-ইতিহাস-রাজনীতি-অর্থনীতি তাকে টেনে নিয়ে যায় আরেক চোরা ঘূর্ণিস্রোতে, ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব প্রেম-ভালোবাসা স্নেহপ্রীতির বন্ধন, তার একান্ত আপনকার ছোট ছোট অনুভূতি-অনুভবের মালিকা, কিছুই তো আর কোনো সার্থকতা খুঁজে পায় না। সমাজ-বাস্তবতার নির্মমতার দেয়ালে আছড়ে পড়া ব্যক্তিমানবের স্মৃতি ও সত্তা নিয়ে ফিরে ফিরে কাহিনী রচনা করেছেন মাহমুদুল হক, *নিরাপদ তন্দ্রার* হিরণ, কোনো কিছু না বুঝেই জয়পাড়ার ঘরসংসার পিতামাতার স্নেহচ্ছায়া ছেড়ে নেমে এসেছিল পথে প্রেমিক পুরুষের হাত ধরে, জলেশ্বর মাঝির মনপবনের নায়ে করে আবার সে ফিরে যেতে চেয়েছিল তার কৈশোরের খেলাঘরের দিনগুলোতে, যে ফেরা যতো সম্ভাবনাহীন, তার টান ততো প্রবল। পঁচিশে মার্চের গণহত্যার পটভূমির রাতে দাবার ছক সাজিয়ে রাজীব ভাইয়ের সঙ্গে খেলতে বসেছিল খোকা, এই খেলাই তো তাকে টেনে নিয়ে গেল সর্বনাশের শেষ সীমায়। আর জীবনমৃত্যুর সর্বনাশা দোলাচলে দুলতে দুলতে পূর্বাপর সব বিস্মৃত হয়ে মুকুল এক আত্মবিস্মৃত খেলাঘরই বাঁধতে চেয়েছিল কুসুমকে নিয়ে, কিংবা বলা যায় কুসুমই চারপাশের শ্বাপদ-হিংস্র বাস্তবতা থেকে দূরে এক নিষ্পাপ মানবিক খেলায় টেনে এনেছিল মুকুলকে।

জীবনের নানা বিচিত্র পটভূমিকায়, আলাদা আলাদা ভিন্নধর্মী নানা টানাপোড়েনের মধ্যে মাহমুদুল হকের চরিত্রাবলি রক্তের ভেতর যে খেলার টান অনুভব করে, প্রায়শ যা স্মৃতির অনুষঙ্গ হয়ে ভেসে আসে, তছতছ করে দেয় সমাজসংসার অথবা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া জীবনের জন্য পরম নির্ভরতার আশ্রয় হয়ে ওঠে সেই খেলাময়তার তাৎপর্য নিহিত রয়েছে অনেক গভীরে। অস্তিত্বের ভেতর এই ভিন্নতর বোধের 'খেলা'ই তো আলোড়িত করেছিল নির্জনতম বাঙালি কবিকে। সেই নিষ্ঠুর খেলা তাঁকে থাকতে দেয়নি জীবনের কোনো নিশ্চিত অবস্থানে। পরিপূর্ণ জীবনে অনির্দেশ্য টান সৃষ্টি করে জলের ঘূর্ণির মতো এই খেলা টলিয়ে দেয় সংসার। আবার এমনও তো দেখা যায় জীবন যখন দগদগে

ক্ষতের মতো বীভৎস মুখব্যদান করে তখন খেলাময়তাই হয় ব্যক্তির শেষ আশ্রয়, যেমন ঘটেছে মাহমুদুল হকের অনেক চরিত্রের ক্ষেত্রে।

শুদ্ধতম খেলা কৈশোরের মানবের পক্ষেই সম্ভব। খেলার সঙ্গে আবার মানব-কৈশোরেরও রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগ্য। হেরাক্লিয়ন মিউজিয়মে রয়েছে খ্রিস্ট জন্মেরও দেড় হাজার বৎসর আগেকার ক্রীড়াদৃশ্যের পোড়ামাটির ভাস্কর্য, চার উলঙ্গ মানব হাতে হাতধরে নৃত্যপর, যে নৃত্যের ধাঁচ এখনও ক্রিট দ্বীপের বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা যাবে। বাংলার ব্রতসাধনায় দেখা যাবে তেমনি নানা কৈশোরক আয়োজন। *পথের পাঁচালি* ছায়াচিত্রে দুর্গার মৃত্যুদৃশ্য অমন নাড়িছেঁড়া প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছিল অসুখের অব্যবহিত পূর্বে তার পতিব্রত পালন বা খেলার কারণেই। এই খেলার জগতেই আমাদের টেনে নিয়ে যায় *কালো বরফ* উপন্যাস। বালক কিশোরের চোখে আমরা ক্রীড়াময়তায় নিমগ্ন এক নির্মল জগৎকে দেখতে থাকি, প্রায় চিত্রসম্ভবা এক স্মৃতিময়তা আমাদের মুগ্ধ ও আবিষ্ট করে। কিন্তু তার পিছু পিছু সবসময়েই চলে বাস্তবের তাড়না, কখনোই আমরা সম্পূর্ণ ডুবে যেতে পারি না স্মৃতিময় সত্তার ভেতর, জেগে উঠতে হয় অন্ধকারে ধড়মর করে, তখন চোখে পড়ে ছেঁড়া মালার পুঁতিগুলো ছড়িয়ে আছে ঘরময়।

'তখন আমার অভ্যাস ছিল বুড়ো আঙুল চোষার', বালকের এমনি এক স্মৃতির বয়ান দিয়ে নির্দোষ সূচনা উপন্যাসের। এই বালকের চোখে সবকিছুই ছিল অবাক-করা, সস্তাদরের রঙিন ভাঙা চুরির শেকল সে উপহার পেয়েছিল বন্ধুজনের কাছ থেকে, মনে হতো এমন চমৎকার ও মূল্যবান সামগ্রী বোধহয় ভূ-ভারতে নেই। পুকুরঘাটে গুচ্ছের থালা-বাসন মাজতে বসা পুঁটিকে দেখতো বিস্মিত চোখ মেলে। পুঁটির কর্তৃত্বে আছে হাড়ি চেঁচে তুলে আনা পোড়া সর, এর চেয়ে সুমিষ্ট বস্তু আর কী আছে। পুঁটি যে কথা বলে মাছের সঙ্গে, গাছের সঙ্গে, সেসব কথা বালকের জন্যে মুগ্ধতা ছড়ালেও আমরা পেয়ে যাই পতিব্রত সাধনারই আরেক রূপ—দরিদ্র ভাগ্যপীড়িত এই বালিকা গৃহপরিচারিকা জীবনের সব বঞ্চনা অভাবকে এমনি কথামালা দিয়েই তো পূরণ করে নিতে চায়। মাছ যেমন পুকুরঘাটে বুড়বুড়ি তুলে ওকে বলছে, 'ও পুঁটি, তুমি কি ভালো মেয়ে, তোমার মুকুট পড়া রাজপুত্তুরের মতো টুকটুকে বর হবে।' আকন্দ গাছের গোড়ায় ঘটি উপুড় করা জল ঢেলে সে বলছে, 'গাছ ভাই, এই দ্যাখো আমি তোমার গোড়ায় এক ঘটি জল দিলাম, আমার যেন খুব ভালো বর হয়।'

বালকের সঞ্চয়ে আর ছিল একটি ভাঙা তেশিরা কাচ, যার ভেতর দিয়ে দেখলে রাস্তাঘাট গাছপালা সবকিছু রঙধনুর মতো ঝলমলে হয়ে ওঠে। অবশ্য কাচের কোনো প্রয়োজন ছিল না, সব বালকের চোখেই তো থাকে এমনি তেশিরা অঞ্জন। বালকের এই বর্ণিল জগতে কেবল ব্যক্তি ও বস্তুপুঞ্জের ছাপ ছিল না, ছিল সময়েরও চিহ্ন, যে সময় চুঁইয়ে এসেছিল তেশিরা কাচের ভেতর দিয়েই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায় তখন, জাপানিরা বর্মা অবধি পৌঁছে গেছে। সৈন্যদের ছাউনি পড়েছে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে—'কাছাকাছি কোথাও ছিল গোরা সৈন্যদের ছাউনি।... রাস্তার দিকে পা বাড়ালেই কানমলা খেতে

হতো; সুযোগমতো ছোট ছেলেমেয়ে সামনে পেলেই নিগ্রোরা নাকি ম্যাঁচম্যাঁচ করে তাদের চিবিয়ে ফেলে, এইসব শূন্যতায়।... হাইলেচা হাইলেচা, হাইলে হাইলে হাইলেচা, এই ধরনের একটা বিচিত্র গান ফেঁদে বসতো পানু, ভোরবেলা সৈন্যরা যে সব গান গেয়ে দলবেঁধে রাস্তায় দৌড়াতো তারই কিছু একটা নিজের সুবিধামতো ভেজে নিয়েছিল সে।' স্মৃতির সবটুকুই এমন আনন্দময় ছিল না, সময়ের দংশনও জেগে উঠছিল নির্মমভাবে, যদিও তার পূর্বাপর বোঝা ছিল বালকের সাধ্যের অতীত।

দুই.

স্মৃতির জগতে ফিরে ফিরে হাতড়ে বেড়াচ্ছে আবদুল খালেক, মফস্বলী কলেজে অধ্যাপনার অসচ্ছল জীবনে নৈমিত্তিক অভাব লেগে থাকলেও সঙ্কট তো কিছু নেই। রেখার নিজের জীবনেও দুঃখভোগ বড়ো কম নেই, মামার সংসারে বড় হয়ে ওঠা বালিকার শত গঞ্জনার স্মৃতিভার তারও তো রয়েছে অশেষ। তাদের উভয়ের প্রেম ও প্রাপ্তির মধ্যে যা কিছু ফাঁক সেসব ভরে দেয়ার জন্য রয়েছে ছেলে টুকু। আবদুল খালেকের উদ্যমহীনতা, সংসারে থেকেও না থাকার যে উদাসীনতা, তা পীড়িত করে রেখাকে। আর দশজন সংসারকামী নারীর মতো সেও দু'হাতে আগলে রাখতে চায় তার সামান্য যা-কিছু অর্জন। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর যে টেনশন, সেই আটপৌরে জীবনাচারের মধ্যে আবদুল খালেকের স্মৃতিমগ্নতা ফিরে ফিরে ইঙ্গিত দেয় এই মানুষটির সাধারণ জীবনের অন্তরালে ডুব দিয়ে থাকা অসামান্য দুঃখবোধের। বন্ধুর অনুরোধে বাল্যস্মৃতির যে ডায়েরি লিখতে শুরু করেছে আবদুল খালেক, সেই রচনাপ্রয়াস তাঁর আপাত অর্থহীন জীবনে যেন নতুন তাৎপর্য যোগ করে, সময়ের মধ্যে থেকে সময়হীনতার ভেতরে সেঁধিয়ে যেতে থাকে সে। মফস্বল কলেজের সাধারণ প্রভাষকের চাকরির যে বিড়ম্বনা, বিশেষত সেই মানুষদের যারা দাপটে নিজেদের জাহির করতে অপারগ, বিদ্যানুরাগ ও শিক্ষকতার প্রতি ভালোবাসা নিয়ে পেশার সঙ্গে সম্পৃক্তি, বাস্তবতা অচিরেই তাদের মোহভঙ্গ ঘটায়। কলেজের পরিচালনা বোর্ডে অঞ্চলের নব্যবিত্তের প্রভাব কিংবা পার্টটাইম ব্যবসায়ী বুড়ো হাবড়া বিবাহিত ইত্যাদি নানা ধরনের একরাশ ভ্যাদামার্কা ছাত্র ঠেলার সঙ্গে বিদ্যাসাধনার সম্পর্ক যে দূরস্থিত সেই উপলব্ধি আবদুল খালেককে উত্তেজিত করে না, বরং তার নিরাসক্তি আরো বাড়িয়ে দেয়। কলেজ চালানোর অপরাগতা শেষে একে কোল্ড স্টোরেজে রূপান্তরিত করবে কি না এমন শঙ্কাও সবসময়ে মাথার ওপর ঝুলছে। নিস্তরঙ্গ মফস্বলী জীবনে এর বাইরে তেমন কোনো উত্তেজনাও নেই। এলাকায় কথাবলার মতো মানুষ বলতে বাজারের সেই নরহরি ডাক্তার। ডাক্তারখানাকে কেন্দ্র করে জীবনের যে আবর্তন সেই সুবাদে সব ধরনের খবরাখবর যেমন মিলে, তেমনি নরহরি ডাক্তারের প্রাণের উত্তাপটুকুও তো পাওয়া যায়। এই পরিবৃত্তে ঘুরপাক খাওয়া আবদুল খালেকের জীবন, উতোর-চাপানোর মতো উপন্যাসের স্মৃতি অধ্যায় ও বর্তমান অধ্যায় ঘটনাসূত্রে প্রবাহিত হয়ে চলে, পর পর সাজানো হলেও দুটি কেবল আলাদা অধ্যায়ই নয়, যেন দুই জীবনের কাহিনী।

তিন.

মা, বাবা, ভাইবোন, পুঁটি, পানু, কুলপিওয়ালা, মালাইওয়ালা, শণপাপড়িওয়ালা, ঝুমি, কেনারাম কাকা, ইরানি জিপসি, চিমটেওয়ালা সাধু, করিমন বিবি, রানিবুবু, আশুচাচা, টিপু ভাইজান, ছবিদি, সুবল, গিরিবালা, নগেন স্যাকরা, মাধু, করুণা দিদিমণি, দেবীনাথ জামাইবাবু, বুড়াদি, প্রমীলা ধাত্রী, দুর্গাদাস বাবু, হরিপদ ঘোষাল, অর্চনাদি এমনি কতো হাজারো মানুষের স্মৃতিতে ভরে আছে বাল্যের জীবন। সবই ঢাকা পড়ে ছিল সময়ের ধুলোর আস্তরণে, সময় যতো এগিয়ে চলে স্মৃতি ততোই দূরে সরে যায়—নাকি এগিয়ে আসে কাছে, তারপর একদিন সময়হীনতার দ্বার ভেঙে একাকার করে ফেলে অতীত, ভূত-ভবিষ্যৎ সবকিছু, সকলকিছু।

আশ্চর্য পরিমিতিবোধ নিয়ে বিধৃত হয়েছে *কালো বরফ*-এর আখ্যান। তাই বালকের জীবনে, উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তাক্ত বিভাজন ও বিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঘটনাবলি ছাপ দেয় চকিত ইশারার মতো, চাবুকের এক-একটি হিসসিসে হঠাৎ-আঘাত আমাদের চিনিয়ে দেয় বাস্তবের স্বরূপ, স্বপ্নের জগৎ ভেঙে না পড়লেও টলে ওঠে সুনিশ্চয়। ছোট ছোট এসব ইঙ্গিত উপন্যাসের ঘটনাক্রমের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে রয়েছে যে তা পুরোপুরি জেনে বোঝার আগেই ঘটনার গতিধারার অমোঘ পতন শুরু হয়ে যায় অজান্তেই। অবিভক্ত বাংলার এক ছোট জনপদে নানা মানুষের সম্মিলিত জীবনধারা, তার মধ্যে পার্থক্য আছে অনেক, আছে বিভেদের নানা উপাদান, কিন্তু সবার ওপর আছে মানবিক মিলন-সূত্র, সেই জীবন ভেঙে পড়তে থাকে, বাস্তবের নানা আঘাতে।

'হরিপদ ঘোষালের ছেলে সুবলের সঙ্গে কি নিয়ে একটা ঝগড়া হয় মনি ভাইজানের, তারপর রাস্তার মাঝখানে ফেলে দে পিটুনি।... তারপর হাঁকাহাঁকি, চিল্লাচিল্লি, থানা পুলিশ, রাজ্যের হাঙ্গামা' এই সামান্যই ঘটনাসূত্র, তাও আবার মেলে ধরা হয়েছে ম্যাড়ম্যাড় করে ঠোঙা চিবুনোরত এক সাদা গরুকে নিয়ে মজাদার কাহিনীর সুবাদে। কিন্তু বোঝা যায় হরিপদ ঘোষালের ছেলেকে যে পিটুনি দিয়েছে মুসলমানের ছেলে সেটা নিয়ে ঘটনার জট পাকিয়েছিল ভিন্নতরভাবে, যদিও বালক আবদুল খালেকের চোখে তা ছিল নিছক হাঁকাহাঁকি, চিল্লাচিল্লি, বিদকুটে হাঙ্গামা।

প্রমীলা ধাই যখন মায়ের স্বাস্থ্যহানি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তখন মা উত্তর দ্যায়, 'এই নানা রকমের চিন্তাভাবনা! পার্টিশান...'

'সে তো আছেই—' প্রমীলা ধাত্রী বললে, 'এতোগুলো ছেলেমেয়ে পেটে ধরা, তাদের মানুষ করা, এ কি মুখের কথা!'

'পার্টিশান' কথাটা একেবারে এড়িয়ে যায় প্রমীলা ধাত্রী। কিন্তু এ একটিমাত্র শব্দোচ্চারণের ভেতর দিয়ে আমরা বুঝে নিই পরিবর্তনময় জীবনের আরেক বাস্তবতা, যা ক্রমশ এগিয়ে আসছে প্রকাণ্ড হা মেলে সবকিছু গ্রাস করতে। কিন্তু নানা কথার মধ্যে মণিকে নিয়েও

উদ্বেগ প্রকাশ পায় প্রমীলা ধাত্রীর কথায়, 'এই তো শুনলাম সেদিন ঘোষালদের ছেলেটাকে রাস্তায় ফেলে ঠেঙিয়েছে! কি না হতে পারতো এইটা নিয়ে।'

এই যে বিশালাকারে সংগঠিত সামাজিক ঘটনা, যার প্রবল তোড়ের সামনে খড়কুটোর মতো ভাসতে থাকে ব্যক্তিজীবন, এর বিরুদ্ধে ব্যক্তিক প্রতিরোধের লোকায়ত ধারাও সমাজে দুর্লক্ষণীয় ছিল না। বস্তুত যা কিছু মানবিক, যা কিছু জীবন অনুগত সে-সবই তো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির রাজনীতি ও সংঘর্ষের বিরোধী। সেইসব দৃশ্যও একেবারেই ছোট ছোট, স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে যে প্রায় শনাক্তই করা যায় না, বুঝতে পারা যায় না এর ভেতরকার শক্তি, যে শক্তি রাজনৈতিক লড়াইয়ে হেরে গেলেও, জীবনের মতোই, তার স্বাভাবিক মানবচেতনা নিয়ে সদা প্রবহমান থাকে, হয়তো অন্তঃসলিলা, হয়তো দৃষ্টি-অগোচর।

একবার এসেছিল এক অন্ধ লোক, রোগা-পাতলা ছিপছিপে চেহারা, দুটো চোখই পাথরের। দেখতে সে পায় বটে তবে সবাই যেমন চোখ দিয়ে দেখে তেমন নয়। পরীক্ষা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে মণি।

'গামছা দিয়ে কষে চোখ বেঁধে দেওয়ার পর মণি ভাইজান বললে, 'আচ্ছা এবার বলো কি দেখছো?'

'একটা বই, বিষাদ-সিন্ধু।'

'এবার?'

'একটা ছবি, সুভাষচন্দ্র বসু!'

মা বললে, 'তুই সর তো, আপনি কি চাল নেবেন, না পয়সা?'

লোকটি বললে, 'ওসব নিয়ে আমি কি করবো মা? ইচ্ছে করলে আমাকে একমুঠো ভাত খাওয়াতে পারেন!'

মা জিগ্যেস করলে, 'আপনি হিন্দু না মুসলমান?'

সে বললো, 'আমি হিন্দু।'

'আমরা মুসলমান, আমাদের এখানে খাবেন?'

মা'র কথার উত্তরে সে বললে, 'অন্নর কি কোনো জাত আছে মা?'

বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের ঘরে যখন বিষাদ-সিন্ধু গ্রন্থ ও সুভাষ বসুর ছবি দুইয়েরই ছিল স্বাভাবিক আসন, প্রাণের টানে যা ঘটেছে, সেই যুগ এখন অনেক পেছনে, আবদুল খালেকের স্মৃতির মতোই, তেমনি পেছনে চলে গেছে দিব্যচক্ষু মানুষেরা, যারা জানে চোখের দেখাই সব নয়, ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখতে জানতে হয়।

মাঝে মাঝে দূর সম্পর্কের এক নানা আসতেন বাড়িতে। সবাই বলতো মাথায় না-কি ছিট। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইংরেজের চাকরি ছেড়ে বইয়ের ব্যবসা খুলেছিলেন, পুঁজি-পাট্টা খুইয়ে এখন করছেন ইস্কুল মাস্টারি।

বলতেন, 'ম-এ মুসলমান, ম-এ মুর্দাফরাস, ম-এ মুচি, সব সমান।'

আরো কতো টুকরো ছবি, বিভাজন মুছে নিয়ে মানবিক জীবনগড়ার কতো অজস্র ধারার ব্যক্তিক সাধনা। দেবীনাথ জামাইবাবুর যাত্রাপালার আসরে বুড়াদি'র সঙ্গে আনন্দময় অবলোকন, বাড়ি গেলে দেবীনাথ জামাইবাবু হয়তো নিয়ে যেতো ভেতরে। বলতোঃ

'আজ না তুমি গুড়ের সন্দেশ তৈরি করেছো, দাও না ওকে—'

বুড়াদি কটমট করে জামাইবাবুর দিকে তাকিয়ে বলতে, 'সে কি আর আছে, সব তো শেষ হয়ে গেছে—'

'কেন, তাকের ওপর যে দেখলাম?'

'ওতো ঠাকুরের। পুজোয় লাগবে না?' তারপর আর আমার দিকে তাকিয়ে বলতো, 'তুই সন্ধ্যার পর আসিস, আমি পুজোটা দিয়ে নিই'—

তা দেবীনাথ জামাইবাবুরও কম নাছোড়বান্দা নয়, বলতো, 'এও তো একটা ঠাকুর, তোমার গোপাল ঠাকুর হে! জ্যান্ত পেয়েছ বলে এভাবে ঠকিও না, দাও দাও, তোমার তো লক্ষ্মীর হাত।'

বাল্যের জীবন, ধর্মশাস্ত্রে যে বলা হয় শিশু হচ্ছে ফেরেশতা, সেই দেবতুল্য মানবসন্তানের অবাক চোখের জীবন, কী তার মাধুর্য, কী তার নিষ্পাপ নিষ্কলুষ নিরঞ্জন অপাপবিদ্ধ জীবনধারা, যেন অনাবিল নির্মল শাদা বরফ। কিন্তু সেখানেও জীবনের নির্মম অভিঘাত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, বুঝতে পারা যায়, যে-জীবন ব্যক্তি তার প্রাণপ্রাচুর্য দিয়ে গড়ে নিতে চাইছে, আর যে-জীবন সমাজপ্রবাহ নির্দেশ করে দিচ্ছে দুইয়ের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে চূর্ণ করে দেবে ব্যক্তির কামনা-বাসনা-সাধনাসমূহ। অসাধারণ এক ঘটনাক্রমের বর্ণনার ভেতর দিয়ে আমরা পেয়ে যাই সেই অমোঘ অশনী সঙ্কেত।

'দ্রুত একটা পরিবর্তন ঘটছিল চারদিকে। সেসব আমরা কিছু বুঝতাম না। হিন্দু-মুসলমানদের দলাদলির কোনো ব্যাপার থেকে বালক সংঘ ভেঙে দু'টুকরো হয়েছিল। কাজীপাড়ার একটা দলের সঙ্গে তুমুল মারপিট হলো একবার। তখন চলাচল ছিল মার্টিন ট্রেনের। চলতো ঢিমেতালে। কাজীপাড়ার ছেলেরা চলন্ত মার্টিনে উঠে কোনোরকম মাথা বাঁচায়। যাওয়ার সময় বলে যায়, এর হিসেব হবে, এক একটা করে লাশ পড়ে থাকবে মাটিতে।

একদিন হরিপদ ঘোষালের সামনে পড়ে গেলাম। আমার পেটে আলতোভারেব ছড়ির ডগা ছুঁইয়ে জিগ্যেস করলো, 'কি হে বালক, তোমাদের বাড়িতে শুনি কাজীপাড়ার মোচোলমানরা দেদার মিটিং করে? তোমার বাবা পাকিস্তান চায় নাকি?'

পাকিস্তান কি জানা ছিল না। বুঝতাম না এসব কিছুই। কাজীপাড়া একদিল শা'র দরগা ঘিরে মুসলমান সমাজের একটা বেড়; সেখানে অন্যকোনো জাতের লোক ছিল না। গরুর গোশত কিনতে হলে ওখানকার হাট ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

কিছুদিন আগে কিসের যেন একটা ভোটাভুটি গেছে; সেই থেকে দেখতাম আমাদের পাড়া-প্রতিবেশীদের অনেকেই মনমরা, কিছু একটা ঘটেছে বুঝতে পারি; কিন্তু কি তা বুঝি না।

'কিছুই জানতাম না। বুঝতাম না। মাঝে মধ্যে আমাদের গ্রামের বাড়ির নিকট আত্মীয়-স্বজনরা এসে ফিশফিশ করতো ঠিকই, তখন সকলের মুখেই থাকতো দুশ্চিন্তার ঝুলকালি মাখা ময়লা ছাপ; আব্বা শুধু গম্ভীর মুখে বলতেন, দেখা যাক কি হয়—'

আমাদের বাইরের ঘরেও মাঝে মধ্যে শুনতাম তুলকালাম চলছে। আব্বা, কেনারাম কাকা, দুর্গাদাস বাবু, নির্মল বাবু আরো অনেকেই খুব শোরগোল তুলে তর্কাতর্কি করতো। আমাদের কানে আসতো কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, জিন্নাহ, জওহরলাল, প্যাটেল, সব মনেও নেই।

আমার একটা গজদাঁত বেরিয়েছিল। হরিতলার মোড়ে গিয়ে ধীরেন ডাক্তারের কাছ থেকে পুরোনো দাঁতটাকে ওপড়ানো হয়।

রাতে দুর্গাদাসবাবু আব্বাকে বললেন, 'ব্যাপারটা কি হলো, আমি থাকতে ছেলেটাকে হেতুড়ের কাছে পাঠানোর মানেটা কি?'

ধীরেন কম্পাউন্ডার থেকে ডাক্তার বলে পেছনে সবাই তাকে হেতুড়ে ধীরেন নামে ডাকতো।

আব্বা বললে, 'ওসব ওর মা জানে—'

দুর্গাদাসবাবু গলা চড়িয়ে বললেন, 'হেতুড়ে ধীরেনই তোমাদের কাছে বড় হলো, এর আমি ব্যাখ্যা চাই।'

চাঁপাডালির মোড়ে ছিল মসজিদ। কাজীপাড়া, ময়না আরো দূর দূর থেকেও অনেকে নামাজ পড়তো আসতো সেখানে। বিশেষ করে ঈদের দিন। সেবার হয়েছে কি, হঠাৎ একটা ঢিল এসে পড়লো। ঢিলটি পড়লো টিপু ভাইজানের পায়ে। পেছনে কে যেন চেঁচিয়ে বললো, 'দ্যাখ দ্যাখ, মাথায় লেজওলা নেড়েরা কেমন কপাল ঠুকতে যাচ্ছে।'

আব্বা বললে, 'কোনোদিকে খেয়াল করার দরকার নেই, হাঁটতে থাকো—'

তা, আমরা সেইমতোই মাথা নিচু করে কোনোদিকে না তাকিয়ে মসজিদে গিয়েছিলাম।'

চার.

অবশেষে ভাগ হয়ে যায় দেশ, ভাগ হয়ে যায় মানুষ ধর্মের ভিত্তিতে। দেশভাগ ও পাকিস্তানের জন্য যে উত্তাল আন্দোলন, অধিকতর রক্তপাত রোধের তাগিদ থেকে যে প্রস্তাবনাতে নেহরুরও সম্মতি মেলে, ভারতের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল ও শক্তির এই ঐকমত্য আয়োজন একটি অমোঘ ভবিষ্যৎকে হিসেবে নিতে একেবারেই ব্যর্থ হলো। এই সমস্যা হলো উদ্বাস্তু মানুষের ঢল। '৪৭-এর আগস্ট থেকেই শুরু হলো এই অভাবিত প্রবাহ—মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে আপন বাড়িঘর, ভিটেমাটি, পড়শি-পরিবেশ সব ছেড়ে পাড়ি জমালো আরেক অজানা ভূমির উদ্দেশে, যেখানে ধর্মভাইদের কাছে মিলবে জীবনের নিরাপত্তা। *কালো বরফ* উপন্যাসে দেশত্যাগের বেদনা মূঢ়তা ও যন্ত্রণা যেভাবে ফুটে উঠেছে, কিশোর মনি ভাইজানের জীবন-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তা যেমন ভালোবাসার ও বেদনার দলিল

হয়ে রয়েছে সেটা উপন্যাসের ভাষা ভিন্ন আর কোনো প্রবন্ধরূপেই তুলে ধরা সম্ভব নয়। রুশ লেখক য়ুরি বনদারেভ-এর সঙ্গে এক সেমিনারে অংশগ্রহণের সুযোগ আমার হয়েছিল। দস্তয়েভস্কি সম্পর্কে বনদারেভ-এর একটি উক্তি আমার স্মৃতিতে গেঁথে আছে। দস্তয়েভস্কি-মূল্যায়নে কমিউনিস্টরা বিভিন্ন সময়ে নানা বিমূঢ়তার পরিচয় দিয়েছিল। তাকে প্রগতি বা প্রতিক্রিয়া কোনো দলেই যুৎসই মতো ফেলা যাচ্ছিল না। এইসব বিবেচনা দূরে ঠেলে বনদারেভ বলেছিলেন, দস্তয়েভস্কি যতো তীব্রভাবে মানুষের ব্যথা-বেদনা উপলব্ধি করেছিলেন তেমন আর কে পেরেছে! মাহমুদুল হক সম্পর্কেও সে-কথাই বলতে হয়, আমাদের নিকট ইতিহাসের উত্তালতায় নিষ্পিষ্ট মানবভাগ্যের দুঃখবেদনা তাঁর মতো গভীরভাবে আর কে অনুভব করতে পেরেছে!

দেশভাগ ও উন্মূল শহীদ কাদরী

শহীদ কাদরী ও মাহমুদুল হক পরস্পরের অনেক পুরনো বন্ধু, তাঁদের প্রীতিময় সম্পর্কের উপচে-পড়া ভালোবাসায় আমরাও নানাভাবে স্নাত হয়েছি। শহীদ ভাই যখন থাকতেন পুরানা পল্টনে, তাঁর শ্বশুরালয়ে, প্রায় কর্মহীনতায় বুঁদ হয়ে আলস্যে তলিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ী, দিনভর আড্ডায়-গল্পে মেতে উঠতে পারলে আর কিছু চাইনে, মাহমুদুল হকও তখন বায়তুল মোকাররমের তাসমেন জুয়েলার্সের কাজ থেকে সুযোগ মতো সটকে পড়তে পারলে বাঁচেন, গল্পে-কথকতায় তিনি মজে থাকতে চাইছেন, সেই সোনালি সময়ে পল্টনে, পাকিস্তান আমলে যে ভবন ছিল আওয়ামী লীগের দপ্তর, যেখানে বসে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সত্তর সালে রেডিওতে শুনেছিলেন নির্বাচনের ফলাফল, সাবেকী সেই বাড়িতে আমার দপ্তর, কাছেই উঠে এসেছে সংবাদের বংশাল অফিস এবং সেখানে বসেন আবুল হাসনাত, সাহিত্য সাময়িকীর দায়িত্ব নিয়ে প্রায় এক সাহিত্যান্দোলন গড়ে তুলছেন, মতিঝিলের মোড়ে দৈনিক বাংলার কক্ষ ছেড়ে মাঝে-মধ্যে এসে যোগ দেন শামসুর রাহমান; এবং আমরা আড্ডার রসস্রোতে একেবারেই যেন ভেসে যাই। অনেক বিষয়ে কথা হয়, সাহিত্য জুড়ে থাকে তার বড় অংশ, আর অবশ্যই দেশের রাজনীতি, সেখানে দক্ষিণপন্থী সহিংস ষড়যন্ত্রের খবর যুগিয়ে থেকে থেকে সবাইকে সন্ত্রস্ত করে তোলেন শহীদ কাদরী, তিনি যেন বাস করছেন শত্রু পরিবেষ্টিত পুরীতে। এখন, অনেক দূরে সরে এসে যখন ফিরে তাকাই যৌবনের সেই দিনগুলোর দিকে, খুব বিস্মিত হই এটা ভেবে যে, কত বিষয়ে কথা বলেছি আমরা তখন অথচ দেশভাগ নিয়ে কখনো কোনো আলোচনা হয়নি। আড্ডার দুই মধ্যমণি শহীদ কাদরী এবং মাহমুদুল হক, উভয়ে বাস্তুচ্যুত মানুষ, কিন্তু উদ্বাস্তু জীবনের বেদনা তাঁদের মধ্যে আমরা শনাক্ত করতে পারতাম না। তাঁরা যে আমাদের একজন হয়েও আমাদের থেকে আলাদা সেটা প্রথম বুঝি যখন মাহমুদুল হক, বটু ভাই, লিখলেন *'কালো বরফ'* উপন্যাস। ততদিনে আমাদের আড্ডা ও সংহতি ভেঙে গেছে, শহীদ ভাই চলে গেছেন বিলেতে, বটু ভাই অন্য জীবনে, আমরা স্রোতের কুটোর মতো ভাস্‌তে ভাসতে বুঝতে শিখেছি উন্মূল জীবনের বেদনা।

দেশভাগের ফলে মহানগর কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় এসে থিতু হতে চেয়েছেন শহীদ কাদরী, বারাসাতের শান্ত মফস্বলী জীবন থেকে চ্যুত হয়ে একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন মাহমুদুল হক। পাকিস্তান রাষ্ট্র সেই সময় তার দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং হিন্দু-মুসলিম পৃথকীকরণের প্রচেষ্টা দ্বারা সমাজ-দেহে বিষ সঞ্চার করে চলেছিল, পূর্ববঙ্গে বাঙালিত্বের চেতনাবহ অসাম্প্রদায়িক উদার চিন্তার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করে আনছিল, জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকদের হতে হচ্ছিল নানা পীড়নের শিকার, বামপন্থী প্রগতিচিন্তা ছিল সর্বভাবে পরিত্যাজ্য, মার্কসবাদী রাজনীতি নিষিদ্ধ এবং কমিউনিস্টদের স্বাভাবিক জায়গা ছিল কারাগার। এহেন পরিস্থিতিতে দেশভাগ নিয়ে সমাজে আলোচনা বিশেষ হতো না, পর্যালোচনা তো দূরের কথা, কেননা এই আলোচনা জন্ম দিতে পারে অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্নের, পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য যা হুমকিস্বরূপ। ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে বিতাড়িত মানুষেরা পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই নিয়ে নানাভাবে নিজ অভিজ্ঞতার সাহিত্যিক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। সাধারণ মানুষেরাও 'ফেলে আসা গ্রাম' বা এমনি অজস্র রচনার মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রাণের আকুতি প্রকাশ করেছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে তুলনামূলকভাবে কম হলেও যেসব বাঙালি মুসলমান এসেছেন পূর্ববঙ্গে, তাঁরা পরিস্থিতি অনুধাবন করে নিশ্চুপ থাকাটাই শ্রেয় মনে করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত শিক্ষিত মুসলিম সমাজের সদস্যদের রক্ষণশীল পাকিস্তানী শাসকেরা সুনজরে দেখেনি। তাদের অনেকের ডোমিসাইল্ড হওয়ার পথে পুলিশী তদন্তের নানা বাধা আরোপ হয়েছে, মনসুর হাবিবুল্লাহর মতো প্রগতিশীলদের দেশ থেকে বিতাড়ন করে ছেড়েছে। ফলে রাজনীতি বাদ দিলেও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এমন এক সমাজে বাঙালি উদ্বাস্তুরা আশ্রয় পেয়েছিলেন যেখানে চিন্তার স্বাধীনতা ছিল খণ্ডিত, গণ্ডিবদ্ধ, ক্ষেত্রবিশেষে বিপজ্জনক হিসেবে পরিগণিত। আর তাই সাহিত্য-অভিলাষী তরুণেরা প্রাণের আকুতি প্রকাশের স্বাভাবিক পথ তাঁদের সামনে দেখতে পাননি। প্রতীক, রূপকল্প, বির্মূত ভাবনার মধ্য দিয়ে ভাবপ্রকাশের নিজস্ব একটা উপায় ও পথ তাঁদের খুঁজে ফিরতে হয়েছে, সচেতন বা অচেতন যেভাবেই হোক না কেন। এ-কারণেই মাহমুদুল হক *'কালো বরফ'* উপন্যাস লিখলেন প্রায় তিরিশ বছরের অপেক্ষা শেষে, তাঁর টেস্টামেন্ট অব লাইফ যেন এর আগে লেখা সম্ভব ছিল না, বাস্তবতাই সেই সুযোগ হরণ করেছিল। আর এই বাস্তবতার অংশ হিসেবে দেশভাগ আমাদের সারস্বতম জবাব আমরা খুঁজতে চাইবো তাঁর এ-যাবৎ প্রকাশিত তিন কৃশকায় কাব্যগ্রন্থ অবলম্বনে।

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত শহীদ কাদরীর *'উত্তরাধিকার'* কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা বলা যেতে পারে তাঁর জীবনের টেস্টামেন্ট। এর পরতে পরতে মিশে আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন বাল্য এবং আকস্মিক বিদ্যুৎ রেখার মতো উদ্ভাসিত হয় দেশভাগের অভিজ্ঞতা ও উন্মূল জীবনের হাহাকার, শেকড়ছিন্ন হয়ে যে-জীবনের সঙ্গে তিনি আর কিছুতেই যেন বোঝাপড়া তৈরি করতে পারলেন না। 'জন্মেই কুঁকড়ে গেছি মাতৃজরায়ন থেকে নেমে', এমন অসাধারণ পঙ্ক্তি দিয়ে কবিতার শুরু এবং এর সমাপ্তিতে যে ক্রুদ্ধ করুণ তরুণের ছবি, সমাজের প্রতি অবজ্ঞা ও অস্বীকৃতির বাহক সেই আউটসাইডার যুবার ইমেজ এমন গভীরভাবে

পাঠকচিত্তে দাগ কেটেছিল যে এর অন্য মাত্রাগুলো বিশেষ চোখে পড়েনি। মহাযুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার মধ্যে কাদরী যে বৈশ্বিক সঙ্কট মূর্ত হতে দেখেছেন তার সবিস্তার কাব্যিক উপস্থাপনা নজর কেড়েছে বিদগ্ধ পাঠকদের, কিন্তু দেশভাগ, দেশভাগের যে উত্তরাধিকার বহন করেছেন কাদরী, তার প্রতিফলন মেলে দশ স্তবকের এই দীর্ঘ কবিতার মাত্র একটি স্তবকে যেখানে দাঙ্গা-হত্যা-রক্তপাত প্রবল ছায়াপাত ফেলে, যে হানাহানি ছড়িয়ে পড়েছিল প্রতিটি জনপদে, প্রতিটি মানুষের অন্তরে যে বিভাজন ও দ্বন্দ্ব রেখে গেছে প্রবল ছাপ, কাদরী কি করে ভোলেন সেই কৈশোরক অভিজ্ঞতা, জীবনের প্রথম পাঠ। কাদরী লিখেছেন:

> "রক্তপাতে, আর্তনাদে, হঠাৎ হত্যায় চঞ্চল কৈশোর-কাল
> শেখালে মারণমন্ত্র—আমার প্রথম পাঠ কি করে যে ভুলি,
> গোলাপবাগান জুড়ে রক্তে-মাংসে পচেছিল একটি রাঙা বৌ
> ক'খানা হুকের ঘুঁটি মানুষের কথামতো মেতেছিল বলে।"

এই অসামান্য পঙ্‌ক্তিনিচয়ের পরতে পরতে সঞ্চিত হয়েছে অনেক পুঞ্জিভূত বেদনা ও ক্ষোভ। কোনো উচ্চকিত উক্তি নেই, আছে নিবিড় উপলব্ধির সংহত পরিচয়, মানবের চিত্তে যা স্থায়ী ছাপ রেখে যায়, দাঙ্গাপীড়িত সমকালের স্বরূপ প্রকাশ পায় টুকরো ছবির চকিত দেখায়, সেই সঙ্গে আছে পরিস্থিতির বেদনাবহ পরিচয়, তৎকালীন রাজনীতির সংবেদনহীন নিষ্ঠুর চাল তিনি একটি মাত্র পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ করেন, যে নেতৃত্ব সর্বাংশে ব্যর্থ হয়েছিল তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে, মূর্খের মতো, পাশার চালের মতো হাজারো মানুষের জীবন নিয়ে দান খেলেছিল। এরপর কবি চলে যান সমকালীন বাস্তবে, যখন সব দুঃখ-কষ্ট-বেদনা এবং নিষ্ঠুর হানাহানি ও রক্তপাত বিস্মৃত হয়ে এর উদগাতারা ফের মেতে ওঠে উৎসবে, কিছু বলে দিতে হয় না, উৎসব আয়োজনের অন্তঃসারশূন্যতা আপনাতেই যেন ধরা দেয়। অতীতকে অস্বীকার করে জীবনের উৎসবে মেতে-ওঠার এমত আয়োজনে কাদরীর যোগদানের কোনো অবকাশ নেই। ভালোবাসা স্তব্ধ করা আততায়ী যে-মুখগুলো দুদিন পর আবার ভালোবাসার বুলি আউরানোর চেষ্টা করছে তাদের প্রত্যাখ্যান করে চলতে চান কাদরী। এর মধ্যে গোটা পাকিস্তানী জীবনকাঠামো ও সমাজকে অস্বীকৃতির তাগিদ রয়েছে, তবে সেটা প্রত্যাখ্যানের তীব্রতার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে অন্যতর মাত্রা, এর পরম্পরা অনেকটা আড়ালে চলে গেছে। এমনি জীবনের মুখোমুখি হয়ে, পরম্পরা ও উত্তরাধিকার থেকেই কাদরী বুঝেছেন:

> "—এইমতো জীবনের সাথে চলে কানামাছি খেলা
> এবং আমাকে নিষ্কপর্দক, নিষ্ক্রিয়, নঞর্থক
> ক'রে রাখে; পৃথিবীতে নিঃশব্দে ঘনায় কালবেলা।"

এই কবিতা শেষাবধি শহীদ কাদরীকে চিহ্নিত করেছে নেতির কবি হিসেবে, রক্তাক্ত জবার মতো চোখ নিয়ে তিনি পড়ে থাকেন নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটে, কিন্তু তরুণের এই নৈঃসঙ্গতা ও রক্তচক্ষু ধারণের পেছনে উপমহাদেশের জীবনের করুণ অভিজ্ঞতা ভুলে গেলে চলবে

কেন! সেই পরম্পরা-বিচ্ছিন্ন বিস্মৃতি অস্বীকার করেই কাদরী রক্তচক্ষু হয়েছিলেন, তাঁর চোখের সেই রক্তিমাভা বুঝে-ওঠা আজও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তদুপরি কাদরীর রূপকল্প, যা কবিতার শেষে এক ক্রুদ্ধ তরুণের প্রতিচ্ছবি মেলে ধরে, তা যেন ষাটের দশকের সংবেদী তরুণ প্রজন্মের ছবি হয়ে উঠেছিল এবং সৃষ্টি করেছিল বিপুল আলোড়ন। পঞ্চাশের দশকের ইংলন্ডের 'অ্যাংরি ইয়াং মেন'-দের মতো ষাটের দশকে পূর্ববঙ্গে আরেক সাহিত্যধারা জন্ম নিল। ঠিক তেমন সংহত আন্দোলন না হলেও অভিন্ন-ভাবপ্রকাশক বটে এবং এর অন্যতম এক রূপকার হলেন শহীদ কাদরী। ইংলন্ডের রাগী তরুণদের সাহিত্যচর্চার মূল অবলম্বন হয়েছিল নাটক, জন অসবর্ন, হ্যারল্ড পিন্টারসহ আরো অনেক নবীন শামিল হয়েছিলেন সেখানে; আর পূর্ববঙ্গে এই রক্তচুক্ষ যুবাদের অধিকাংশ ছিলেন কবি এবং তাঁরা বিপুলভাবে প্রাণিত হয়েছিলেন কাদরীর উপলব্ধি ও উচ্চারণ দ্বারা যখন কাদরী লেখেন:

> "আর আমি শুধু আঁধার নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটে রক্তাক্ত জবার মতো
> বিপদ-সঙ্কেত জ্বেলে একজোড়া মূল্যহীন চোখে
> পড়ে আছি মাঝরাতে কম্পমান কম্পাসের মতো অনিদ্রায়।"

ষাটের যুবকেরা রক্তনেত্র হয়েছিলেন সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও বৈশ্বিক বিভিন্ন ঘটনার অভিঘাতে, নবীন কবিরা নানা পটভূমি থেকে দুঃখভরা জীবনাভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া চোখে স্বপ্ন ও স্বপ্ন-ভঙ্গতা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সাহিত্যের ভূমিতে। এই যুবকদের পরিচয় অসাধারণ রূপ পেয়েছে গ্রন্থভুক্ত 'অগ্রজের উত্তর' কবিতায় যেখানে সর্বদাই রক্তনেত্র কনিষ্ঠের কথা বলছেন অগ্রজ, জানা নেই কোথায় যায়, কি করে, কেমন করে কাটে দিনরাত, "শোকের পতাকা/মনে হয় ইচ্ছে করে উড়িয়েছে একরাশ চুলের বদলে।"

শহীদ কাদরী অভিজ্ঞতার যে ভুবনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তার পেছনে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু-জীবনের নির্দয় অভিঘাত তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু পরোক্ষে সেই পরিচয় তো আমরা আর কিছু কবিতার মতো 'অগ্রজের উত্তর' কবিতাতেও পাই যখন দেখি ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বিচ্ছিন্নতা, আকস্মিক সমূহপতন, যে-পরিচয় মেলে ধরতে কাদরী উল্লেখ করেন দার্জিলিঙ-স্মৃতি, এখানে দার্জিলিঙ যেন কবির সাংগ্রিলা, সীমানার অপর পারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরের কল্পপুরী, যেখান থেকে তাঁর বিতাড়ন ঘটেছে, অথচ কবিতায় এসব অভিজ্ঞতা তো আগে কখনোই তেমনভাবে প্রকাশ্য হয়নি। তিনি লিখেছেন:

> "আমাকে অর্ধেক স্বপ্ন থেকে
> দুঃস্বপ্নে জাগিয়ে দিয়ে, তারপর যেন মর্মাহতের মতন
> এমন চিৎকার করে 'ভাই, ভাই, ভাই' বলে ডাকে,
> মনে পড়ে সেবার দার্জিলিঙের সে কি পিছল রাস্তার কথা
> একটা অচেনা লোক ওরকম ডেকে-ডেকে-ডেকে খসে পড়ে
> গিয়েছিল হাজার-হাজার ফিট নিচে।"

কবিতায় আপন অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ইঙ্গিত নানাভাবে মেলে ধরেছেন শহীদ কাদরী, সামান্য উল্লেখ সত্ত্বেও বোঝা যায়, সাতচল্লিশের স্বাধীনতা ও দাঙ্গা তিনি কখনোই যেন ভুলতে পারেননি, একান্ত অন্তঃসলিলাভাবে বহন করেছেন উদ্বাস্তু জীবনের বেদনা। 'একটা মরা শালিক' কবিতায় বলেছেন সেই বৃদ্ধের কথা যিনি 'ইতিহাসের এককেটি ভয়ঙ্কর বাঁকে' দাঁড়িয়েছেন এবং "দেখেছেন—স্বাধীনতা, স্বজনহনন, ট্রেঞ্চ, কামানের নল জ্যোৎস্নারাতে।" সামান্য দেখা, সামান্য প্রকাশ, স্বাধীনতা ও স্বজনহনন উচ্চারিত হয় এক নিশ্বাসে এবং এর মধ্য দিয়েই দেশভাগের অভিঘাত আমরা দেখি কাদরীর রচনায়। শেষ কাব্যগ্রন্থ *'কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই'*-ভুক্ত 'যাই, যাই', কবিতায় বুঝি নিজেকে মেলে ধরলেন কিছুটা পরিপূর্ণভাবে, লিখলেন নস্টালজিয়া-আক্রান্ত এক কবিতা, তবে বরাবরের মতো, কাদরীর আর সব কবিতার মতো, ভাবালুতার কোনো অবকাশ সেখানে নেই, আছে বেদনা-ভরা জীবনের নিবিড় অনুভব। কবিতার শুরুতে লিখেছেন:

"আজ আবার আমার ইচ্ছে হলো যাই
বর্ধমানে, সেই একটুখানি ইস্টিশনে
হাই তুলতে তুলতে যাই বটগ্রামে শিউলিতলায়।"

এই আকুতির মধ্যে আগ্রহ ও নিস্পৃহতা দুইয়ের মিশেল আমরা দেখি। দেশান্তরী মানুষের মধ্যে এমত অনুভূতি আমরা শনাক্ত করতে পারি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে কবি সেই অনাসক্তি অতিক্রম করে জীবনকে সমগ্রতায় মিলিয়ে নিতে অগ্রসর হন, এতকালের আড়াল ঘুচিয়ে ফেলার অসম্ভবের সাধনায় ব্রতী হতে চান, লেখেন:

"আজ তাই
যা-কিছু এড়িয়ে গেছি, আড়ালে রেখেছি
আমার নিজের মধ্যে, কবিতার ক্লান্ত শব্দে, বারবার
ফিরিয়ে আনতে চাই।"

কিন্তু এই ফিরিয়ে আনা বুঝি কখনোই সম্ভব নয়, কিংবা ফিরে পাওয়ার যে নিবিড় অনুভূতি, তার বুঝি কোনো ভাষারূপ দেয়া সম্ভব নয়, তাই কাদরীর মনে হয়:

যাই
একটি নতুন নম্র বীজ হয়ে, বকুল অথবা
চামেলীর ছদ্মবেশে এক্কেবারে শব্দহীন চলে যাই।"

শহীদ কাদরী কালের কথক হয়েছেন তাঁর অভিজ্ঞতার বহুমাত্রিকতা এবং উপলব্ধির বিস্তার দ্বারা, আশ্চর্য পরিমিত এক কাব্যভাষায় তিনি এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এই জীবনাভিজ্ঞতায় দেশভাগ ও উন্মূল জীবন যে ছাপ রেখে গেছে সেটা বহুলাংশে আলোচনার বাইরে থেকে গেছে, কিন্তু এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে না চাইলে আমরা শহীদ কাদরী কিংবা তাঁর প্রিয়বান্ধব মাহমুদুল হক, উভয়ের কাউকেই ঠিক বুঝে উঠতে পারবো

না। উভয়ের মধ্যে গভীরভাবে কাজ করেছে শিল্প ও জীবনের প্রতি আসক্তি ও নিরাসক্তি, লেখালেখি বিষয়ে উভয়ে একদিকে নিবিড়ভাবে সমর্পিত ও অপরদিকে একান্ত নিস্পৃহ। প্রচলিত-ভাবনায় আমরা তাদের পরিমাপ নিতে পারগ নই, তাঁদের জীবনচেতনায় উদ্বাস্তু-মানসের হদিশ করতে না পারলে তাঁদের শিল্পবেদনার গভীরতা আমরা স্পর্শ করতে পারবো না। তবে সেই উপলব্ধি অর্জনের নানা ইঙ্গিত শহীদ কাদরী রেখে গেছেন তাঁর কবিতায়।

স্বাধীনতার সাংস্কৃতিক অভিযাত্রা

ভারতীয় দর্শনে জীবনকে দেখা হয় একটি যাত্রা হিসেবে, চরৈবতি বা অবিরাম চলার মধ্যে মেলে জীবনের সার্থকতা। জীবন যখন কোনো যাত্রার রূপ গ্রহণ করে, তখন বোঝা যায় এর নির্দিষ্ট আরম্ভবিন্দু যদিও-বা থাকে, নেই কোনো সমাপনরেখা। এই যাত্রা বয়ে চলে এক জীবন থেকে অন্যতর জীবনে, কিংবা বলা চলে মহাজীবনের পরিক্রমণে এক জীবনও হয়ে ওঠে বৃহত্তর জীবনের অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের গানে বা কবিতায় জীবনের এই নিরন্তর বহমানতার পরিচয় আমরা পাই, পথচলাতেই জীবনের আনন্দের কথা তিনি বারবার উচ্চারণ করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাধক শৈলজারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিগ্রন্থের নামকরণ করেন 'যাত্রাপথের আনন্দগান'। তবে ব্যক্তিমানবের জীবনকে এক অভিযাত্রা হিসেবে দেখবার যে দার্শনিক ভিত্তি তা' সমাজের ক্ষেত্রে প্রসারিত করার অবকাশ কম, কেননা সমাজের জটিল বিন্যাসে বহমানতার পরিচয় সবসময়ে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। ব্যক্তিসাধনায় যে-অর্জন সম্ভাব্য হতে পারে সমাজের বহুধাবিভক্ত জটিল বিন্যাসে সেটা তো সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার সমাজ প্রগতির পথরেখা এমনই জটিল যে দেশভাগ-উত্তর উপমহাদেশে বাংলার পূর্বপ্রান্ত দ্বিজাতি ধর্মতত্ত্বের কঠিন নিগড়ে বাধা পড়লেও সেখানে সমাজের অগ্রসরমানতা প্রায় দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠতে শুরু করলো। বায়ান্নোর ভাষাভিত্তিক চৈতন্যবোধের উন্মেষ ধাপে ধাপে গিয়ে পৌঁছলো জাতিসত্তার নিজস্ব রাষ্ট্রজন্মে। সামাজিক ইতিহাসের এমনি অগ্রগমন খুব কম দেশে কম সমাজেই দৃশ্যগোচর হয়। আর এ-কারণেই পূর্ববাংলার এক অগ্রণী সঙ্গীতশিল্পী, মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিভূ সন্‌জীদা খাতুন তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করতে পারেন 'স্বাধীনতার অভিযাত্রা', এ-ক্ষেত্রে যাত্রাপথের পথিক যে তিনি একা নন, সমাজকে নিয়েই চলেছে এমনি পদাতিক অভিযান, তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। অথচ লেখক এখানে বলেছেন মূলত ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার কথা, আপন মানসিকতার উন্মোচন কীভাবে সমাজের মানসিকতার পরিবর্তনের সঙ্গে দেয়ানেয়ার মিথস্ক্রিয়ায় মেতে উঠলো, ব্যক্তিমানবের মুক্তির পথ কেমন করে সমাজের মুক্তির প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে গেল, তার অনুপম দলিল হয়ে উঠেছে এই বই।

দেশভাগ থেকে মুক্তিযুদ্ধ—এই কালপর্বে ব্যক্তির বিকশিত হয়ে ওঠা, সমাজের সঙ্গে বোঝাপড়ার সম্পর্ক তৈরি এবং আরো অনেকের সঙ্গে মিলে সমাজ ও সংস্কৃতির মুক্তির অর্গলগুলো খুলে দেয়া, এই প্রসঙ্গ মুখ্য হয়ে উঠেছে তাঁর গ্রন্থে এবং সঙ্গীত-সংস্কৃতিচর্চায় নিবিষ্ট থেকে এই কাজই তো করে চলেছেন সন্‌জীদা খাতুন। আর তাই তিনি ইতিহাসের ভাষ্য রচনা করতে পারেন ব্যক্তিকথার সুবাদে অথবা আপন ব্যক্তিসত্তার পরিচয় রেখে যেতে পারেন ইতিহাসের গতিধারার রূপনির্দেশে। এই যে ব্যক্তি ও ইতিহাস জড়াজড়ি হয়ে যাওয়া, এটা পাকিস্তান আমলে এমন অপরূপভাবে ঘটেছে যে ব্যক্তিজীবনের অভিযাত্রা হয়ে উঠতে পেরেছে স্বাধীনতার অভিযাত্রা এবং সেখানটাতেই নিহিত বর্তমান গ্রন্থের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য। 'স্বাধীনতার অভিযাত্রা' গ্রন্থে সন্‌জীদা খাতুনের বিভিন্ন সময়ে রচিত সাংস্কৃতিক প্রবন্ধগুলো সংকলিত হয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন গ্রন্থে জায়গা পেয়েছে যেসব প্রবন্ধ তার ঠাঁই এখানে হয়নি, বরং বলা যায় অগ্রন্থিত প্রবন্ধের মধ্য থেকে গ্রন্থপরিকল্পনায় সাযুজ্যপূর্ণ লেখাগুলো এখানে বিন্যস্ত হয়েছে। ভাষা আন্দোলন, নববর্ষ, ছায়ানট এবং মুক্তিযুদ্ধ এই চার পর্বে ধারাবাহিকভাবে সাজানো প্রবন্ধ মিলে একটি চমৎকার মালিকা গাঁথা হয়েছে, যার রত্নহার হিসেবে শোভা পাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ। দুই মলাটের মধ্যেকার লেখাগুলো পাঠান্তে এটা বুঝতে কারো অসুবিধা হবে না, দীর্ঘ এক পথ পাড়ি দিয়েছেন লেখক ও তাঁর স্বদেশ এবং এই অভিযাত্রার আনন্দ-বেদনার পরিচয় পাওয়া যায় গ্রন্থের সমগ্ররূপে, সকল প্রবন্ধ মিলে হয়ে ওঠে একটি একক ও অবিভাজ্য ভাষ্য।

শুরুর আটটি নিবন্ধের উপজীব্য ভাষা-আন্দোলন, তবে যতটা সাংস্কৃতিক সেই আন্দোলনের ছবি, ততটাই সদ্য-কৈশোর পেরুনো এক নবীনার মানবী হয়ে ওঠারও কাহিনী। দেশ যখন ভাগ হলো, জন্ম নিল পাকিস্তান, চৌদ্দ বছরের কিশোরীর কাছে ইতিহাসের বড় ছবিটা তখন মোটেই স্পষ্ট নয়, বরং, যেমন তিনি লিখেছেন, "ইংরেজ শাসনের হাত থেকে মুক্তির উল্লাস ভোগ করেছি পাকিস্তান হবার দরুণ।" গাইছেন জোশে উদ্দীপ্ত গান, 'কলিজার খুনে ওয়াতানের ধুলি করিয়া লাল', স্কুল থেকে কর্তৃপক্ষের তদারকিতে দল বেঁধে গিয়েছিলেন রেসকোর্স ময়দানে, জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতা শুনবেন বলে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে নাম লেখালেন মুকুল ফৌজে, যেখানে আরবি-ফারসির বিশুদ্ধ উচ্চারণে আগ্রহী অনেকের দেখা মেলে, তর্ক চলে কলি Zা, না কলি Jা, আZাদ না আ্যাদ। দ্বন্দ্ব-জটিলতাও উঁকি দেয় পাকিস্তানী জোশে প্লাবিত পরিসরে। এই মুকুল ফৌজেই ব্রতচারী শেখান কামরুল হাসান, প্যারেড করার জোশ থেকে প্যারেডের স্বদেশী সংস্করণকে দেয়া হয় ছাড় এবং মেয়েদের শেখানো হয় ব্রতচারী গান, 'বাংলা-ভূমির প্রেমে আমার প্রাণ হৈল পাগল।'

গোটা পরিস্থিতি আমূল পাল্টে গেল বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারিতে। ভাষার দাবিতে আয়োজিত ছাত্র মিছিলে গুলি ও তাঁর প্রতিক্রিয়ার ব্যক্তিগত যেসব বিবরণী দিয়েছেন সন্‌জীদা খাতুন তা' সমাজেতিহাসের অনেক বড় সত্য মেলে ধরে। ছোট ছোট আপাততুচ্ছ বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে এই বৃহৎ সত্যকে তিনি তুলে ধরেছেন। একুশের বিকেলে অভয় দাস

লেনে আয়োজিত মেয়েদের প্রতিবাদ সভায় যখন যাবেন সন্‌জীদা, মা তাকে একা ছেড়ে দিলেন না। পথে মিলিটারি দেখে স্বভাবভীরু মায়ের প্রতিক্রিয়া, শেষাবধি ভয়কে জয় করা এবং সভাস্থলে পৌঁছানোর চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। দৌলতুন্নেসা খাতুন, নূরজাহান মুরশিদ, সুফিয়া কামাল এঁদের সিদ্ধান্তে বেগম কাজী মোতাহার হোসেনকে বসানো হলো সভাপতির চেয়ারে, জীবনে যিনি কখনো সামাজিক ভূমিকা পালন করেননি, তিনিও গৃহকোণ থেকে বের হয়ে প্রতিবাদী সভার পৌরহিত্যের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নাটকীয় তেজদীপ্ততার সঙ্গে নয়, বাস্তবোচিত কুণ্ঠা ও দ্বিধায় জর্জরিত হয়ে। এই মামুলি ঘটনা এক নতুন পর্বের আবাহন সূচনা করলো, যা কোনোদিন ভাবা যায়নি তাই সেদিন ঘটলো এবং সবই হলো ভাষা আন্দোলনের অমোঘ টানে। সন্‌জীদা খাতুন লিখেছেন, "আমার মায়ের চেয়ারে বসবার কাচুমাচু ভঙ্গিটি আজও আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। তিনি জানেন, ঐ চেয়ারে বসবার কোনো যোগ্যতা তাঁর নেই, সে মানুষ তিনি নন। আমার মায়ের ছবিতে পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল মা-বোনের সেদিনকার আন্তরিক ভয়ের ছায়া। চেয়ারের একটি ধারে বাঁকা হয়ে কোনোমতে বসেছিলেন তিনি।"

গৃহকোণের বধূ যে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সভাপতির আসনে, যত কুণ্ঠা ও ভয়ই তাঁর থাকুক সেই আসন গ্রহণে, ঘটনাটা বহন করছিল বিশাল তাৎপর্য, ভাষা আন্দোলন খুলে দিয়েছিল সমাজের অর্গল। পরের বছর তাই একুশে ফেব্রুয়ারিতে দেখা গেল ছাত্রীদের মিছিল নিয়ে আরমানিটোলা ময়দানে হাজির হয়েছেন সন্‌জীদা খাতুন। এই নবজাগরণকে বন্দিত করেই পরে জহির রায়হান লিখলেন অনুপম উপন্যাস, 'আরেক ফাল্গুন'।

পরের পর্বের নয়টি লেখা বাংলা নববর্ষ বিষয়ক। রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষ-আবাহন কীভাবে সূচিত হয়েছিল এবং ক্রমে পল্লবিত হয়ে গোটা জাতিকে মাতিয়ে তুললো, আর স্বাধীনতা—পরবর্তীকালে তা' কোন সব সংকটের মুখোমুখি হলো, সেসবের ধারাভাষ্য যেন মেলে এই নিবন্ধসমূহে। আর এমন কাজটি করার জন্য সন্‌জীদা খাতুনের চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কে আছেন! নিষ্ঠাবান জীবনসাধনায় এই যে কর্তব্য তিনি সম্পাদন করে চলেছেন, সঙ্গীতকে এক থেকে বহুতে সঞ্চারিত করা, বাঙালি সংস্কৃতির আদর্শ সমাজে দৃঢ়সংবদ্ধ করা এবং জাতির কল্যাণমুখী বিকাশে সংস্কৃতিকে যোগ্য ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করা, এই সাধনার বাস্তব চিত্রটি মেলে তাঁর রচনায়।

১৯৬৭ সালে ছায়ানট যখন বাংলা নববর্ষ উদযাপনকে গৃহকোণ থেকে সামাজিক পরিসরে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়েছিল সেই তাগিদ যে অচিরে এমন সর্বপ্লাবী আকার ধারণ করবে সেটা কেউ অনুমান করতে পারেনি। এক্ষেত্রেও আমরা এক অভিযাত্রা প্রত্যক্ষ করি এবং ইতিহাস কীভাবে ব্যক্তিমানুষের ভূমিকা থেকে সামাজিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে তার বলিষ্ঠ রূপায়ণ এখানে দেখতে পাই। স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও নানা চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে চলেছে বাঙালির ও ছায়ানটের বৈশাখী আয়োজন, তার কিছু কিছু প্রতিফলন রয়েছে বিভিন্ন নিবন্ধে। বাংলা নববর্ষ কিংবা ছায়ানট, এই দুই ক্ষেত্রে, কিংবা বলা যায় দুয়ে মিলেমিশে একক ক্ষেত্রটিতে সন্‌জীদা খাতুনের যে কেন্দ্রীয়

ভূমিকা সেটা লেখা পড়ে অবশ্য বিশেষ বুঝবার উপায় নেই। বাংলাদেশের আত্মপ্রচারে মাতোয়ারা সমাজে এই যে বিপরীত ঘরানার উপস্থিতি সেটা সমাজের প্রাণশক্তির এক বলিষ্ঠ প্রকাশ। আপন হতে বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি লিখেছেন এইসব প্রবন্ধ, ফলে লোকসমাজ মূর্ত হয়ে উঠেছে সহজেই এবং বড় পরিসরে আমরা দেখতে পাই ব্যক্তিকে। কিন্তু সেই ব্যক্তিমানবকে খুঁজে পাওয়া যাবে না তাঁর আত্মকথনে, নিজেকে সংবৃত রেখে তিনি বলতে চেয়েছেন নিজেদের কথা। সবখানেই তিনি আছেন কিন্তু খুঁজতে গেলে কোথাও পাওয়া যাবে না, অনুভবে কেবল টের পাওয়া যায় তাঁর উপস্থিতি। এই যে ব্যক্তিসত্তাকে আড়ালে রাখবার চেষ্টা, সেটা তিনি এতো সহজাতভাবে এমন মনোমুগ্ধকর গদ্যভঙ্গিতে করতে পারেন যে পাঠক সচেতন না হলে পুরো ছবিটা কখনো দেখতে পাবেন না। অথচ এখানেই তো ব্যক্তিত্বের মহিমা সবচেয়ে প্রগাঢ়ভাবে প্রকাশ পায়, চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য তাতে নেই, আছে মনোমুগ্ধকর স্নিগ্ধতা। বইয়ের পাতায় পাতায় এই অনুপম মনোহারী জীবনদৃষ্টিভঙ্গি ও তার সঙ্গে সাযুজ্যময় স্নিগ্ধ গদ্যধারা ফুটে উঠতে দেখি আমরা, উদাহরণ হিসেবে বেছে নিতে পারি ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুরুর দিনগুলোর কথা। সন্‌জীদা খাতুন লিখেছেন:

"উনিশশো সাতষট্টি অর্থাৎ বাংলা তেরশো চুহাত্তরের পয়লা বৈশাখের জন্যে নতুন করে ভাবতে হলো। বন্ধু নওয়াজেশ আহমেদ খবর দিলেন রমনা রেস্তোরাঁর। জায়গাটা ঘুরে ফিরে দেখে সেই হাতার ভিতরেই লেকের ধারের পাকুড় গাছের তলাটি মনে ধরল। তলাটা ঘিরে বাঁধানোও আছে।

ভোর ছটায় রাগের আলাপ শুরু হলো। সেতারে না সরোদে? ঠিক মনে পড়ে না। বাজিয়েছিলেন আবিদ হোসেন খান সাহেব। সমস্ত হৃদয় যেন কমলের মতো বিকশিত হয়ে উঠতে পারে, তার জন্য আলোর আকাঙ্ক্ষা জানানোটা এই দিনের বিশেষ কথা। 'আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও, আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও' গেয়েছিলাম আমরা।'

অন্তত উনিশ-কুড়িখানা গান। গানের শেষে লুচি-তরকারি খাওয়া। উৎসব। মেলার আনন্দ। বছরের প্রথম দিনটিতে বন্ধুসম্মিলনের উপযুক্ত সমাবেশ।"

নববর্ষ উদযাপনের সবিস্তার যেসব বিবরণ দিয়েছেন সন্‌জীদা খাতুন সেখানে মেলে নানাজনের কথা, সংস্কৃতি কীভাবে একক থেকে বহু হয়ে উঠতে পারে তার প্রতিফলন এসব লেখার ছত্রে ছত্রে। অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণলিপি তৈরি করতে কী বিপুল প্রয়াসই না নেয়া হতো, কিংবা গান নির্বাচনে। তিনি লিখেছেন:

"সেবার অনেকগুলো কার্ডে ওই অশ্বত্থ পাতার কঙ্কাল এঁটে নববর্ষের আমন্ত্রণলিপি তৈরি হলো। আর্ট কলেজের ছেলেরাই ডিজাইন করছে, আবার লেখাগুলো লিখছে। অনেক রাত পর্যন্ত দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে ঘুমাতে যেতাম। তিনের ই (৩/ই) আজিমপুর কলোনির সরকারি ফ্ল্যাটে চলতো এ সমস্ত কাণ্ডকারখানা। বছরের পর বছর কার্ডের, ছায়ানটের অনুষ্ঠানের যাবতীয় সাজসজ্জার দায়িত্ব নিয়েছে আর্ট কলেজের ছেলেরা।

কার্ড তৈরি করার ধুম তো অনুষ্ঠানের তারিখ কাছে এলে তখন শুরু হতো। তার বহু আগে থেকেই চলতো গানের মহড়া, তারও আগে গানের নির্বাচন। নতুন দিনে মনের আবরণ সরিয়ে বিকশিত হয়ে উঠবার আবেগটাই সেসব দিনে জাগতো বেশি। পাকিস্তান আমলের কথা। 'আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও/আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও' গান দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে ভালো লাগতো। সেই সকাল সাড়ে ছ'টাতে। কোনোবার আলো ফুটতো, কোনোবার মেঘের আড়াল থেকে ফুটি-ফুটি করতো। আর একখানি গান জাহিদুর রহিম একক কণ্ঠে গেয়েছে একাধিকবার—'নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে/শুভ্র সুন্দর প্রীতিউজ্জ্বল নির্মল জীবনে'। পরে আমরা সম্মেলক কণ্ঠেও এ গান গেয়েছি কতোবার। ১৯৬৭ থেকে ১৯৯৯—এই ৩৩ বছরে কয়েক বছর বাদ দিয়ে একই গান গাইবার সুযোগ তো ফিরে ফিরেই এসেছে। জাহিদের কণ্ঠের আর একখানি গান ছিল, 'হে চির নতুন, আজি এ দিনের প্রথম গানে/জীবন আমার উঠুক বিকাশিত তোমার গানে'। আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে নতুন নির্মল জীবনে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা।"

অন্যত্র তিনি লিখেছেন:

"প্রথম প্রথম রবীন্দ্রনাথের গান দিয়েই ছায়ানটের বটমূলের বর্ষবরণ হতো, কারণ, তাঁর গানেই প্রভাতের আর জীবনের নবযাত্রার গান অফুরান। নতুন শপথে দৃপ্ত হবার গান গেয়ে মানুষকে জাগিয়ে তুলবার এই প্রয়াস আমাদের আর সব কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করার শক্তি দিত। দিনে দিনে নজরুলের অতুলপ্রসাদের দ্বিজেন্দ্রলালের গানও পহেলা বৈশাখের নির্বাচিত গীতিগুচ্ছে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকলো। যোগ্য গান খুঁজে বার করাও কম কষ্টের ছিল না। শেখ লুতফর রহমান, অঞ্জলি রায়, সোহরাব হোসেনের মতো গুণীরা গান বেছে নিতেন। পরে ছায়ানটেরই এককালের ছাত্র খায়রুল আনাম শাকিল স্বরলিপি থেকে নজরুলের বেশ কিছু অপ্রচলিত গান তুলে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছে। ক্রমে ক্রমে কিছু গণসঙ্গীতও যুক্ত হয়েছে আমাদের গীতিসম্ভারে।"

এইসব বয়ানে ভেতরের ছবিটি আমরা দেখতে পাই, কিন্তু দেখি না সন্‌জীদা খাতুনকে, তবে বুঝতে পারি তার চিত্তের দার্ঢ্য, তাঁর দুঃখকষ্ট বরণ করে নেয়ার শক্তি কিংবা শপথে দৃপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ মানুষটির বাহ্যিক রূপটি না দেখতে পেলেও তাঁর চিত্তরূপের পরিচয় আমরা নানাভাবে পাই। এই চিত্তরূপের খোঁজ করতে পারার মধ্যেই মিলবে গ্রন্থপাঠের সার্থকতা।

বর্ষবরণ ছাড়াও ছায়ানট বিষয়ে রয়েছে একগুচ্ছ প্রবন্ধ। এখানেও তিনি বলেছিলেন সংগঠনের কথা, বহু মানুষের মিলিত সাধনার কথা। এমনকি নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিকের মতো ধারাবাহিক ইতিহাসে ব্যক্তিভূমিকার অবদান চিহ্নিত রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। তবে এসবের কোথাও নিজের প্রসঙ্গ নেই, নেই ছায়ানটের প্রধান-প্রধানা ব্যক্তিদের ভূমিকার গুণকীর্তন। এভাবে আমরা পেয়ে যাই ছায়ানটের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের একটি বড় পরিচয়, ভারতীয় কিংবা বাংলার জীবনদর্শনের গভীরে এর শেকড় খুঁজে পেতে পারি, নিজেকে

উজাড় করে দিয়ে যে সাধনা পরিচালিত হয় সেখানে তো নিজের ভূমিকার কোনো স্থান থাকতে পারে না। সংস্কৃতিসাধনার এই যে উত্তুঙ্গ মাত্রা স্পর্শ করেছেন সন্‌জীদা খাতুন তার প্রকাশ এভাবেই মেলে তাঁর প্রবন্ধে।

সংস্কৃতির এই ধারাবাহিকতায় দেশ পৌঁছে যায় মুক্তিযুদ্ধে, বাঙালি সত্তার যে উন্মেষের সাক্ষী ছিলেন বায়ান্নো সালের সদ্যতরুণী, তিনি একাত্তরে দল গড়েন রূপান্তরের গানের, জাতির রূপান্তরের গীতিময় প্রকাশ তো তাঁরই আজীবন সাধনা। সব মিলিয়ে 'স্বাধীনতার অভিযাত্রা' গ্রন্থ দু'ভাবে আমাদের কাছে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে, যে-কথা বলা হয়েছে সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তাৎপর্যময় যেভাবে বলা হয়েছে। ফলে একদিক গ্রন্থে রয়েছে স্বাধীনতার সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার ইতিহাস, অপরদিকে গ্রন্থ স্বয়ং হয়েছে ইতিহাসের উপাদান।

আগেই বলা হয়েছে, সন্‌জীদা খাতুনের ব্যক্তিত্বের পরিচয় গ্রন্থে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, প্রচ্ছন্ন রাখার মধ্য দিয়েই এর স্বরূপের ইঙ্গিত আমরা পাই। একবারই তিনি সামান্যে বলেছেন অনেক কথা, আপন ব্যক্তিস্বরূপ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "আজ তেষট্টি বছর (১৯৯৬) বয়স পর্যন্ত গেয়ে চলেছি। কিন্তু বুঝতে পারি, এ সম্ভব হতো না পদে পদে যদি বাধা না-পেতাম। পাকিস্তান আমলের সরকারি বাধার কথা বলছি। যে বাধার বিরুদ্ধে লড়বার মানসিকতা জন্ম নিয়েছিল বলেই ব্যক্তিগত সঙ্গীতচর্চা থেকে গোষ্ঠীগত সঙ্গীতচর্চার পথে চলা হলো।'

এমনি চলবার সাধক যিনি তাঁর পরিচয় পাঠক নিজ সাধনাতেই খুঁজে বের করুক, তবেই তো গ্রন্থ পাবে সার্থকতা। তিনি বলেছেন পথের কথা, পথিক পাড়ি দিয়েছে যে দীর্ঘ পথ, বলা না হলেও পথিককে পাওয়া যায় এই পথরেখায়। সেজন্য চাই উদার ও গভীর অনুসন্ধান। তেমন সংবেদনশীল পাঠকের অপেক্ষায় থাকুক 'স্বাধীনতার অভিযাত্রা', কেননা জীবন যদি হয় যাত্রা তবে প্রত্যেককে নিজস্ব এক পরিক্রমণে অবতীর্ণ হতে হয়, আর ব্যক্তিগত এই সাধনা যদি গোষ্ঠী বা সমাজে অবলম্বন খুঁজে পায় তবেই তো সার্থক হয় স্বাধীনতার অভিযাত্রা।

'হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়'

আমাদের উপমহাদেশে সবচেয়ে জটিল সমস্যা ও সবচেয়ে বিপুল সম্ভাবনার উৎসমূল হিসেবে বিরাজ করছে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক। উপমহাদেশ বলা হলো বটে, তবে এই সমস্যা ও সম্ভাবনার প্রধান চারণক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায় বাংলা ও পাঞ্জাবকে। সমস্যার সুতীব্র প্রকাশ হিসেবে ভারতের দুই প্রান্তের এই দুই ভূমি রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের বংশপরম্পরার জীবনপ্রবাহ রুদ্ধ অথবা গতিহারা হয়েছে এবং শেকড়সহ উৎপাটিত হয়ে দেশান্তরী হয়েছে বিশাল জনগোষ্ঠী। সেই হিংস্র ও রক্তাক্ত উত্থান একসময় নিস্তেজ হয়ে এলেও মাঝে-মধ্যেই তা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং পীড়ন ও সংঘাতের অন্তঃসলিলা প্রবাহ কখনোই বিলীন হয়ে যায়নি।

অথচ এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ সব অর্জন মুসলমান ও হিন্দুর মিলিত সাধনার পরিচয় বহন করে। সংস্কৃতির দিকে চোখ ফেরালে সেই বৈশিষ্ট্যটুকু আরো স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। মোগল সংস্কৃতির যে গৌরব ভারত ভূখণ্ডের অধিবাসী মাত্র বহন করেন তা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বাংলার যাঁরা শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল, তাঁদের মধ্যে মিলনের সংস্কৃতির বোধ প্রবলভাবে কার্যকর ছিল। বাংলার লোকশিল্পীদের এই চারিত্র তো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি বাংলার যাঁরা ধর্মনেতা, শাহ জালাল, বায়েজিদ বোস্তামী, শাহ পরান থেকে হালের গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারি, এঁদের হৃদয়ে হিন্দু-মুসলমানের জন্য সর্বদা উদার আসন পাতা ছিল। উনিশ শতকে ধর্মসংস্কারমূলক ব্রাহ্ম আন্দোলন তো খ্রিস্ট ও ইসলাম উভয় ধর্ম থেকে প্রভূত উপাদান গ্রহণ করেছিল। পক্ষান্তরে হিন্দু ধর্মগুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস নিষ্ঠাচারের সঙ্গে উদারতার কোনো বিরোধাভাস দেখেননি। আর বিবেকানন্দ তো ভারতবর্ষে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের যুগল সাধনা কাম্য করেছিলেন। সত্যপীর, বনদেবী, ওলাবিবি ইত্যাদি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত আরাধনার ক্ষেত্র লৌকিক সমাজে নানাভাবে লক্ষ্য করা যায়।

তবে মিলন মিশ্রনের আদর্শ যতো গভীর সমাজসত্য হিসাবে বিরাজ করুক না কেন, বাস্তবে বিশেষভাবে গোটা বিশ শতকের সমাজ ও রাষ্ট্র-বাস্তবতায়, দেখা গেছে হিন্দু ও মুসলমান বারবার এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক গোষ্ঠীবিবাদে জড়িয়ে পড়েছে যে বাংলার

ব্যাপক মানুষের জীবন তচনচ হয়ে গেছে এবং সংঘাতের নাড়িছেঁড়া টানে অভ্যস্ত জীবন ছিন্নমূল হয়ে ভেসে গেছে, সংঘাতের আগুন পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে অযুত প্রাণ। অথচ এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। এবং যা ছিল আরোপিত অথবা বহিঃস্থ শক্তি-রোপিত তাই হয়ে উঠেছিল যেন স্বাভাবিক, মিলনের উচ্চ আদর্শ ফাঁকা বুলি হয়ে, অসার বয়ানের পঙ্ক্তি হয়ে ঘুরে ঘুরে যেন ব্যঙ্গ করেছে আদর্শ পরিবেশের সকল বাকবিভূতিকে। সম্পর্কের ভাঙ্গন ও পারস্পরিক সংঘাত কেবল যে দাঙ্গা ও দেশত্যাগের দৃশ্যমান সহিংসতার জন্ম দিয়েছে তা নয়, সমাজ কাঠামোর স্বাভাবিক সংস্থান নষ্ট করে বিকৃত করে দিয়েছে উভয় সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা। ফলে কাছের বা দূরের মানুষ, কারো জন্যেই জীবনবিকৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় থাকেনি। বিপদটা যখন সম্প্রদায়গত তখন এই পাপাচরণের অভিশাপ থেকে কেউ অব্যাহতি পেতে পারেন না।

বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের এমনি পটভূমিকায় দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কোনো ঘাটনি কখনো দেখা যায়নি। তবে অন্তঃসলিলা সাম্প্রদায়িকতা যখন দাঙ্গার ভয়াবহ রূপ নেয় তখনই দেখা যায় হিতবাদী রচনার জোয়ার। অন্য সময়ে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে যেন সবাই নারাজ। সঙ্কটের মুহূর্ত ছাড়া সমস্যা নিয়ে আলোচনায় এই ধরনের অনীহা বা অনাগ্রহের কারণ ব্যাখ্যা করা দুরূহ। বাংলায় দেশভাগ নিয়ে তথ্যমূলক বিশ্লেষণী লেখা আশ্চর্যজনকভাবে কম। ব্রিটিশ বিদায়ের পঞ্চাশ বছর যখন পালিত হলো সাড়ম্বরে, তখন নতুন করে বেশ কিছু ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশ পোয়েছে, কিন্তু বাংলায় তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ দৃশ্যগোচর হয়নি। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে উন্নতি অথবা অবনতির ওপর সামাজিক বাতাবরণ বড়ভাবে নির্ভরশীল হলেও সমস্যাটি নিয়ে আলোচনার ঘাট বুঝে ওঠা দুষ্কর। তবে এটা অনুমান করা যায় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলায় এর কার্যকারণ ভিন্নতর।

দেশভাগ-পরবর্তী পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে এই অনালোচনা ঘটেছিল পীড়নমূলক সরকারের মৌলিক নীতিগত অবস্থানের কারণে। দেশভাগের মধ্য দিয়েই মুসলমানের পৃথক আবাসভূমি তথা রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছে। তাই বাংলা বিভাজন পাকিস্তানী আদর্শের মহৎবিজয় হিসেবে গণ্য হয়েছে। মুসলমানদের পৃথক সম্প্রদায়গত চিন্তা সাম্প্রদায়িক কলুষে রূপান্তরিত হলেও এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়াটা সঙ্গত বিবেচিত হয়নি। হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ হিন্দুদের সমস্যা হিসেবেই দেখা হয়েছে, দেশের সমস্যা হিসেবে ভাববার কোনো অবকাশ রাখা হয়নি। পাকিস্তান যেন একটি পবিত্র ধারণা, চিরকালের চিরজীবী এক রাষ্ট্র, যার উদ্ভব বা অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। বাংলার রাজনীতির দুই বিশেষ ব্যক্তিত্ব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম পাকিস্তান প্রস্তাব বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন না বিধায় পরে প্রায় দেশদ্রোহী হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক নিগ্রহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অবশেষে সোহরাওয়ার্দী তাঁর জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন গণতান্ত্রিক শক্তির ক্রমবর্ধমান ভূমিতে। আর আবুল হাশিম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হতে না পেরে শেষতক অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠে হাত মেলালেন সামরিক শাসক আইয়ুব খানের সাথে।

গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, নোয়াখালী ও বিহারের দাঙ্গা ইত্যাদি রক্তাক্ত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় তাড়িত হয়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দ দেশভাগকে সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু দেশভাগ ঘটে যাওয়ার পর সংঘাত মোটেই হ্রাস পায়নি, বরং অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্বাস্তুর মতো এক বিশালাকার ও জটিল মানবিক সমস্যার জন্ম হলো। অথচ এসব সমস্যা নিয়ে মুক্ত মনে কোনো আলোচনা পাকিস্তানে কার্যত নিষিদ্ধ ছিল। কেননা এমনি আলোচনার অমোঘ টানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের যৌক্তিকতাই সংশয়বিদ্ধ হতে বাধ্য। পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্ট এই পরিবেশ অল্পকথায় বোঝানো খুব মুশকিল। তবে এর ব্যাপ্তি ও জের কতো সুদূরপ্রসারী ছিল সেটা বোঝাতে দু-একটি বাস্তব উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ভারত থেকে যেসব বিহারী অথবা উর্দুভাষী মুসলমান উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল তাঁদের সাদরে বরণ করেছিল মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার। নীতি হিসেবে ঘোষিত না হলেও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিম উদ্বাস্তু সেই অভ্যর্থনা তো পাচ্ছেই না, বরং নানাভাবে নিগৃহীত হচ্ছে। দেশভাগের ফলে পূর্বাঞ্চলের রেলে যেসব শূন্যপদ সৃষ্টি হয়েছিল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অথবা হিন্দুদের বাস্তুচ্যুতির ফলে সেই পদপূরণ প্রায় সর্বাংশেই বিহারিদের দ্বারা ঘটেছিল। সৈয়দপুরে রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ঘিরে বিশাল বিহারি বসতি গড়ে উঠেছিল, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে যারা অনেক নারকীয় নৃশংসতার জন্ম দিয়েছিল এবং বিজয়ের পরে নিজেরাও কতক নৃশংসতার শিকার হয়েছিল। এঁদের একটা বড় অংশ পরে বাংলাদেশ ত্যাগ করে পাকিস্তানে আশ্রয় নেয় এবং করাচি তথা সিন্ধুভিত্তিক এম.কিউ.এমের প্রধান শক্তি হয়ে ওঠে। ঢাকায় মিরপুর মোহাম্মদপুরে উর্দুভাষী উদ্বাস্তুদের জন্য বিশাল আবাসিক এলাকা ও বসতি গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু বাংলাভাষী উদ্বাস্তু মুসলমানদের দেখা হয়েছে সন্দেহের চোখে ও তাঁদের বরণ করার সরকারি উদ্যোগের উদাহরণ বিশেষ নেই। অবস্থা এমন হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বাঙালি উদ্বাস্তুরা তাঁদের পূর্বপরিচয় আড়াল রাখাই সমীচীন বোধ করেছেন। পরবর্তীকালে দেখা গেছে বাংলাদেশের অন্তত দু'জন রাষ্ট্রপতি তাঁদের সরকারি জীবনবৃত্তান্তে জন্মস্থানের উল্লেখ করেননি তা ভারত ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল বলে। এহেন পরিস্থিতিতে দেশভাগ, দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা তথা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের চুলচেরা যৌক্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ কমই ছিল। তাছাড়া পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবেশও স্মরণ রাখতে হবে: কমিউনিস্ট পার্টি তথা বামপন্থী আন্দোলন নিষিদ্ধ, মুক্তচিন্তার মানুষ অবশ্যম্ভাবীভাবে ঠাঁই পাচ্ছেন কারাগারে, ভাষা আন্দোলনের সময় এক ইংরেজি পত্রিকায় সংবাদ-শিরোনামা করা হয়েছিল, "ঢাকার রাস্তায় ধুতির ঘোরাঘুরি", ভারত-বিরোধিতার রাষ্ট্রীয় আদর্শকে সামাজিকভাবে হিন্দু-বিরোধিতার সমার্থক করার চেষ্টা হয়েছে নানাভাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে জনগোষ্ঠীর জাগরণ ঘটছিল বাঙালিত্বের উপাদানসমূহ অবলম্বন করে এবং এই বাঙালিত্বের চেতনার আওতায় স্বাভাবিকভাবে চলে আসে আসম্প্রদায়িক অবস্থান গ্রহণের প্রশ্ন। ফলে সমস্যাটির মধ্যে একটি বিরোধাভাস লক্ষ্যগোচর ছিল। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, দেশভাগ, দেশত্যাগ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা অথবা অ্যাকাডেমিক বিশ্লেষণ

অনুৎসাহিত করা হলেও দ্বিজাতিতত্ত্ব তথা পাকিস্তানী সাম্প্রদায়িক আদর্শের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই জেগে উঠছিল জাতিসত্তার আকুতিবহ ইতিবাচক রচনাধারা। তাই হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের সামগ্রিক বিন্যাস নিয়ে পর্যালোচনা বিশেষ লক্ষ্যগোচর না হলেও পাকিস্তানী পর্বে বাঙালিত্বের পরিচয়বহ অনেক লেখা আমরা পাই।

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক পটভূমি ভিন্নতর হলেও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা এখানেও তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়। এমনকি শিল্প-সাহিত্যেও সমস্যার এই মাত্রাটুকু বুঝে নেয়ার চেষ্টা ততটা পরিলক্ষিত হয় না, অন্তত পাঞ্জাবের তুলনায় কমই বলতে হবে। পশ্চিমবাংলা সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধকারের সীমিত অভিজ্ঞতার কারণে এমনি ঢালাও মন্তব্য করা হয়তো যুক্তিবিচারে সঠিক বিবেচিত হবে না, তবে তেমনটি হলে নিবন্ধকারই বরং আনন্দিত বোধ করবেন। এই পটভূমিকায় নজরুল ইসলামের '*হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়*' গ্রন্থটি হাতে পেয়ে সঙ্গতভাবেই অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া গেছে।

নজরুল ইসলাম অধুনা আপন কৃতির গুণে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাই তাঁর পরিচয় আর নতুন করে দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বইয়ের নাম থেকে যেমন ধারণা জন্মায়, একটি জটিল বিষয় নিয়ে খোলাখুলি কথা বলার জন্যই তিনি এই গ্রন্থের অবতারণা করেছেন। বইটি তিন পর্বে বিভক্ত, প্রথমে তিনি এই সম্পর্কের একটি ঐতিহাসিক পরিচয় প্রদান করেছেন। বাংলায় আরব ব্যবসায়ী ও সুফিসাধকদের আগমন থেকে বিশ শতকের মধ্যপাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায় অবধি ইতিহাসের ওপর তিনি আলোকপাত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক ইতিহাসের ওপরই জোর দিয়েছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি বিবেচনা করেছেন উভয় ধর্মগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কারণসমূহ। সঙ্গতভাবেই সর্বশেষ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে "বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়"। একটি সরল কাঠামোর মধ্যে জটিল বহুমাত্রিক সমস্যা আলোচনাকালে যেসব বিপদ ঘটবার আশঙ্কা থাকে তা থেকে নজরুল ইসলাম একেবারে মুক্ত থাকতে পারেননি। তার ওপর যে রাজনৈতিক ইতিহাসের ওপর তিনি নির্ভরশীল হয়েছেন বিভাজন-পূর্বকালে সেই রাজনীতি অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি পরিমণ্ডলে সীমিত ছিল। সমাজের উচ্চ-বর্গীয় এলিট গোষ্ঠীই রাজনৈতিক দল হিসেবে সংগঠিত হয়েছিল, রাজনীতির মঞ্চে তাঁরাই ক্রিয়াশীল ছিলেন। ফলে রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা থেকে দ্বন্দ্ব ও বিবাদের যে পরিচয় বের হয়ে আসে সামাজিক বিচারে এবং নিম্নবর্গীয় সমাজে তা কতখানি সত্য ছিল সেই প্রশ্নও করা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক রাজনীতি ও সমাজে সিদ্ধান্তমূলক পর্যায়ে খুব বেশি মানুষের স্থান ঘটে না। ফলে অযুত জনের জীবনে তোলপাড় জাগায় যেসব পরিবর্তন, দেখা যায় সেসব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন মুষ্টিমেয় কিছু লোক মিলে, একত্রে অথবা পাস্পরিক-বিরোধীভাবে। এই সিদ্ধান্তমূলক স্তরটি গড়ে ওঠার পেছনে সমাজ ও অর্থনীতির ভূমিকাও স্মরণ রাখা দরকার।

রাজনৈতিক ইতিহাস পেশ করার সময় নজরুল ইসলাম নির্মোহ অবস্থানে থাকতে পেরেছেন। তিনি কংগ্রেসের ভুলভ্রান্তি দুর্বলতার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি মুসলিম

লীগের সাম্প্রদায়িক অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেছেন। আক্ষেপ করে তিনি লিখেছেন, "তিরিশের দশকে এসে বাংলার কংগ্রেস পুরোপুরি হিন্দু সংগঠন হয়ে গিয়েছিল। ফলে ১৯৩৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেস মুসলমান আসনে প্রার্থী দিতে সাহস করেনি।... ভদ্রলোকদের সমর্থন বজায় রাখতে কংগ্রেস হিন্দু মহাসভার মতোই হিন্দু স্বার্থ রক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে চিহ্নিত করলো। আর মুসলমান স্বার্থরক্ষার জন্য এই দুই দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল মুসলিম লীগ। অতএব চল্লিশের দশকের শুরুতে বাংলার রাজনীতিতে 'হিন্দু স্বার্থ' রক্ষার কথা ছিল, 'মুসলমান স্বার্থ' রক্ষার কথা ছিল, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা তেমন ছিল না।"

তবে ইতিহাসে যেটা ঘটেছিল সেটাই অবশ্যম্ভাবী ছিল কি না সেই প্রশ্ন তো থেকেই যায়। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এটা বারবার দেখা গেছে যে, নেতৃত্বের কিছু ভুল কিংবা অনুদ্যমের কারণে ইতিহাস আর ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে পারেনি। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে এ.কে. ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি মুসলিম লীগের চাইতে বেশি ভোট পেয়েছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন করতে চাইলে তিনি অনুকূল সাড়া পাননি। কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচিত সদস্যরা প্রায় সর্বাংশে মুসলমান হলেও প্রজার অধিকার ও স্বত্বরক্ষার সেকুলার অর্থনৈতিক আদর্শেই দলটি গড়ে উঠেছিল। সেই সময় ফজলুল হক-শরৎ বসুর মিলিত সরকার গঠিত হলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস অবশ্যই ভিন্নতর হতো। একই কথা বলা যায় ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অথবা স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবনা সম্পর্কে। ফলে ঘটনাক্রম দিয়ে রাজনৈতিক ইতিহাস লেখার মধ্যে একটা বিপদ নিহিত থাকে। ঔপনিবেশিক সমাজের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণকারী এলিট গোষ্ঠীর ভাবনা-চিন্তা-কর্মধারা এখানে মুখ্য হয়ে ওঠে। এই রাজনীতিই যে সমাজের প্রধান সত্য নয়, উত্তেজক ঘটনাধারার আড়ালে সেটা চাপা পড়ে যায়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, যাঁদের বসবাস গ্রামে এবং কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত বিধায় যাঁরা ঐতিহ্যের সঙ্গে অনেক নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত, তাঁরা এই রাজনীতির দ্রুত পরিবর্তনময়তায় কোন্ ভূমিকা পালন করেছে সে পরিচয় এখানে কিছুই মেলে না। রাজনৈতিক পরিবর্তনময়তার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মানসে এর কী প্রভাব পড়েছে, অথবা সামাজিক মানস রাজনীতিতে কোন অভিঘাত সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে, সেই জটিল দ্বন্দ্বমূলক বিন্যাসের কথা মনে না রাখলে নিছক রাজনীতির হিসাব গ্রহণ আমাদের বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিতে পারে।

নজরুল ইসলামের প্রথম পর্বের আলোচনায় ১৯৪৭-উত্তর ইতিহাসের জন্য বিশেষ স্থান বরাদ্দ করা হয়নি। বিশ শতকেই ভারতীয় ভূখণ্ডে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবল উত্থান ঘটে এবং শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এর বিপরীতে ঘাত-প্রতিঘাতে উত্তাল বাংলার পূর্বাঞ্চল তথা বাংলাদেশ এবং সেকুলার আদর্শে উদ্বুদ্ধ স্বাধীন ভারতের পঞ্চাশ বছরের পথ পরিক্রমায় অর্জন ও ব্যর্থতা কি সেই হিসেব আরেকটু বিস্তারিতভাবে না করলে সমস্যার প্রতিকারের পন্থা নিরূপণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে দুটি দিক সবিস্তার আলোচনার দাবি রাখে—

একটি দেশভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যা এবং অপরটি গণতান্ত্রিক সমাজে ভোট আকর্ষণের রাজনীতির কারণে দলসমূহের ক্লীবতা।

দেশভাগের কারণে সৃষ্ট বাংলা ও পাঞ্জাবের উন্মুল জনগোষ্ঠীর আকার বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ উদ্বাস্তুতার উদাহরণ হয়ে রয়েছে। এর ফলে যে নানামুখী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তা সমাজমানসকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। পাঞ্জাবে প্রায় সার্বিক জনবিনিময়ের ফলে দেখা গেছে সমাজে মিশ্র সংস্কৃতির উপাদানে ধস নেমেছে। মুসলমান, হিন্দু ও শিখদের সম্মিলনে যে বর্ণিল সংস্কৃতির শহর ছিল লাহোর, ভারতীয় সংস্কৃতির যা ছিল অন্যতম প্রধান কেন্দ্র, তার আত্মার মৃত্যু ঘটেছে দেশভাগের ফলে এবং উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক ভূগোলে লাহোর হয়ে উঠেছে গুরুত্বহীন এক গৌণ শহর। পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু জনগোষ্ঠীর বিতারণ, অন্যান্য বিশাল সমস্যার সঙ্গে, ব্যাপক মস্তিষ্ক পাচার বা ব্রেন ড্রেইন ঘটিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষ প্রায় ফৌত করে দিয়েছে। সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক ইত্যাদি চর্চামূলক সংস্কৃতির ব্যাপ্তিও রাতারাতি সঙ্কুচিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্যভাবে এর নিরসন ঘটিয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলেও সামাজিক ক্ষতির গভীর দাগটুকু মুছে ফেলা যায়নি। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় দেশত্যাগের প্রবণতা রোধ করলেও তা সাময়িক প্রমাণিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু-হত্যা ও পরবর্তী সামরিক শাসকদের সাম্প্রদায়িক পদক্ষেপ বাঙালিত্বের মৌল চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করলো। বাঙালির স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে মুসলমানের রাষ্ট্রে পরিণত হয়, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর খাটিয়ে সমন্বিত সংস্কৃতি ও আবহকে বিনষ্ট করা হয়। অন্য যে-কোনো সংস্কৃতির মতোই বাঙালির সংস্কৃতি একটি বর্ণিল ধারণা, এখানে একটি বর্ণ ধূসর হয়ে উঠলে কিংবা অপর বর্ণ প্রবল হয়ে পড়লে এর সামগ্রিক চিত্ররূপটিই বিকৃত হয়ে পড়ে। সংখ্যাবিচার দিয়ে এই বর্ণবিন্যাস রচনা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

সংখ্যাবিচারে অমুসলিম জনগোষ্ঠীর অনুপাত হ্রাস রাজনৈতিকভাবেও সংকটের জন্ম দিয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজে ভোটের রাজনীতিতে সংখ্যার হিসাব রাজনীতিকদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আজকের বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচনে অমুসলিম জনগোষ্ঠীর নির্ধারক তো দূরের কথা, তাৎপর্যময় প্রভাবও নেই। তাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেকুলার আদর্শের প্রচার অধুনা আর তেমন জোরদার নয়, কেননা এই আদর্শ ভোটের বাক্স কতোটা ভারী করে তুলতে পারবে সে বিষয়ে নেতারা স্থিরনিশ্চিত নন। তদুপরি সত্তরের দশক থেকে, মধ্যপ্রাচ্যের তেলের সম্পদের গুণে অনেক মুসলিম-প্রধান দেশের রাতারাতি ধনকুবের হয়ে যাওয়ার সুবাদে সৃষ্ট ইসলামী পুনর্জাগরণের পটভূমিকায়, গরিষ্ঠ মুসলিম জনসাধারণের মানসকে তুষ্ট করার এক অশুভ প্রতিযোগিতা রাজনীতিকদের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে। জেনারেল জিয়া তাই সংবিধানের প্রস্তাবনা পাল্টে দেন, সূচনায় যোগ করেন 'বিসমিল্লাহ' বাণী এবং জেনারেল এরশাদ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে তা সংবিধানভুক্ত করেন।

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস অবশ্য ভিন্ন পথ নিয়েছে। রাষ্ট্র নাগরিক জীবনের প্রধান নিয়ামক শক্তি হয়ে ওঠার সুবাদে এক্ষেত্রে ভিন্ন রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে ভিন্ন রাজনীতি

ও ভিন্ন বিকাশ। তবে এর মাত্রাগুলো বুঝে নেওয়ার ওপর মিলনের আদর্শ বড়ভাবে নির্ভর করবে। ১৯৪৭-পরবর্তী এই পঞ্চাশাধিক বছরের বিকাশ প্রক্রিয়ার ওপর আগামীতে নজরুল ইসলাম আরো বড়ভাবে নজর দেবেন বলে আমরা আশা করবো। কেননা এই কাজটি অসম্পন্ন রেখে কর্তব্যের গতিমুখ স্থির করা কষ্টকর।

দেশভাগের ফলে অন্যান্য অনেক বড় সমস্যার পাশাপাশি পশ্চিম বাংলায় হিন্দু-মুসলিম মিথস্ক্রিয়া যে বড়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার অতীত রাজনৈতিক ইতিহাসে অনেক নেতির পাশাপাশি কতক ইতিবাচক ঘটনাও প্রত্যক্ষ করা যায়। বেঙ্গল প্যাক্টের ফলে কলিকাতা করপোরেশনের নির্বাচিত পদ ও চাকরিতে মুসলমানদের বর্ধমান উপস্থিতি সামাজিকভাবে তাদের দৃশ্যমান করে তোলে। নির্বাচনী সংস্কারের ফলে ১৯৩৭ সাল থেকে রাজনীতিতে মুসলিম নেতারা কেবল দৃশ্যমান নয়, চালকের আসনেই স্থান নিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়া ও আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে উচ্চ শিক্ষা ও কর্মে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যানুপাত বাড়ছিল। এর ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে মিথস্ক্রিয়া বাড়ছিল। মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব যতোই থাকুক, এই সামাজিক ক্রিয়াশীলতার একটি ইতিবাচক প্রভাব থেকেই যায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া দেশভাগের ফলে একেবারে রাতারাতি রুদ্ধ হয়ে যায়। মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রায় সর্বাংশে পাকিস্তানে চলে যান। চাকরিজীবীরা অপশনের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং পেশাজীবীরা নতুন স্থানে নতুনভাবে জীবন শুরুর প্রচেষ্টা নেন। আজাদ, ইত্তেহাদসহ মুসলমানদের পরিচালিত পত্র-পত্রিকা স্থানান্তরিত হয় ঢাকায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ইসলামিয়া কলেজ, লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে পূর্ববাংলার মেধাবী মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর আগমনের আর কোনো সুযোগ থাকে না। কলকাতায় সামাজিক সোপানের উপরিভাগে ছিলেন যে সচ্ছল শিক্ষিত মুসলমান, তাঁদের বড় অংশই দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফলে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-মুসলিম মিলিত কর্মসাধনার ক্ষেত্রটি ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসে। এর ফল যে সম্প্রীতির আদর্শের জন্য শুভকর হয়নি সেটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই অবক্ষয়টি চোখের আড়ালেই থেকে গেছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক খারাপ হওয়ার বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি মুসলমানদের সম্পর্কে হিন্দুদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও হিন্দুদের সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণার একটি তালিকা দিয়েছেন। নানা বিচারেই তালিকাটি উল্লেখযোগ্য। হিন্দুদের ছকে বাঁধা ধারণা অনুযায়ী ১. মুসলমানরা বিদেশী; ২. মুসলমানরা স্বভাবত সাম্প্রদায়িক ও গোঁড়া; ৩. মুসলমানরা পাকিস্তানের প্রতি অনুগত; ৪. মুসলমানরা পঞ্চম বাহিনী অর্থাৎ দেশের খবর শত্রুর কাছে পাচার করে; ৫. মুসলমানরা ঘেটো মানসিকতাসম্পন্ন অর্থাৎ নির্দিষ্ট মুসলমান এলাকায় থাকতে ভালবাসে; ৬. মুসলমানরা স্বভাবত পরিবর্তনবিমুখ; ৭. মুসলমানরা চারটে বিয়ে করেন; ৮. মুসলিম স্বভাবত নিষ্ঠুর; ৯. মুসলমানরা অত্যন্ত নোংরা; এবং ১০. মুসলমানরা বেশি সুবিধা ভোগ করেন ইত্যাদি।

অপরদিকে, লেখকের মতে, হিন্দুদের সম্পর্কে মুসলমানদের ছকে-বাঁধা ধারণা হলো: ১. হিন্দুরা বিধর্মী; ২. হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক ও শুচিবায়ুগ্রস্ত; ৩. হিন্দুরা সেকুলার শাসনের

আড়ালে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়; ৪. হিন্দুরা স্বভাবত মুসলমান বিদ্বেষী; ৫. হিন্দুরা সুযোগ পেলেই মুসলমানদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন; ৬. হিন্দুরা মুখে মিলনের কথা বললেও মনে শত্রুতাভাবাপন্ন; ৭. হিন্দুরা সুপরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের উচ্চপদ থেকে বঞ্চিত করেন; ৮. হিন্দুরা সুচতুরভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে ব্যবহার করেন; এবং ৯. হিন্দুরা ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমানদের কলঙ্কিত করেন ইত্যাদি।

এই তালিকা এক অসাম্প্রদায়িক উদারবাদী চিন্তকের সদিচ্ছা-প্রণোদিত প্রচেষ্টার ফসল। তবে এক্ষেত্রে সামাজিক গবেষণায় প্রচলিত জরিপের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি। এমনি তালিকার কোনো কোনো ভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, কোনটি কতটা ব্যাপকভাবে প্রচলিত সে-জিজ্ঞাসাও থেকে যায়, তবু এমনি তালিকা যে প্রণীত হতে পারে সেটাই দেখিয়ে দেয় উভয় ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্ট ফারাকের গভীরতা। উভয় ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবহারিক যোগাযোগ যে অত্যন্ত নিম্নপর্যায়ে রয়েছে, সম্প্রদায় দুটি যে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে তার প্রতিফলন মেলে এই তালিকায়। সেই সঙ্গে মনে হয় বিষয়টি নিয়ে সামাজিক গবেষণার প্রচুর অবকাশ রয়েছে। কেবল ঢালাওভাবে হিন্দু বা মুসলমানের ছকে-বাঁধা দৃষ্টিভঙ্গি নয়, উভয় ধর্মগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গির কতটা ভিন্নতা ঘটে সেটাও দেখার বিষয় হতে পারে।

পশ্চিমবাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভালো করার উপায় হিসেবে গ্রন্থশেষে লেখক উপরোক্ত ছকে-বাঁধা ধারণা দূর করতে নানা সুপারিশ করেছেন। এই অংশটুকু বোধ করি গ্রন্থের দুর্বলতম দিক। লেখকের প্রবল সদ্‌কামনা তাঁকে সরল সমাধানের দিকে প্ররোচিত করেছে। যেমন রাজনৈতিক দলগুলোর সুবিধাবাদী সাম্প্রদায়িক নীতি প্রতিরোধকল্পে তিনি সুপারিশ করেছেন: "আমাদের প্রতিবেশীদের এমনভাবে সচেতন করতে হবে তাঁরা যেন ধর্মের কথা এবং সাম্প্রদায়িক কথার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। যাঁরা সাম্প্রদায়িক কথা বলতে আসেন তাঁদের তাড়াতে পারেন। আমরা এটা যদি করতে পারি তাহলে এক ধর্মের লোককে অন্য ধর্মের লোকের বিরুদ্ধে ক্ষেপানো যাবে না। ...যাঁরা আপাতদৃষ্টিতে সেকুলার রাজনীতি করেন, ঘোষণা অনুসারে যাঁদের দল সেকুলার, তাঁদের কাজের ওপরও নজর রাখতে হবে। যদি দেখা যায় যে, বিশেষ একটি অঞ্চলে বা কর্মসূচিতে তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার কার্ড ব্যবহার করছেন তবে তাঁদের বর্জন করতে হবে। তাহলে আর কোনো দলই সুযোগ বুঝে সুবিধাবাদী অন্যায় আচরণ করতে সাহস পাবে না।"

সামাজিক জীবনে ধর্মের প্রকাশ বন্ধ করতে অনেক ধরনের প্রস্তাব করেছেন নজরুল ইসলাম। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জন্য সুন্দর বাংলা নাম রাখার সুপারিশ করেছেন তিনি। এই নামে যেন বর্ণগোত্র-পরিচয় ধর্ম-পরিচয় প্রকাশ না পায়। তিনি লিখেছেন. "তাই আমার প্রস্তাব, সব বাঙালির নাম সহজ বাংলায় রাখা হোক। আর তার সঙ্গে অন্য পরিচয় যোগ করতে হলে তার জন্মস্থান বা বাসস্থানের পরিচয় যুক্ত হোক। যেমন বকুল বসন্তপুরী বা মুকুল মুর্শিদাবাদী। বকুল একটি ফুলের নাম, বসন্তপুর গ্রামের নাম। মুকুল ফুলের কুঁড়ি, মুর্শিদাবাদ জেলা। হিন্দুদের এরকম নামে কোনোরকম আপত্তি থাকতে পারে না। আর

মুসলমানদের মধ্যে এরকম নামের প্রচলন ইতিমধ্যেই আছে। যেমন—শায়ের লুধিয়ানী।" এমনি অবাস্তব ও অযৌক্তিক প্রস্তাবনা সামাজিক রীতি ও ঐতিহ্যের প্রতি অবহেলার ভাব প্রকাশ করে এবং লেখকের হিতাকাঙ্ক্ষাকে বায়বীয় করে তোলে। এই একই ইচ্ছাপূরণমূলক তাগিদ লেখকের অন্যান্য প্রস্তাবনাকেও বহুলাংশে লঘু করে তুলেছে।

বাঙালি মুসলমানের নামকরণের ধারাটি অবশ্য বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। অধ্যাপক রফিউদ্দিন আহমেদের '*দি বেঙ্গল মুসলিমস্*' গ্রন্থে এ-বিষয়ে চমৎকার আলোচনা রয়েছে। এক সময় গ্রামীণ সাধারণ মুসলিম পরিবারে পোশাকি নামের কোনো প্রচলন ছিল না। দুখি, ফালু, কালু, পারুল, বেলি, শেফালি এমনি নামের ছিল ছড়াছড়ি। ওয়াহাবী আন্দোলনের সুবাদে এবং জৈনপুরের পীর কেরামতউল্লাহ ও অন্যান্য পীর কর্তৃক অনুসারীদের খাঁটি মুসলমান করবার প্রয়াস হিসেবে আরবি নামকরণের প্রসার ঘটে। শীতকালে বজরায় সওয়ারি হয়ে এইসব 'বহিপীর' দূর-দূরান্তের গ্রামে গিয়ে মুসলমানদের ধর্মকথা শোনাবার পাশাপাশি পোশাকি নাম প্রদান করতেন। অর্থ না বুঝে এমনি আরবি নামের বাংলাদেশের মুসলমান মধ্যপ্রাচ্যে উপহাসের পাত্র হয়েছেন, তেমন উদাহরণ বিরল নয় কেননা তাঁর নামের আরবি অর্থ হয়তো দাঁড়িয়েছে 'উটের পিতা' কিংবা 'দুম্বার ঘন্টা'। ষাটের-সত্তরের দশকের জায়মান সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব সন্তানদের বাংলা নাম, নিদেন পক্ষে বাংলা ডাকনাম অথবা বাংলা আরবি/ফার্সি মিশ্রিত নাম রাখাকে উৎসাহিত করে। তাই দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর সময়ে জন্ম নিয়েছে অযুত বিজয়, জয়া, জয়িতা, বিপ্লব, জয় প্রমুখ। আশি-নব্বই দশকে আদর্শহীনতার প্রসার ও ইসলামী পুনর্জাগরণ নামের আরেক দফা পরিবর্তন ঘটায়। একদিকে যেমন কেতাদুরস্ত আরবি নামের প্রচলন দেখা যায়, তেমনি লক্ষিত হয় ডলার, রিয়াল, আশরাফি ইত্যাদি একেবারেই বৈশ্য মনোভাবের জাগতিক নাম। সম্প্রতি বিদেশাগত আমাদের এক কবি-বন্ধু জানাচ্ছিলেন প্রবাসে তাঁর স্বদেশী অনেক মিত্রজন তাঁকে গঞ্জনা দেয় কন্যার 'শুচিতা' নামের জন্য, বলে হিন্দু নাম রাখা হয়েছে কেন? বন্ধুর বিমর্ষতা দূর করতে সোৎসাহে বলি, ওদের জানাতে হবে শুচিতা তো হিন্দু নাম নয়, বাঙালি নাম। বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকদের নাম যদি হতে পারে সুকর্ণ, সৌহার্দ্য (সুহার্তো), মেঘবতী ইত্যাদি, তবে শুচিতা, অস্মিতার দোষ কোথায়?

কেবল নামের বিষয়টিই নয়, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের গোটা পরিধি নানা পরিবর্তনময়তার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তবে এর দুঃখজনক দিক হচ্ছে এইসব পরিবর্তনের মধ্যে ইতিবাচক উপাদানের অংশভাক্ খুবই কম। বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাশাধিক বর্ষকালের স্বাধীন বিকাশও পরিস্থিতির বড়রকম হেরফের ঘটাতে পারেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রেই এর আরো অবনতি ঘটেছে। এমনি প্রবণতা আমাদের কারো কাম্য নয় ঠিকই, কিন্তু এ-থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সমস্যার ওপর আরো নানাদিক থেকে আলোকপাত প্রয়োজন, এর বহুমুখী চুলচেরা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে নজরুল ইসলামের বই একটি তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করেছে। এক বিশাল জাতিগোষ্ঠীর প্রধানতম

সমস্যা নিয়ে আলোচনা-বিশ্লেষণের তীব্র অভাবের মধ্যে এমনি একক ও আন্তরিক প্রচেষ্টা অনেক বড় মূল্য বহন করে।

তবে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভালো করার উপায় বাতলাতে গিয়ে নজরুল ইসলাম মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী কি চাকরিসন্ধানী বাঙালি বৃত্তের বাইরে বিশেষ ভাবতে পারেননি। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনাচার ও জীবন চর্যায় যে বাঙালি সংস্কৃতির প্রকাশ তাকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখার প্রসঙ্গ বিক্ষিপ্তভাবে তিনি উত্থাপন করলেও এর গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব লক্ষ্য করা যায়। নিম্নবর্গীয় জনসমষ্টি সম্পর্কে তাঁর রয়েছে তুচ্ছতাবোধ, তিনি লিখেছেন: "দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক নিরক্ষর, দেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁরা সম্যক অবহিত নন। বাংলা ভাষায় কথা বললেও তাঁরা যে বাঙালি সে সচেতনতাটুকুও সকলের নেই।" এই উপলব্ধি যে সমাজতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক যুক্তিবিচারে একেবারেই ধোপে টেকে না তা' বলার অপেক্ষা রাখে না। সে-কারণেই সংস্কৃতির গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়েও কোথায় যেন থমকে যান নজরুল ইসলাম। তিনি লেখেন, "বাংলাভাষী কোন ব্যক্তির ধর্ম যাই হোক না কেন, তাঁর প্রথম পরিচয় হওয়া উচিত তিনি বাঙালি।" এখানে "হওয়া উচিত" বলাটা অবান্তর, কেননা সেটাই তো তার প্রথম পরিচয় এবং সেখান থেকে যিনি যতোটা দূরে সরে গেছেন তাঁকে ততোটা পথ অতিক্রম করে কেন্দ্রে ফিরবার সাধনা করতে হবে। বস্তুত, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভালো করার সবিস্তার সমাধান দাখিল করা হয়তো দুরূহ, কিন্তু এটুকু জোর দিয়ে বলা যায়, এই লক্ষ্যে সংস্কৃতি পরিচয়কে তথা বাঙালিত্বকে বহন করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলো প্রসারিত ও বলবান করতে হবে। সেই বহুমুখী বহুমাত্রিক কার্যক্রম যতো জোরদার হবে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ততো নিবিড় হয়ে স্বাভাবিক অবস্থান খুঁজে পাবে।

স্বদেশ-ভাবনা ও বিভাজনের রাজনীতি

যখন আমাদের কোনো স্বদেশ ছিল না তখন স্বদেশ-ভাবনা ছিল প্রবল, আর যখন বিপুল আত্মদানের বিনিময়ে আমরা অর্জন করলাম স্বদেশ তখন দেশমাতৃকার ছবিটি ক্রমে ক্রমে ম্রিয়মাণ, বিবর্ণ, অপমানিত, কালিমালিপ্ত, অস্বীকৃত হতে হতে এমন হয়ে উঠেছে যে এ-মুখ আমাদের একেবারে অচেনা। সম্পূর্ণ অচেনা বলাটা বোধ করি ভুল হবে, স্বদেশ বলতে যে-ছবি আঁকা থাকে বুকে, আর যে দেশটির মুখোমুখি হই আমরা প্রতিদিন, দুইয়ের মধ্যে ফারাক হয়ে গেছে সহস্র যোজন। আর সে-কারণে বুকের মধ্যে পুষে রাখা ছবিটি বাস্তবের সঙ্গে কোনোভাবে মেলে না, যে-ছবি দেখি মনে হয় এ-আমার দেশ নয়। এমন এক আশাভঙ্গ স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রজন্মের হয়তো স্বাভাবিক নিয়তি, কেননা যখন লড়তে হয় স্বাধীনতার জন্য, আর সে লড়াই যখন প্রবল প্রতাপশালী মতান্ধ শক্তির বিরুদ্ধে, যে-শত্রু আপন জাত্যভিমান কিংবা ধর্মাভিমান তাড়িত হয়ে নিজ অবস্থান থেকে সামান্য টলতেও প্রস্তুত নয়, কিংবা তার মতান্ধতাই বুঝি টলবার কোনো জায়গা রাখেনি, তখন তো স্বাধীনতার লড়াই হয়ে ওঠে মরণপণ সংগ্রাম। সে-রকম সংগ্রামে যারা অবতীর্ণ হন তাদের অন্তরে আঁকা দেশের ছবি তাঁদেরকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে কিংবা বলা যায় আলোড়িত করবার মতো কল্পিতরূপ তাঁদের দাঁড় করাতে হয়। এহেন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সমাজতাত্ত্বিকদের অনেকে জাতীয়-রাষ্ট্রের চেতনাকে বলেছেন কল্পিত সত্তানির্মাণ বা ইমাজিন্‌ড্‌ আইডেনটিটি। অন্তত একথা বলা যায়, ১৯৪৭ সালের দেশভাগ তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের কালে পাকিস্তান নামক জাতীয় রাষ্ট্র এই কল্পিত নির্মাণ অবলম্বন করেছিল, আর অবশিষ্ট ভারতও আপন সত্তার বর্জিত অংশের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা থেকে নিজের আরেক কল্পিত সত্তা দাঁড় করিয়ে ফেলে। সমাজতাত্ত্বিক আশিস নন্দী একে বলেছেন 'পাকিস্তানের ভারতরূপ' ও 'ভারতের পাকিস্তানরূপ'। কিন্তু জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উদ্ভব ছিল দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের জটিলতা ও ভ্রান্তির পঙ্ক থেকে এক উদার অভ্যুদয়, বাহ্যিকভাবে এর অবয়বে সম্পৃক্ত ছিল ভারত-পাকিস্তান বিবাদের জের; কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মাত্রা বহন করে এবং ধর্মগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নিষ্ঠুরতা পেছনে ফেলে নতুন পথযাত্রার সূচনা করে বাংলাদেশ।

এই সূচনা এতোই যুগান্তকারী যে এর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছেন, পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের প্রচলিত বিবেচনায় তাই বাংলাদেশের উত্থান কখনো চিহ্নিত হয়েছে পাকিস্তানের গৃহবিবাদের ফসল হিসেবে, কখনো-বা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরিণতি রূপে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিশাল ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য নব-উত্থিত দেশটি স্বয়ং অনুধাবন করতে পেরেছিল কিনা সেই প্রশ্নও জাগতে পারে, অন্তত স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনৈতিক গতিধারা তো সেরকম ব্যর্থতারই পরিচয় বহন করে।

আমাদের স্বদেশ-বাস্তবতার সাম্প্রতিককে ইতিহাসের ঘটনাধারার আলোকে আমরা বিশেষ বিচার করতে যাই না, বড় বেশি পড়ে থাকি দৈনন্দিনে এবং সঙ্কটের অথৈ সাগরে ডুবে গিয়ে কোনো তল খুঁজে পাই না; কিন্তু ইতিহাসের পরম্পরায় মিলিয়ে দেখলে আমরা এর চলমানতার ইঙ্গিত পাবো, ভবিষ্যৎ বক্তা বা দ্রষ্টা হওয়ার প্রশ্ন নেই, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা আস্থাশীল হওয়ার লক্ষণ অন্তত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সেই চেষ্টায় যোগ্য ব্যক্তির সমাগম বিশেষ ঘটেনি, তাই অযোগ্যকেই কোমড় বেঁধে এগুতে হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব পূর্ববঙ্গবাসীকে স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তা প্রদান করেছিল; কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে উদ্ভূত পাকিস্তান তদীয় রাষ্ট্রধারণার গোড়া থেকেই কতক প্রহেলিকা বা ফ্যালাসি বহন করছিল। চৌধুরী রহমত আলী তথা কেম্ব্রিজ গ্রুপ নামক যে ছাত্রগোষ্ঠী 'পাকিস্তান' শব্দবন্ধ প্রথম প্রণয়ন করে ভারত উপমহাদেশে তাদের সেই কল্পিত মুসলিম রাজ্য গঠিত হয়েছিল মুসলিমপ্রধান কতক অঞ্চল নিয়ে, যেমন এর অন্তর্ভুক্ত ছিল পাঞ্জাব, কাশ্মির (সীমান্ত প্রদেশ), সিন্ধু ও বেলুচিস্তান; সেখানে পূর্ববাঙলার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দু-পাতার যে প্রস্তাব শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক উত্থাপন করেন, যা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিতি লাভ করে, সেখানে 'পাকিস্তান' শব্দবন্ধের কোনো উল্লেখ ছিল না, তদুপরি একক রাষ্ট্রের বদলে বলা হয়েছিল বিভিন্ন মুসলিমপ্রধান অঞ্চলভিত্তিক রাষ্ট্রসমূহ গঠিত হবে। পরে ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে কনভেনশেন ডেকে জিন্নাহ লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করেন, তিনি জানান টাইপিস্টের ভুলে স্টেট-এর বদলে লেখা হয়েছিল স্টেটস্। একে তো কনভেনশন ডেকে কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোনো এখতিয়ার কারো থাকতে পারে না, তদুপরি এমন বিপুল তাৎপর্যময় পরিবর্তন যে নাজুক যুক্তি দেখিয়ে করা হলো সেটা 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্রের ভিত্তিগত দুর্বলতাই প্রকাশ করে। হসরৎ সোহানী সভায় প্রতিবাদমুখর হলেও তাঁর খর্বাকৃতির সুযোগ নিয়ে সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সেদিকে দৃষ্টিপাতই করলেন না। অপর প্রতিবাদী বাংলার মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম তখন দৃষ্টিশক্তি রহিত, তাই তাঁকে উপেক্ষা করতে জিন্নাহর বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। এভাবেই পাকিস্তান ধাবিত হয়েছিল তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে এবং ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে আহ্বান করে যে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়া হয়েছিল সেই রক্তস্রোত বেয়ে জন্ম নেয় এক অভিনব রাষ্ট্র। ১২০০ মাইল দূরবর্তী দুই পৃথক অঞ্চল নিয়ে গঠিত এই রাষ্ট্র এতোই অভিনব যে, বলা হয়ে থাকে পাকিস্তানের কোনো স্কুল-বালক ভারতের ম্যাপ না এঁকে তার দেশের মানচিত্র আঁকতে পারে না।

১৯৪০ সালের যে লাহোর প্রস্তাব, মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে দীর্ঘ আলোচনা ও কাটাছেঁড়া শেষে যা গৃহীত হয়, সেটা হিন্দু পত্র-পত্রিকা কর্তৃক 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং প্রস্তাবে পাকিস্তান কথাটির কোনো উল্লেখ না থাকলেও এই নামেই লাভ করে ব্যাপক পরিচিতি। এখানেও ইতিহাসের আরেক খেলা কাজ করেছে। ভারতবাসীর প্রচলিত ধর্মকে 'হিন্দু' আখ্যা প্রদানে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল বহিরাগত বিজেতা মুসলিমরা, সিন্ধু নদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ থেকে দেশটিকে তারা যেমন চিহ্নিত করেছিলেন হিন্দুস্তান হিসেবে, তেমনি কালক্রমে এতদঞ্চলের সকল অমুসলিম জনগোষ্ঠী চিহ্নিত হয় 'হিন্দু' হিসেবে। বৈচিত্র্যময় নানা লোকাচার ভিত্তিক ধর্ম এমনিভাবে একক অভিধা দ্বারা পরিচিত হয়ে ওঠে। পাকিস্তান যখন বাস্তব রূপ লাভ করতে চলেছিল তখন মাউন্টব্যাটেনের কাছে জিন্নাহর এক আর্জি ছিল অবশিষ্ট ভারতকে 'হিন্দুস্তান' হিসেবে অভিহিত করা হোক। কেননা জিন্নাহ বুঝেছিলেন তাঁর তথাকথিত টু নেশন থিওরির একটি নেশন যদি পাকিস্তান হয়, যে পাকিস্তান জন্ম নিতে চলেছে, তবে টু নেশনের অপরটিকে তো হিন্দু নেশন হতে হবে। বলা বাহুল্য, এই বালখিল্য আবদার কারো কাছেই কল্কে পায়নি, অবশিষ্ট ভারত বহুজাতিক বহুধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবে তার পথচলা অব্যাহত রাখে, সেই চলার পথে ব্যর্থতা-ঘাটতি যতোই থাকুক। তবে জিন্নাহর টু নেশনের বাস্তব সমাধি হলেও তার জের পাকিস্তানের ঘাড়ে টিকে ছিল এবং প্রেতাত্মা হিসেবে এখনও টিকে আছে আমাদের দেশীয় অনেক মগজে এবং এদের কাছে ইন্ডিয়া নামক দেশটি আজো হিন্দুস্তান হয়ে আছে। এটাও লক্ষণীয়, ইতিহাসের গ্রন্থিগুলো একান্ত সরল নয়, সিন্ধু নদী-বিধৌত অঞ্চল হিসেবে উপমহাদেশকে হিন্দুস্তান বলাটা একসময়ে বেশ প্রচলিত ছিল, টু নেশনের একাংশ স্বরূপ হিন্দুস্তান নয় এবং সেই ব্যাপক অর্থে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ইকবাল লিখেছিলেন অসাধারণ সঙ্গীত, 'সারে জাহা সেঁ আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা'। এর পাশাপাশি স্মরণ করতে হয় লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক ফজলুল হক দ্বিজাতি-তত্ত্বের বাহক সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগপন্থী ছিলেন না, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর স্বার্থের বাহক হিসেবে তিনি এসেছিলেন মুসলিম লীগে এবং ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনের পরের বছরই তিনি বহিষ্কৃত হন মুসলিম লীগ থেকে। জিন্নাহর সঙ্গে ফজলুল হকের দ্বন্দ্বের অনেক বিষয় ছিল, তার মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছিল ভারতের বিভিন্ন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের মুসলিম নেতাদের সঙ্গে মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশের লীগ নেতাদের বিরোধ। রাজনীতির মূল স্রোতে চলবার অভিজ্ঞতা যেসব জননেতার রয়েছে এই বিরোধ ছিল তাঁদের সঙ্গে প্রান্তিক অবস্থানের নেতাদের বিরোধ, যাঁরা কোনোভাবেই জননেতা ছিলেন না। পাকিস্তানের রাজনীতির দুই দিকপাল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খান কারো কোনো আসন ছিল না ব্যবস্থাপক সভায়। জিন্নাহ গভর্নর জেনারেল হয়ে এই সঙ্কট পার হন, আর লিয়াকত আলীকে বাংলার কোটা থেকে নির্বাচিত করে বাঙালিরা জায়গা ছেড়ে দেয়ার দাক্ষিণ্য দেখালো।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রদেশের নেতাদের এক অবস্থান এবং এর বিপরীতে সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ নেতাদের ভিন্ন অবস্থান—ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে বিদ্যমান বড় এই দ্বন্দ্বের

প্রকাশ ঘটেছে ফজলুল হক-জিন্নাহ সংঘাতে। ডিফেন্স কাউন্সিলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ফজলুল হকের যোগদানকে নিন্দিত করে জিন্নাহ যখন তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করান তখন ফজলুল হক স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে সারা ভারত মুসলিম লীগ সম্পাদক লিয়াকত আলী খানকে যে পত্র লেখেন তা ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী অবস্থান নিয়ে মুসলমান রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে বিদ্যমান জটিলতা এবং ফজলুল হকের স্বচ্ছ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, উদারবাদী চেতনার অনুপম প্রকাশ ঘটিয়েছিল। ইতিহাসের বিচারে সাময়িক বিজয় জিন্নাহ পেয়েছিলেন; কিন্তু চূড়ান্ত রায় ছিল ফজলুল হকের পক্ষে। তিনি বলেছিলেন, 'যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যায় কম, যা সাধারণভাবে মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশ হিসেবে পরিচিত, তারা বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলিমদের স্বার্থ যেভাবে বিঘ্নিত করছে তার বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন প্রতিবাদ আমি লিপিবদ্ধ করতে চাই। বাংলা ও পাঞ্জাব, এখানে রয়েছে ৫ কোটি মুসলমান, ভারতের মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক, অবশিষ্ট ৫ কোটি গোটা উপমহাদেশ জুড়ে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে কোথাও কোথাও তারা জনসংখ্যার ৪ থেকে ৫ শতাংশ মাত্র। এটা বোধগম্য যে, আমাদের এই মুসলিম ভাইয়েরা প্রশাসনে কখনো কার্যকর কণ্ঠ হয়ে উঠতে পারবেন না, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা তো ছেড়ে দেয়াই যাক।' এইসব অর্বাচীন নেতাদের দ্বারা যে দায়িত্ববান প্রাদেশিক নেতাদের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে সেটা বুঝিয়ে দিয়ে ফজলুল হক দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, "ফর মাই পার্ট, আই উইল নেভার অ্যালাউ দি ইনটারেস্ট অব থার্টি থ্রি মিলিয়ন্‌স্‌ অব মোসলেম্‌স্‌ অব বেঙ্গল টু বি পুট আন্ডার দি ডোমিনেশন অব অ্যানি আউটসাইড অথরিটি হাউএভার এমিনেন্ট ইট মে বি।"

আভ্যন্তরীণ এইসব দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও অসঙ্গতি নিয়েই পাকিস্তানের জন্ম এবং প্রতিষ্ঠার লগ্নেও নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পীড়িত ছিল এর জনকেরা। সেকারণে এটাও লক্ষণীয়, পাকিস্তানকে সমাজতাত্ত্বিকদের কেউ কেউ বলেছেন অনিচ্ছুকভাবে জন্ম নেয়া রাষ্ট্র। বর্তমান কালের গবেষণায় আরো যেসব তথ্য উদঘাটিত হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে 'পাকিস্তান' দাবি নিয়ে জিন্নাহ সোচ্চার হলেও তিনি একে সর্বভারতীয় নিরিখে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার রক্ষায় দর কষাকষির উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ফলে পাকিস্তান দাবি বিসর্জন দিতে তাঁর সম্মতির প্রকাশ বিভিন্ন সময় দেখা গেছে এবং এর সবচেয়ে কার্যকর প্রকাশ ছিল কেবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহণে মুসলিম লীগের সম্মতির মধ্যে। সেই ঐক্য ও সমঝোতার ভিত্তি বিনষ্ট করার পেছনে নেহরু-প্যাটেলের ছিল বড় ভূমিকা। এখন তাই ইতিহাসের পুনর্বিচার চলছে এবং ঐতিহাসিকরা বলছেন যে, মূঢ়তা কেবল মুসলিম লীগের মধ্যেই ছিল না, কংগ্রেসও তাতে সমভাগের দাবি রাখে।

১৯৪৬ সালে কলকাতা, নোয়াখালী ও বিহার জুড়ে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার পটভূমিকায় লর্ড ওয়াভেলকে বিদায় নিতে হলো এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের বিজয়ী বীর। তিনি এসে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনক্ষণ এগিয়ে আনলেন, জোর প্রস্তুতি শুরু হলো দেশভাগ তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার। এটাও বিশেষভাবে

লক্ষণীয়, ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে বাংলা এবং সিন্ধু প্রদেশ ছাড়া মুসলিম প্রাধান্য-সম্পন্ন অন্য কোনো প্রদেশে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ছিল সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার খানের খাকসার দলের আধিপত্য, পাঞ্জাবে মুসলিম-শিখ-হিন্দু ভূস্বামীদের সমন্বয়ে গঠিত রিপাবলিকান পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা। আর বাংলার মুসলিম লীগ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে শরৎ বসুর সঙ্গে মিলে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও তুলে ধরেছিল অখণ্ড স্বাধীন বাংলার দাবি। নবপ্রজন্মের গবেষক আয়েশা জালাল দেখিয়েছেন যে, মুসলিম লীগ তার সর্বভারতীয় ব্যাপ্তির কারণে মুসলিম জনগণের মুখপাত্র হিসেবে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল; কিন্তু সেই দাবির ভিত্তি ছিল নড়বড়ে। মণিশঙ্কর আয়ারের 'পাকিস্তান পেপার্স' গ্রন্থে দেখা যায় ১৯৪৬ সালের নির্বাচন, যা পাকিস্তানের পক্ষে গণরায় হিসেবে অভিহিত, সেখানে ১৬% মুসলিম ভোট পড়েছিল পাকিস্তানের পক্ষে। আর এটাও তো সুবিদিত যে, পাকিস্তানের পক্ষে যতটুকু রায় প্রদত্ত হয়েছিল তাতে বাংলার মুসলমানদের ছিল বিশাল ভূমিকা।

সবচেয়ে বড় কথা পাকিস্তান জন্ম নিলো দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে, ভারতীয় মুসলমানরা এক পৃথক জাতি, তাদের জন্য চাই পৃথক আবাসভূমি—এই ছিল দাবির মূল কথা। এই দাবির অসারতা সম্পর্কে প্রণেতারাও বোধকরি কিছুটা অবহিত ছিলেন, তাই তারা গোটা দুনিয়ার মুসলমান যে এক জাতি সেটা বলেননি, দক্ষিণ এশীয় মুসলিম কওমের মধ্যে এই দাবি সীমিত রাখতে চেয়েছেন এবং আরো সঙ্কীর্ণ অর্থে ভারতীয় হিন্দুদের বিপরীতে তাদের সত্তা চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ফলে দ্বিজাতিতত্ত্বকে নানা গোঁজামিল দিয়ে চলতে হয়েছে, কিন্তু ভাগ্য ভালো খুব বেশি দিন চলতে হয়নি, মাউন্টব্যাটেনের কল্যাণে ফয়সলার দিনক্ষণ ঘনিয়ে এলো দ্রুতই এবং ভারতের নিরিখে সংখ্যালঘিষ্ঠরা রাতারাতি নবরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হলো, মুসলিম লীগ পেল পৃথক আবাসভূমি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন থেকে পরিস্থিতি গেল পাল্টে এবং এই রাষ্ট্রকে কার্যকর হতে হলে সর্বনাগরিকের সর্বোচ্চ অবদানের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে হবে—এরকম উপলব্ধি জিন্নাহর মতো বুদ্ধিমান ও সফল ব্যারিস্টারের ছিল। ১১ আগস্ট ১৯৪৭ তিনি করাচিতে পাকিস্তান সাংবিধানিক পরিষদে নীতিনির্ধারণী যে ভাষণ দেন সেটা তাই নানা কারণে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। এই ভাষণের মধ্যে জিন্নাহর আরেক সত্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং সম্প্রতি করাচিতে ১১ আগস্টের ভাষণের সেই জিন্নাহকে উদ্ধৃত করে নিজের বিপদ ডেকে এনেছেন ভারতীয় সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি নেতা এল. কে. আদবানি।

পাকিস্তানের জন্মের পেছনে ঐতিহাসিক অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনা জড়িয়ে আছে এবং এর এক বড় কুশীলব হয়ে এলেন স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ, যার ওপর বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। এই কাজ সম্পাদনে সিরিল র‍্যাডক্লিফের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা ছিল তিনি আগে কখনো বাংলা বা পাঞ্জাবে পা রাখেননি। ডিসেন্ট্রি আক্রান্ত র‍্যাডক্লিফ রাত জেগে বড়লাটের অতিথিশালায় কাজ করে কীভাবে দায়িত্ব পালন করলেন তার চমৎকার ভাষ্য রয়েছে ডব্লিউ. এইচ. অডেনের এক কবিতায়। অক্ষম অনুবাদের

চেষ্টা পরিত্যাগ করে বরং উদ্ধৃত করা যায় প্রথম চার পঙ্‌ক্তি: "আনবায়াস্‌ড্ অ্যাট লিস্ট হি ওয়াজ হোয়েন হি অ্যারাইভ্‌ড্ অন হিজ মিশন/হেভিং নেভার সেট আইজ অন দিস ল্যান্ড হি ওয়াজ কল্‌ড্ টু পার্টিশন/বিটুইন টু পিপল ফ্যানাটিক্যালি অ্যাট অড্‌স্/উইথ দেয়ার ডিফারেন্ট ডায়েট্‌স্ অ্যান্ড ইনকমপেটিবল গড্‌স্।"

রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের আত্মপ্রকাশের শুরুর দিনগুলো তার ভবিষ্যৎ বিকাশের ইঙ্গিত বহন করে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্র জন্ম নিলো বটে কিন্তু সেই বাস্তবতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র চলতে পারে কিনা সেটা হয়ে দাঁড়ালো বিশেষ প্রশ্ন। এক্ষেত্রে বড়ভাবে উল্লিখিত হয় ১১ আগস্ট ১৯৪৭ পাকিস্তানের নবগঠিত ব্যবস্থাপক সভায় জিন্নাহ প্রদত্ত ভাষণ, তিনি সেই ভাষণে বলেছিলেন, "সময়ের সাথে সাথে দূর হবে সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর মধ্যকার, হিন্দু ও মুসলিম গোষ্ঠীর মধ্যকার পার্থক্য,—কেননা মুসলমানদের মধ্যেও আপনি পাবেন পাঠান, পাঞ্জাবি, শিয়া, সুন্নি এবং এমনি কতো কিছু, আর হিন্দুদের মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ক্ষত্রিয়, রয়েছে বাঙালি, মাদ্রাজি ও আরো কতো কি—দূর হয়ে যাবে সব।" তিনি আরো বলেন, "আমাদের এই শিক্ষা নিতে হবে... আপনি এখন স্বাধীন, আপনি স্বাধীনভাবে যেতে পারেন আপনার মন্দিরে, যেতে পারেন আপনার মসজিদে, পাকিস্তান নামক এই রাষ্ট্রে উপাসনার যে-কোনো স্থানে। আপনি নির্দিষ্ট কোনো বর্ণ, গোত্র বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, তার সঙ্গে রাষ্ট্রের কার্যক্রমের কোনো সম্পর্ক নেই।... এই মূল নীতির ভিত্তিতে আমরা যাত্রা শুরু করছি যে, আমরা সবাই নাগরিক, এক রাষ্ট্রের সমনাগরিক।"

জিন্নাহর এই ভাষণ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে তার মুসলিম পক্ষপাত মুক্ত করে আধুনিক নাগরিক রাষ্ট্রে রূপান্তর করার আগ্রহের প্রকাশ ঘটিয়েছিল; কিন্তু এই আগ্রহ বাস্তবায়নে যে ধরনের উদারবাদী গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেয়া দরকার সে-পথে জিন্নাহ এগুলেন না। তদুপরি উদারবাদী জিন্নাহর পরিচয় হিসেবে এই যে বিবৃতি দাখিল করা হয় সেখানে নিহিত ছিল একটি বড় সমস্যা যা অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। জিন্নাহ হিন্দু ও মুসলমান বলতে ব্যবহার করেছেন গোষ্ঠী বা কমিউনিটি শব্দবন্ধ, তাঁর তত্ত্বের জের টেনে তিনি বলেননি পাকিস্তানে বসবাস করে হিন্দু জাতি ও মুসলিম জাতি। এর মানে দাঁড়ায়, যে মুহূর্তে টু নেশন তত্ত্ব রাষ্ট্রসত্তা অর্জন করলো অমনি নেশন হয়ে গেল কমিউনিটি। আরো লক্ষণীয়, জিন্নাহ যথার্থভাবে তুলে ধরেছিলেন মুসলমান বা হিন্দু পরিচয়ের মধ্যে বিরাজমান বৈচিত্র্য ও পার্থক্য, একই ধর্ম পরিচয়ের মধ্যকার জাতিগত, আচারগত, বর্ণগত, গোষ্ঠীগত ফারাককে তিনি স্বীকৃতি দিলেন, বললেন মুসলমানদের মধ্যে আছে পাঞ্জাবি ও পাঠান। তবে 'বাঙালি' ও 'মাদ্রাজি' কথাটা তিনি যেভাবে উচ্চারণ করলেন সেখানে পূর্ব ও উত্তর ভারতের মুসলিম নেতৃগোষ্ঠীর মধ্যে অপর জাতিসত্তা সম্পর্কে বিরাজমান ধোঁয়াটে ধারণা এমনভাবে ফুটে উঠেছে যা প্রায় অজ্ঞতার শামিল। 'মাদ্রাজি' বলতে যে জাতিসত্তাকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তারা আসলে তামিল, দ্রাবিড় জাতির অধিকার রক্ষায় পেরিয়ারের দৃঢ় ভূমিকা সত্ত্বেও জিন্নাহ অবজ্ঞাসূচক 'মাদ্রাজি' অভিধা দিয়ে সেই জাতিসত্তাকে চিহ্নিত করেছিলেন। সর্বোপরি

তিনি বাঙালি বলতে বোঝাতে চেয়েছিলেন হিন্দুত্বের সমার্থক জাতিসত্তা, অর্থাৎ পাঞ্জাবিরা মুসলমান, বাঙালিরা হিন্দু। জিন্নাহর জীবনের মহত্তম ভাষণের অন্তর্নিহিত এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব নিয়ে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র তার যাত্রা শুরু করে, তার সামনে বেশ কয়েকটি পথ খোলা ছিল, কোন্ পথ দেশটি নেবে, সে-কি নবগঠিত রাষ্ট্রের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবে, যার প্রতিফলন জিন্নাহর বক্তৃতার প্রথমাংশে, অথবা অজ্ঞতার পথ ধরে এগুবে বাস্তবকে অস্বীকার করে, যা দ্বিজাতিতত্ত্বের মধ্যে নিহিত,—এই ছিল বড় প্রশ্ন।

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হলেন জিন্নাহ এবং সর্বময় ক্ষমতা নিলেন নিজের হাতে, ডিগ্রি জারি করে তিনি যে সাংবিধানিক কর্তৃত্ব নিলেন তার জের ধরেই পরে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ বরখাস্ত করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনকে। ১৯৪৮ সালের মার্চে গভর্নর জেনারেল হিসেবে ঢাকায় এসে রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে জিন্নাহ দম্ভের ঘোষণা করলেন যে, উর্দু, কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই ঘোষণা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলো পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো কোন্ চরিত্র নিতে চলছে, তথাকথিত আধুনিক জিন্নাহর ১১ আগস্টের ভাষণের কবর খুঁড়ে উত্থান ঘটলো দ্বিজাতিতত্ত্বের উদগাতা হিসেবে ধর্মের লেবাসধারী জিন্নাহর, ইসলামের দোহাই দিয়ে এবার তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতিসত্তার অধিকারকে অস্বীকার করতে চাইলেন, এমনকি সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতির ভাষার অধিকার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতনতার পরিচয়টুকু তিনি দিতে পারলেন না।

কিন্তু ইতিহাস যে নিজস্ব গতিতে আপন অসঙ্গতি মোচনের পথ খুঁজে ফেরে তার পরিচয় মিলছিল এর দু-মাস আগে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উত্থাপিত প্রস্তাবে, পরিষদের ভাষা হিসেবে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে স্থান করে দেয়ার এই প্রস্তাব লিয়াকত আলী তথা মুসলিম লীগ নাকচ করে দেয়। এর প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্রসমাজ যে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে সেখান থেকে গ্রেফতার হলেন তরুণ নেতা শেখ মুজিবর রহমান। আরো পরে আমরা দেখি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে সেই রেসকোর্স ময়দানে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবসম্পন্ন ভাষণ প্রদান করেন শেখ মুজিবর রহমান এবং ২৫ মার্চ রাতে ইসলাম-রক্ষক পাকিস্তানী সেনাবাহিনী শুরু করে বর্বর গণহত্যা আর কুমিল্লার বাড়িতে বর্ষীয়ান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে নৃশংসভাবে হত্যা করে ফেলে রেখে যায়। দ্বিজাতিতত্ত্বের মধ্যে সম্প্রদায়গত ঘৃণার যে বীজ বপন করা হয়েছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রবিকাশে তাই পল্লবিত হয়ে বিষবৃক্ষের রূপ নিয়েছিল এবং বিশ শতকের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মুসলিম হত্যাযজ্ঞে অবতীর্ণ হলো পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। দ্বিজাতিতত্ত্ব দ্বারা রাজনীতিতে দ্বন্দ্ব ও হিংসা ছড়াবার যে আয়োজন তার পরিণতিতে পাকিস্তান তিন দশকও টিকতে পারেনি, উদার মানবতাবাদী জাতীয় চেতনার পতাকা তুলে ধরে বাঙালি জনগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ধারাবাহিক নিষ্ঠাবান নেতৃত্বের গুণে অর্জন করে নিলো স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। এই রাষ্ট্রের উদ্ভব উপমহাদেশের রাজনীতিতে ইতিবাচকতার জয় সূচিত করেছিল। অসাম্প্রদায়িক

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল সেই নীতি ইতিহাসের পরীক্ষিত সত্য; কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের বাংলাদেশ স্বয়ং সেই নীতিতে নিষ্ঠ থাকতে পারেনি। অতীত রাজনীতির জের, ভেতরে-বাইরে মহাশক্তির চাপ, বাঙালিত্বের চেতনার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, সুশাসনে ঘাটতি, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমানুষের ভূমিকা সঙ্কোচন ইত্যাদি বিবিধ সঙ্কটের চাপে বাংলাদেশ তার উদ্ভবকালীন প্রতিশ্রুতি থেকে ক্রমে ক্রমে সরে আসতে থাকে। এই পশ্চাদপসারণের পরিচয় মোটা দাগে চিহ্নিত হয়ে আছে বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহে। নাগরিকজনের রাষ্ট্রে ধর্মের নামে বিভাজন তৈরি করলে ধর্ম অথবা নাগরিক কারো স্বার্থই যে জোরদার হয় না সেটা তো এখন বিবিধ সঙ্কটের মধ্য দিয়ে ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা বর্জন করে যেসব সংশোধনী যোগ করা হয়েছে তা রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ক্ষুণ্ন করে মৌলবাদী উত্থানের পথ উন্মোচন করে দেয়। এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অপপ্রভাব সমাজের জন্য বিপুলভাবে ক্ষতিকর হয়েছে। প্রথমত বলা দরকার ঐ সংশোধনী দেশে ধর্মভাব ও ধর্মচেতনা বৃদ্ধিতে বিন্দুমাত্র অবদান রাখেনি, বরং এর ফলে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মের আড়ম্বর প্রকাশের আয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার এবং অপরাধের ব্যাপ্তি এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে, কোনো নৈতিক ও ধার্মিক বোধ থেকে এ-কাজ করা হয়নি। রাষ্ট্রকে সাম্প্রদায়িক অবয়ব প্রদানের সাথে সাথে জাতিসত্তার প্রশ্নেও বিভ্রান্তি ও বিতর্কের জন্ম দেয়া হয় এবং সব মিলিয়ে মুক্তিসংগ্রামী বাঙালি জাতিকে এমন এক সাংস্কৃতিক বিভ্রমের দিকে ঠেলে দেয়া হয় যা দ্বিজাতিতত্ত্ব সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন আবারো সমাজে পাঙ্‌ক্তেয় করতে সচেষ্ট হয়। এর ফলে হাজার বছরের ধারাবাহিক ঐতিহ্য ও জীবনধারার সঙ্গে জাতির সম্পৃক্তি নিবিড় করবার কাজগুলো অবহেলিত ও বর্জিত হয়, এক কৃত্রিম সাংস্কৃতিক সত্তা নির্মাণের জন্য ঢাক-ঢোল পেটানো শুরু হয়। এর একটি বড় ক্ষতিকর প্রভাব হয়েছে এই, বিশ্বায়নের মোকাবিলায় প্রত্যেক সমাজের যে নিজস্ব শক্তি জোরদার করা প্রয়োজন তা আমরা খুইয়ে বসে আছি। আমরা আত্মপরিচয়হীন জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে হালফিল ফ্যাশনকে আধুনিকতা ভেবে আঁকড়ে ধরছি, অথবা বিশ্ববাস্তবতা মোকাবিলার শক্তি হারিয়ে বাহ্যিক ধর্মাচারের মধ্যে আশ্রয় খুঁজছি। নিজ সংস্কৃতির গভীর থেকে যে প্রত্যয় আহরণ করা যায় সেই পথ পরিত্যাগ করে আমরা উদভ্রান্ত সত্তায় পরিণত হয়েছি। এই অবস্থান আমাদের দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতি থেকেও বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে এবং আমরা সংস্কৃতিহীন উন্মূল জাতি হয়ে উঠেছি।

আরেক দিক দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ব্যর্থতা সীমাহীন, যদিও সেটা আলোচনায় তেমনভাবে উঠে আসে না। রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিকজনের সম্পৃক্তি ও অধিকার ক্রমপ্রসার করে চলবার যে সাধনা সেই পথ আমরা বিশেষ মাড়াইনি। একে তো স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে রক্তাক্ত হত্যাভিযান প্রায় মধ্যযুগীয় বর্বরতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার নিকট তুলনা পাওয়া যাবে কেবল মধ্যযুগেই।

তদুপরি প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা করেও আমরা সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। পাকিস্তানের যেমন ফেডারেল রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়বার কোনো বিকল্প ছিল না, বাংলাদেশেরও ক্রমপ্রসারমাণ গণতন্ত্র ছাড়া গত্যন্তর নেই। রাষ্ট্র যে নাগরিকজনের প্রতিষ্ঠান তার রূপায়ণ ঘটতে হবে সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষত বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে আবহমানকাল ধরে যা 'সমাজ' হিসেবে পরিচিত, সেই সম্মিলিত অলিখিত সর্বজনীন তৃণমূল প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতায়ন করা ব্যতীত আমরা গণতন্ত্রের কথা ভাবতে পারি না। সে-কারণে সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে যে পদ্ধতির দেশশাসন প্রক্রিয়া আমরা চালু করেছি তার মধ্যে গণতন্ত্রের উপাদান খুব কম, সংসদ সদস্যরাই হয়েছেন ক্ষমতার অংশভাগ, সেক্ষেত্রেও আবার সরকার-দলীয় সংসদের অংশভাগ প্রায় সর্বাংশে এবং সেই অংশের ওপর বড় ভাগ বসিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় নামক ক্ষমতাকেন্দ্র এবং ক্ষমতার এই বৃত্তায়নের সুযোগ নিয়ে রক্তবন্ধনের গোত্রশাসনের প্রতিচ্ছায়া হিসেবে গড়ে উঠেছে ক্ষমতার এক বায়বীয় বিকল্প কেন্দ্র। ফলে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম জনসম্পৃক্তির জোরে বিজয়ী হলেও দেশ পরিচালনায় তার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি; কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত পথে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত হয়ে সমাজবিকাশ নিশ্চিত করার কোনো সুযোগ বাংলাদেশের সামনে নেই।

নেই যে তার বড় কারণ ইতিহাসের পরিক্রমণ রুদ্ধ হয়ে যায়নি, সমাজবিকাশের অসঙ্গতি মোচনের পথ ইতিহাস তথা মানবসভ্যতা তার নিজস্ব উপায়ে তৈরি করে নেয়। এই পরিক্রমণ যে সদা সরল পথে চলে তা নয়। নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অব্যাহত থাকে পথচলা, প্রত্যাশিত অর্জন হয়তো হাতছাড়া হয়ে যায়, অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে উদগত হয় নতুন সম্ভাবনা, পথিককে তাই সজাগভাবে এগুতে হয়, চলবার সাধনায় সদা ব্রতী থাকতে হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয় উপমহাদেশে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিকৃতি নিরসনে বড় অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ সংগ্রামের পরোক্ষ ফল হিসেবে আমরা দেখেছি পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে প্রাদেশিক স্বশাসনের প্রক্রিয়ার অধিষ্ঠান, পাঠান, পাঞ্জাবি, সিন্ধী, বেলুচিদের প্রাদেশিক অধিকারের স্বীকৃতি দ্বিজাতিতত্ত্বকে খারিজ করে দেয়। যদিও কেন্দ্রীয় শাসনই পাকিস্তানে ক্ষমতার মূল হয়ে আছে তা সত্ত্বেও এই পরিবর্তন ইতিহাসের অমোঘ রায় হিসেবেই গ্রহণ করতে হয়। বাংলাদেশ আরেক বিচারে পাকিস্তানকে তার যৌক্তিক ভিত্তি যুগিয়েছে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে পাকিস্তান তার ভৌগোলিক যৌক্তিকতা অর্জন করেছে, পাকিস্তানী স্কুলবালকদের জন্য তাদের দেশের মানচিত্র আঁকা এখন সহজতর হয়েছে, ভারতের ম্যাপ আঁকবার জরুরৎ তাদের আর থাকছে না। সর্বোপরি পাকিস্তানের সামনে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নিয়ে বিকশিত হওয়ার, নিজ ভৌগোলিক সত্তার মধ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষাভাষী ও জাতীয়তার নাগরিকজনের ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র নির্মাণে এগিয়ে যাওয়ার। এই অগ্রসরমানতার জন্য চাই বহুজাতীয়তার স্বীকৃতি, চাই ভারতকে বহুজাতিক বহুধার্মিক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দান, 'হিন্দুস্তান' হিসেবে বিবেচনার স্থূলতা থেকে সরে আসা। সেই সঙ্গে চাই দক্ষিণ এশীয়

সংস্কৃতির বর্ণিল শোভায় আপন স্থান খুঁজে নেয়া। সামগ্রিকভাবে এর অর্থ মৌলবাদী দাসত্ব থেকে মুক্তি, উদার সহনশীল আবহ নির্মাণ।

আরেক দিক দিয়ে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বে তাৎপর্যময় হয়ে আছে। ১৯২৮ সালে তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে প্রণীত সংবিধানে সেকুলারিজমকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। তুরস্ক ছিল আরবভূমির পশ্চিম প্রান্তের দেশ, আরব ও আনাতোলীয় সভ্যতার মিলনে-মিশ্রণে গড়ে-ওঠা প্রাচীন সভ্যতার এই দেশ আধুনিক রাষ্ট্রনির্মাণের পথরেখা প্রদর্শন করেছিল। তুরস্কের পর মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশ হচ্ছে দ্বিতীয় দেশ যারা রাষ্ট্রের সংবিধানে সেকুলারিজমকে স্থান দিয়েছিল। সেকুলারিজমের ধারণার বাংলারূপ ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে যতো বিতর্ক থাকুক না কেন, প্রকৃত অর্থে এর দ্বারা বাংলাদেশ রাষ্ট্র অসাম্প্রদায়িকতাকেই বুঝিয়েছিল এবং মান্য করেছিল। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশের সেকুলারিজম ছিল অনেক বেশি উপমহাদেশের সংস্কৃতি-ঘনিষ্ঠ, পাশ্চাত্য সেকুলার চিন্তা থেকে পৃথক। ভারতে মোগল শাসনে সর্বধর্মের মানুষের মিলনতীর্থ হিসেবে রাজতন্ত্রের যে ভূমিকা তা সভ্যতার এক উন্নত উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল। মোগল সাম্রাজ্য সহনশীল উদার আবহ গড়ে সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সম্মিলনে অর্জন করে বিপুল গৌরব। বাংলাদেশ রাষ্ট্র সেই ধারায় অসাম্প্রদায়িকতা দ্বারা সকল ধর্মের সমঅধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে সম্প্রীতির এক উন্নত আদর্শ স্থাপন করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সেই অসাম্প্রদায়িক সমাজবিকাশের পথে এগোবার ন্যূনতম সময়টুকুও পায়নি। মৌলবাদী ধর্মান্ধ রাজনীতির সশস্ত্র আঘাতে সংবিধানের সেই উদাহরণযোগ্য সাফল্য ভূলুণ্ঠিত হয়েছে অচিরে। কিন্তু রাষ্ট্রকে যে অসাম্প্রদায়িক হতে হবে, নতুবা সর্বনাগরিকের কল্যাণসাধনে রাষ্ট্র ব্যর্থ হবে, সেটা সমাজ আজ বহুভাবে জানান দিচ্ছে, কি স্বদেশে, কি বিদেশে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালে বিশ্ব ছিল স্নায়ুযুদ্ধের টান টান উত্তেজনায় বাঁধা, যে-কারণে বাংলাদেশের নৈতিক ও মানবিক দাবি পশ্চিম দেশের সরকার কর্তৃক চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল। যে মুসলিম উম্মাহর বাংলাদেশ এখন গর্বিত অংশীদার তারাও তখন পূর্ববঙ্গে মুসলিম-নিধন বিষয়ে ছিলেন আশ্চর্যরকম নিশ্চুপ। একাত্তর পরবর্তী সময়ে বিশ্ব রাজনীতিতে কতক বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, তার জের আমাদেরও বহন করতে হয়েছে। বড় দাগের এইসব পরিবর্তনের একটি হচ্ছে ১৯৭৪ সালের আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের পটভূমিকায় আরব দেশসমূহের নেতৃত্বে ওপেক কর্তৃক তেল অবরোধ আরোপ এবং তার ফলে রাতারাতি আরব দেশের শাসকদের থলিতে স্বর্ণমুদ্রার পাহাড় জমা হওয়া। এই অর্থের একাংশ ব্যয় হতে শুরু করে বিভিন্ন দেশে 'মুসলিম' এজেন্ডার বাহক রাজনৈতিক অপশক্তি পরিপোষণে। বার্মা, ফিলিপাইন ইত্যাদি প্রান্তিক দেশে জঙ্গি গোষ্ঠীর উত্থানের পেছনে ছিল আরব শাসকদের জোরদার সমর্থন। ইসলামী জোশ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ধরনের শাসকদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর পেছনে অর্থ ব্যয়ে প্ররোচিত করে এবং এদের অনেকে আবার দৃশ্যত ছিলেন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, তবে বেশির ভাগ ছিলেন

পশ্চিমের একান্ত বশংবদ। হঠাৎ-ধনী আরব শাসকদের কিম্ভূতাচারের প্রকাশ হিসেবে আমরা দেখি বঙ্গবন্ধু-হত্যাকারী ঘৃণিতজনেরা সাদর অভ্যর্থনা লাভ করে লিবিয়ায়, একাত্তরের ঘৃণ্য ঘাতক মাওলানা (ধিক!) মান্নান সাদ্দাম হোসেনের পক্ষপুটে বরণীয় হন, আর সৌদি রাজতন্ত্র তো জামাতে ইসলামী তোষণে বরাবরই ছিল উদার হস্ত, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে অভিযুক্ত গোলাম আজম পান রাজ-আতিথ্য। তেলের টাকায় একটি পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন শুরু হলো বিভিন্ন দেশের মুসলিম গোষ্ঠীর মধ্যে। পাকিস্তানে জেনারেল জিয়াউল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় কাশ্মিরী মুজাহিদরা জাতীয় অধিকারের সংগ্রামকে আই.এস.আইয়ের মদদপুষ্ট সংগ্রামের রূপ দিলো এবং জঙ্গি সংগ্রামকে জটিল সংগ্রামে রূপান্তর করলো।

কিন্তু উপমহাদেশের রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যের অর্থপুষ্ট ধর্মীয় অভিঘাত বিপুলভাবে সহিংস হয়ে উঠলো সোভিয়েত বাহিনীর আফগানিস্তানে প্রবেশ ও তার বিরুদ্ধে ন্যায়যুদ্ধের আবরণে সৌদি রাজতন্ত্র-পোষিত ওয়াহিবীতন্ত্রের অনৈতিক ও সর্বাত্মক সমর্থনের সুবাদে। আফগান মুজাহিদদের মদদদাতা হিসেবে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাজসাজ রব পড়ে মুসলিম দুনিয়ায়। যারা এতোকাল পেয়ে আসছিল অর্থ, তারা এবার অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের উন্নত সুযোগ লাভ করলো। সি.আই.এ-র প্রত্যক্ষ মদদে সমাজতন্ত্র রুখবার নামে চললো নির্বিচারভাবে ইসলামী সহিংসতার পৃষ্ঠপোষণ। একই সময়ে আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির প্রবল চাপে পার্টি-শাসিত সমাজতন্ত্রের যে বিশাল কাঠামো সেই সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়লো। আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহার হয়েছিল এই সঙ্কটের চাপেই। এমনি পটভূমিকায় হঠাৎ-শক্তিতে বেপরোয়া মুজাহিদদলের মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছিল চরম কট্টরপন্থী তালেবান বাহিনী, তারা যেমন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল আফগানিস্তানে, তেমনি তাদের অস্ত্র ও অর্থের বিপুলা ক্ষমতার ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করলো আফগানিস্তানে জেহাদ করতে আসা বহুবিচিত্র জোশদীপ্ত তরুণদল। এদের একাংশ ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকার বুকে আঘাত হেনে বুঝিয়ে দিলো দুধকলা দিয়ে কোন্ কালসাপ পশ্চিমী শক্তিরা এতকাল ধরে পুষেছিল। প্রশিক্ষণ ও অর্থপ্রাপ্ত অপরাপর গোষ্ঠী নিজ নিজ দেশে ফিরে সহিংস ইসলামের রক্তাক্ত আঘাতে সামাজিক স্থিতি ও সম্প্রীতির বন্ধনগুলো ছিন্নভিন্ন করতে উদ্যত হলো। বাংলাদেশে মৌলবাদী ইসলামের প্রশ্রয়ে এই যে সহিংস ধারা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা হামলা, যাত্রা-সিনেমার দর্শকবৃন্দকে হত্যা, মন্দিরে-গির্জায় হামলা, আহমদিয়াদের মসজিদে আঘাত, এমনকি বাংলার সুফি ইসলামের পীঠস্থানে বোমা হামলা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে এক বর্বর দেশ হিসেবে চিহ্নিত করতে লাগলো। সরকার এবং তার শরীক ধর্মান্ধ গোষ্ঠী প্রশ্রয় ও লালনের নীতির মাধ্যমে এদের নিয়ন্ত্রণে রাখার অভিলাষে মত্ত ছিলেন। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিপক্ষের ওপর সহিংস হামলায় তারা খোশই ছিলেন বলা যায়। শামসুর রাহমান, সনৎকুমার সাহা, হুমায়ুন আজাদের মতো বরেণ্য ব্যক্তিরা যেমন হিংসাত্মক আক্রমণের লক্ষ্য হলেন,

তেমনি আঘাত নেমে এসেছিল শেখ হাসিনার ওপর। এইভাবে ক্রমে ক্রমে ধর্মান্ধ রাজনীতি দেশকে আজ নিয়ে এসেছে সর্বনাশের কিনারে।

ইতোমধ্যে বিশ্ব পরিসরে পরিবর্তনও ঘটে চলেছে বিপুলা। ৯/১১-এর পরে মৌলবাদী অর্থ-সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সচেতন হয়েছে অনেক। তার ফলে দেশে দেশে অর্থ প্রেরণের বৈধ পথ সহজ করে অর্থ চলাচলের ওপর নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। বাংলাদেশেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানাভাবে হুন্ডি ব্যবসা বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছে। পাকিস্তানী জেনারেল দ্বারা সেদেশের মৌলবাদী প্রভাব খর্ব করার ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকীকরণের প্রশ্ন অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করছে। তার জের হিসেবে ভারত-পাক সম্পর্ক স্বাভাবিক ও উন্নত হওয়ার দিকে মোড় নিচ্ছে, কাশ্মিরে সফ্‌ট্ বর্ডার, লিমিটেড সভরেইনিটি ইত্যাদি বিভিন্ন নতুন ধারণার ভিত্তিতে সমাধানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা চলছে। আফগানিস্তানে মার্কিন সৈন্য অবস্থান করছে প্রত্যক্ষভাবে, আঞ্চলিক মৌলবাদের ওপর তাদের কড়া নজর। কিন্তু বাংলাদেশে সরকারি নীতি ও অবস্থান এই নতুন মোড় ফেরার সঙ্গে তাল মেলাতে বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। এর বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে খোদ সরকারের অভ্যন্তরে মৌলবাদের অবস্থান। ১৯৭১ সালে ঘাতক সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আতাঁত করে মৌলবাদীরা একবার ক্ষমতাভুক্ত হয়েছিল, বইয়ে দিয়েছিল রক্তগঙ্গা। এরপর ২০০১ সালে রাজনৈতিক আতাঁত গড়ে শঠতা ও ধোকাবাঁজির পথে তারা আবার বসেছে ক্ষমতায়। ক্ষমতায় তাদের অংশীদারিত্ব বাংলাদেশকে অস্থির অসহিষ্ণু কূপমণ্ডূক দেশে রূপান্তর করেছে। এমনকি বাংলার ইসলামের যে প্রাণধর্ম সেই মরমিয়া সুফি-ঐতিহ্যকেও তারা পদদলিত করছে। সমাজের সর্বত্র তারা বিভক্তি, বিদ্বেষ ও ঘৃণার রাজনীতি সঞ্চার করছে। এই কাজে মৌলবাদী শক্তির নির্ভর হয়েছে আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার হওয়ার দাবিদার দলটি। আধুনিকতার এজেন্ডা নিয়ে ভোটারদের মুখোমুখি হওয়ার যোগ্যতা ও সাহস তারা হারিয়েছে অনেককাল আগে। ফলে এর সঙ্গে ধর্মের মিশেন ঘটিয়ে একটি ডাবল কোলা তারা দেশবাসীকে পান করাতে সচেষ্ট হয়েছে। আর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে দুর্নীতি অবৈধ সম্পদ আহরণে এতাটাই মত্ত থেকেছে যে আশু আগামী নির্বাচনে ধর্মের দোহাই তাদের জন্য আরো জরুরি হয়ে উঠেছে, কেননা নৈতিক শক্তি তারা প্রায় পুরোপুরি খুইয়ে বসেছে। ফলে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না, এমন এক নীতি নিয়ে সশস্ত্র মৌলবাদের মোকাবিলা করতে চাইছে সরকার। এর বিরুদ্ধে জনজাগরণের নানা লক্ষণ আমরা দেখি, বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে মিলনের ও সম্প্রীতির নানা উপাদান আমাদের ভরসা যোগায়, সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দেখি বাঙালি সমাজের সমন্বিত সংস্কৃতির জাগরণের উপায়।

বাংলাদেশ ভাতের সংস্কৃতির দেশ, নদীবাহিত পলিমাটির অববাহিকায় ঝড়-তুফানের সঙ্গে লড়াই করে গড়ে উঠেছে এদেশের মানুষের জীবনধারা। ভাটি অঞ্চলের বিশাল হাওড়ে জলের মৃদুমন্দ দোলা জন্ম দিয়েছে এক ধরনের সঙ্গীত, তার সুর ও ছন্দ ভিন্নতর। আবার

যমুনার চরের বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি প্রান্তরে মহিষের গাড়ির চালকের গান উত্তাল হাওয়াকে ছাপিয়ে জেগে উঠবার আকুতি থেকে অবলম্বন করে ভিন্ন লয় ও তাল। নদীভাঙা অনিত্য জীবন দুই পারের মানুষকে জীবন সম্পর্কে যে নিরাসক্ত দৃষ্টি যোগায় তা বাউলকে করে তুলে মহাজীবনের সন্ধানী, মনোলোকের রত্নসন্ধানী। এইসব মিলেই বাংলা, বাংলার মানস। এই মানসে ইসলাম হয়েছে বিপুলভাবে বরণীয়, সেই ইসলাম তরবারির শক্তিতে নয়, ভক্তিভাবের ধারা বেয়ে পেয়েছে পুষ্টি। এই ধর্মবোধ যে সমন্বয়ের শক্তির পরিচয় দেয়, যে সহনশীল ও উদার চেতনার বাহক, তা বাংলার আবহমানকালের ধারা। এই সংস্কৃতি থেকে জন্ম নিয়েছিল সর্বধর্মবাদী ধারা, বিভিন্ন লৌকিক দেবতা ও ধর্মগুরু, পীর ও আউলিয়া। সহনশীল ও সমন্বিত ধর্মবোধের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হয়ে আছেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ইসলামী সঙ্গীতের যিনি মহত্তম রূপকার, আবার শ্রেষ্ঠতম শ্যামাসঙ্গীতের রচয়িতা। নানা ধর্ম, নানা সম্প্রদায়ের মানুষ যুগ যুগ ধরে বাংলার বুকে নির্ভর খুঁজে পেয়েছে। বাংলার এই ধর্মবোধের সঙ্গে অসাম্প্রদায়িকতার যোগ স্বাভাবিক। তাকে নানাভাবে বিনষ্ট করবার চেষ্টা হয়েছে নানাভাবে। বিশ শতকের মধ্যভাগে দ্বিজাতিতত্ত্ব এমনি এক বিভাজন ও বিনষ্টির সর্বনাশা পথ উন্মোচিত করেছিল। সেই বিচ্যুতি মোচন করে বাংলাদেশের মহান অভ্যুদয়। ইসলামের সহিংস কূপমন্ডুক অমানবিক এক ভাষ্য আবার আমাদের সমাজদেহ আক্রান্ত করছে। আশু রাজনীতিক ফায়দা লাভের জন্য এর সঙ্গে শামিল হয়েছেন অনেকে। কিন্তু সমাজকে তার ঐতিহাসিক ধারাক্রম থেকে বিচ্যুত করবার এই আয়োজন কোনোভাবে সফল হতে পারে না। তবে সেজন্য চাই সাংস্কৃতিক বিকাশের উদ্যোগ, চাই জীবনবোধের প্রসার, ব্যাপক মানুষকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বলয়ে টেনে আনা, তাদের জীবনবিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দেয়া। সেই মুক্ত পথে যাত্রা সূচিত করার সর্বাত্মক আয়োজন এখন জরুরি কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বাঙালি একবিংশ শতকে আপন অবস্থান নিশ্চিতভাবে খুঁজে নেবে, যে অবস্থান দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতিতে তার উজ্জ্বল আসন নিশ্চিত করবে, তাকে দেবে বিশ্বসভায় সম্মানের জায়গা। অতীত ইতিহাসের উত্থান-পতনমুখর ধারাক্রম থেকে আমরা এই উপলব্ধিতে পৌঁছতে পারি।

সাম্প্রদায়িকতা ও রাষ্ট্রীয় দুর্বলতা

বাঙালি কি চিরকাল ঠেলেই যাবে পথের বাধা, মুক্তিপথে এতটুকুও হবে না তার অগ্রযাত্রা? সদর্থক নির্মাণ, সত্যকার বিকাশ কবে আসবে বাঙালির জীবনে, সমাজে? তার জন্য যে সংশপ্তক অক্ষৌহিণী প্রয়োজন, তা কি প্রস্তুত হচ্ছে ঘরে ঘরে!

—ওয়াহিদুল হক, ভোরের কাগজ, ২৬ মার্চ ২০০৪

আকাশ-ছোঁয়া স্পর্ধা নিয়ে উদিত হয়েছিল বাংলাদেশ। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে থাকা ভূখণ্ড, মানুষগুলো স্বাস্থ্যহীন ও রোগাটে, সবার মুখের অন্ন যোগাবার সামর্থ্য কৃষির নেই, শিল্পখাত উৎপাদনে নয় তেমন সবল, অবকাঠামো বলতে বিশেষ উল্লেখ্য কিছুর দেখা মেলে না, সড়ক ও রেল যোগাযোগের যে সাবেকী ব্যবস্থা সেটাও দখলদার বাহিনীর আক্রোশে লণ্ডভণ্ড, তবু সেই দেশের মানুষের কি অসীম প্রাণশক্তি! লড়াই করে পরাভূত করেছে পরাক্রমী এক সেনাবাহিনীকে, অথচ নিজেদের সৈন্যদল বলতে বিশেষ কিছু ছিল না, দাঁড়িয়েছে বিশ্বের মহাক্ষমতাধর রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে, ভরসা কেবল একঘরে ভারত ও ভেটোদানের ক্ষমতার অধিকারী সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত দেশ। মানচিত্রের এক কোণে পড়ে-থাকা এমনি এক দেশের সংগ্রামী মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল গোটা পৃথিবীর শুভ ও কল্যাণকামী মানুষ, স্ব স্ব ক্ষেত্রে কতরকম কর্মকাণ্ডেই না তাঁরা নিয়োজিত হয়েছিল, প্রত্যেকেই পালন করেছিল কিছু না কিছু দায়িত্ব এবং দেশের ভেতরের বাইরের সংগ্রাম মিলে সম্ভব করে তুলেছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

দেশের লড়াকু মানুষদের মনেও ছিল অনেক প্রত্যাশা। পাকিস্তানী দ্বিজাতিতত্ত্ব যে বিষময়তা সঞ্চার করেছিল তার মূল উৎপাটিত হয়েছিল তথাকথিত ইসলামি প্রজাতন্ত্রের উৎখাত ঘটিয়ে। ধর্মের অপব্যবহার দ্বারা যে ভণ্ডামির অবতারণা করা হয় তা থেকে সমাজকে মুক্ত রাখার প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছিল নতুন দেশে। সীমিত সম্পদ নিয়েও যে কল্যাণময় সমাজ গঠন সম্ভব, সেটাই ছিল সকলের প্রত্যাশা।

সেই স্বপ্নময় যাত্রা আজ কোথায় এসে ঠেকেছে তা বিস্তারিত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের অভ্যুদয় আকাশ-ছোঁয়া বটে, তবে প্রতিবিপ্লবী উত্থানে ছাড়খার হয়ে

গেছে সেই স্বপ্ন। এই উত্থান এক দিনে ঘটেনি কিংবা এক নির্বাচনে তা নিশ্চিত হয়ে যায়নি। একদিকে নৃশংস আঘাত হানা হয়েছে বাঙালিত্বের ধারকদের ওপর, সপরিবারে নিহত হয়েছেন রাষ্ট্রের স্থপতি ও কর্ণধার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নিষ্ঠুর হত্যার শিকার হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী চার জাতীয় নেতা কারাগারে বন্দি অবস্থায়, নানা ঘটনায় নানা পরিস্থিতিতে আরো অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রাণসংহার ঘটেছে, অপরদিকে ধীরে ধীরে বিস্তার পেয়েছে অপছায়া, কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে উদার সমাজগঠনের ভিত, জাতি ক্রমে নিজেদের ভাগ করে নিয়েছে সম্প্রদায়ে। পরিণতিতে আমরা এমন এক অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে নিজেকে নিজেই শনাক্ত করতে সক্ষম হচ্ছি না। অগ্রসর লেখক হুমায়ুন আজাদ তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন, '*আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম*' এবং তাঁকে প্রকাশ্যে বইমেলার সম্মুখপথে চাপাতির আঘাতে পাশবিকভাবে আহত করে ঘাতকেরা বুঝিয়ে দিয়েছে কোন্ বাংলাদেশ এখন বাস্তব এবং সে-বিষয়ে প্রশ্ন তোলাটাও কতো বিপজ্জনক।

বর্তমানে যে কূপমণ্ডূক হিংসাত্মক পাশবিক পরিপার্শ্বিকতায় আমরা উপনীত হয়েছি তা গ্রাস করছে সকল সুকৃতি, স্বাভাবিক মানবিক জীবননির্বাহ আমরা নিশ্চিত করতে পারছি না। দুর্নীতি ও দুরাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত যারা তারাই সেজেছে ধর্মের রক্ষক, রাষ্ট্রের কর্ণধার ও সমাজের অধিপতি। বাংলাদেশের জন্য আরো বেশি দুর্ভাগ্যজনক দিক হলো স্বৈরশাসনের উৎখাত ঘটিয়ে যে গণতন্ত্রের অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল সেই আবহের সুযোগ নিয়েই দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছে প্রতিক্রিয়ার শক্তি। উদার অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নির্মাণে ব্যর্থতা দেশকে এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাষায় বর্তমান সঙ্কটকালকে বিধৃত করেছিলেন হুমায়ুন আজাদ, তাঁর গ্রন্থ থেকেই নেয়া যায় উদ্ধৃতি, তাঁর রক্তস্নাত তথাপি অপরাজেয় সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। তিনি লিখেছিলেন:

> আমরা দেশ জুড়ে প্রতিক্রিয়াশীলতা বিস্তার করে চলছি, দেশ থেকে বিজ্ঞানমনস্কতা দূর করেছি। আমরা তরুণতরুণীদের প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলেছি, তারা আর প্রশ্ন করে না।
>
> আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছি; আমাদের বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত জ্ঞানের চর্চা নেই।
>
> আমরা দেশে কোটি কোটি কর্মহীন তরুণতরুণী উৎপাদন করেছি; আমরা তাদের শিক্ষা ও জীবিকার ব্যবস্থা করিনি।
>
> আমরা আমাদের একদল তরুণকে বিদেশে শ্রমিক হিশেবে পাঠাতে মেতে উঠেছি; আমরা হয়ে উঠছি বিশ্বকামলার জাতি।
>
> আমরা তরুণদের ছিনতাইকারীতে পরিণত করেছি।
>
> আমরা ব্যাংক থেকে ৩২,০০০ কোটি টাকা নিয়ে শিল্পপতি, গৃহপতি হয়েছি, জনগণের টাকা নির্বিচারে ছিনতাই ক'রে চলছি।

আমরা শিল্পসাহিত্যকে নষ্ট করেছি; লেখক-বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন রাজনীতিক দলের দালাল, পেছনের সারির কর্মী, এমনকি গুণ্ডা হয়ে উঠেছে।

আমরা রাষ্ট্রধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছি, আর নিরন্তর ঘুষ খাওয়াকে জাতীয় ধর্মে পরিণত করেছি।

ধর্ম দিয়ে আমরা সরল মানুষদের প্রতারণা করে চলছি; আমাদের রাজনীতিবিদেরা হজ-ওমরাকে রাজনীতিক কর্মকাণ্ডে পরিণত করেছে।

আমরা জনগণের কোনো অধিকার দিইনি।

তাদের জীবিকার, শিক্ষার, চিকিৎসার ব্যবস্থা করিনি।

গণতন্ত্রের নামে আমরা স্বৈরাচার চালিয়ে যাচ্ছি।

দুর্নীতিতে আমরা বারবার প্রথম স্থান অধিকার করছি।

এই আমাদের বাঙলাদেশ, এই আমাদের সোনার বাঙলা।

কিন্তু আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম?

এমন দুঃস্থ, দুর্নীতিকবলিত, মানুষের অধিকারহীন, পঙ্কিল, বিপদসঙ্কুল, সন্ত্রাসীশাসিত, অতীতমুখী, প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মান্ধ, সৃষ্টিশীলতাহীন, বর্বর, স্বৈরাচারী বাঙলাদেশ, যেখানে প্রতিমুহূর্তে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়?

সর্বগ্রাসী সঙ্কটের কথা সবিস্তার বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রতিটি নাগরিক তাদের প্রাত্যহিক জীবনের করুণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছেন। সমাজের যারা প্রান্তিক গোষ্ঠী তাদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ, ধর্মীয় কিংবা জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর পীড়নের ব্যাপ্তি গোটা জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবনধারা বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। নারীদের ওপর সামাজিক পীড়ন ও সন্ত্রাস তাদের সুস্থ বিকাশকে রুদ্ধ করছে। কিন্তু সঙ্কটের যে অতলেই আমরা তলিয়ে যেতে থাকি না কেন তারপরও আমাদের তাকাতে হবে ভবিষ্যতের দিকে, সন্ধান করতে হবে মুক্তির পথ, জাগরণের উপায়। সঙ্কট নিয়ে আলোচনায় নিরত হওয়াও আসলে সঙ্কটমোচনের তাগিদেরই প্রকাশ। তাই আমরা এদিকটি আরো গভীর অভিনিবেশ সহযোগে বিচার করে দেখতে চাই। এই বিবেচনায় নিজেদের সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতাকেও শনাক্ত করতে হবে। কেননা বিরুদ্ধ শক্তির সফলতার পেছনে আরো অনেক কারণের মধ্যে নিজেদের ঘাটতিও বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে এবং তা মোচনের ব্যবস্থা নেয়াটাও একইরকমভাবে জরুরি।

তিন দশকের রাষ্ট্র-অভিজ্ঞতা যে নিদারুণ পরিণামের দিকে বাংলাদেশকে টেনে নিয়ে গেছে তা এই ইঙ্গিত অন্তত দেয় যে, বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তায় গুরুতর বিভ্রান্তির অবকাশ ছিল। একথা মানতে হবে যে বাঙালি রাষ্ট্রচিন্তায় বরাবরই ছিল দুর্বল। আরেকদিকে অবশ্য এটাও লক্ষ্য করতে হয়, বাংলার ইতিহাসে কখনোই শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। ভারতে রাষ্ট্রের উদাহরণ হিসেবে সমষ্টি চৈতন্যে অস্তিত্বমান থেকেছে মোগল সাম্রাজ্য, তার একটি কারণ রাষ্ট্রগতভাবে মোগল সম্রাটদের অনেক সাফল্য ছিল। আরেক কারণ ছিল মোগল রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর স্বীয় রাষ্ট্রধারণা চাপিয়ে দিয়েছিল বটে ব্রিটিশরা,

তবে রাজ্যজয়ের পরপরই তারা এটা করেনি। মোগল রাষ্ট্রকাঠামোর অনেকগুলো দিক ব্রিটিশরা দীর্ঘকাল বহাল রেখেছিল। এমনকি রাজভাষা হিসেবে ফার্সি তো টিকে ছিল পলাশির যুদ্ধের পর আরো প্রায় ৭৫ বছর। পক্ষান্তরে মোগল শাসনামলেও বাংলায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ছিল শিথিল এবং সহস্র নদনদী দ্বারা বিভাজিত গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চল ছিল বহুধা-বিভক্ত ও প্রায় স্বশাসিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল নিয়ে বাংলার যে ক্ষমতা বিন্যাস সেখানে কেন্দ্রীয় শাসনের কঠোরতা কখনো কার্যকর ছিল না। এতোই ক্ষুদ্রাকার ছিল শাসনকেন্দ্রসমূহ যে ময়মনসিংহ গীতিকায় আমরা বানিয়াচঙ্গের রাজা কিংবা জঙ্গলগড়ের বাদশার উল্লেখ পাই যাদের আচার-আচরণ কিংবা রাজধারা রাষ্ট্রীয় রূপ থেকে অনেক দূরবর্তী, শক্তিমান ভূস্বামীর অতিরেক কিছু তারা নন। ব্রিটিশ আমলে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তা প্রাচ্যব্যবস্থার ওপর আরোপিত হয়ে যে দ্বন্দ্ব তৈরি করে তার সবচেয়ে কঠোর ও তীক্ষ্ণধী সমালোচক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শক্তিমান কেন্দ্র ছিল এই নতুন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকজনের আনুগত্য ছিল এর চালিকাশক্তি।

অ্যাংলো-স্যাক্সন যে রাষ্ট্রধারণা মোগল রাষ্ট্রচিন্তার ওপর আরোপিত হয়েছিল তার সবচেয়ে নেতিবাচক মিশ্রণ ভারতে রাষ্ট্ররূপ লাভ করেছিল। এই ঘটনার একটি মাইলফলক হিসেবে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদরা চিহ্নিত করেন ১৯১১ সালে দিল্লি দরবার অনুষ্ঠিত করে রাজা পঞ্চম জর্জের অভিষেক-সাধন। বার্নার্ড কোহন (১৯৮৭) একে বলেছিলেন পঞ্চম জর্জের অভিষেকের সমান্তরাল এক মোগল অভিষেক এবং তাঁর বিচারে অনেক ধরনের মোগল আচার অনুসরণ করে ব্রিটিশ রাজের শাসনের পক্ষে ভারতবাসীর অনুমোদন আদায় করা হয়। আরেক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আশিস নন্দীর মতে ভারতের আধুনিক রাজনৈতিক সত্তা গড়ে ওঠার সময়টিতে বাস্তব জীবনে রাষ্ট্রের একমাত্র যে অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করেছিলেন তা হলো রাজকীয় ব্রিটিশ-ভারতীয় রাষ্ট্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন বিরল ব্যক্তিত্ব যিনি এই রাষ্ট্রধারণার বিরুদ্ধে প্রবল অবস্থান নিয়েছিলেন। এমনকি দিল্লি দরবারের সময়ও তিনি এর অন্তঃসারশূন্যতা চিহ্নিত করে লিখেছিলেন যে, দরবার জিনিসটা প্রাচ্য; পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটিকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটাকে নয়। তবে সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা সংহত রূপ লাভ করেনি, আরো পরে এসে তিনি এই পূর্ণতার দিকটিকে আদর্শগতভাবে চিত্রিত করেন এবং পাশ্চাত্য রাষ্ট্রধারণার বিপরীতে প্রাচ্যের সমাজধারণার বিষয়টি উপস্থাপন করে ভিন্নতর রাষ্ট্রকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা মেলে ধরেন। ভারতবর্ষীয় জীবনে রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজের যে বিশেষ স্থান তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করে লেখেন, "রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান; সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে। কিন্তু চীন ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে, তার কারণ সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত।"

ব্রিটিশ শাসনের অবসানে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটলো গঠনগতভাবে তা' ছিল ফেডারেল শাসনের অনুকূল, একক কেন্দ্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের কোনো স্বাভাবিক উপায় সেখানে ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী নিজেদের আধিপত্য নিরঙ্কুশ করে তুলতে চেয়েছিল, এর ফলে রাষ্ট্র ছিল শুরু থেকেই দ্বন্দ্বমুখর এবং এই দ্বন্দ্ব নিরসনে শাসকগোষ্ঠীর অবলম্বন হয়েছিল ধর্ম ও সামরিক বাহিনী, দুইয়েরই অপপ্রয়োগ তারা করেছিল যথেচ্ছভাবে। বাংলাদেশ উত্তরাধিকার সূত্রে যে রাষ্ট্র পেল কিংবা বলা যায় যে রাষ্ট্র-কাঠামো পরিত্যাগ করে তার যাত্রা সূচিত হওয়ার কথা সেটা ছিল আমলাতন্ত্রশাসিত একনায়কী ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। একে গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক আদর্শে ভূষিত করা হলেও রাষ্ট্রের কাঠামোর সংস্কার খুব বেশি কিছু করা হয়নি। ফলে একটি সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও তা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রকদের শক্তিময়তার দিক বিশেষ খর্ব করেনি।

রাষ্ট্রকে শাসনশক্তি হিসেবে নয়, সমাজশক্তির বিকাশের সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করলে আমরা দেখবো বাংলাদেশ রাষ্ট্রে এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো অর্জন আমাদের নেই, বরং রাষ্ট্র ক্রমে সমাজের ওপর চেপে বসে সমাজ শক্তিকে নিঃশেষ করেছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপরিচালন অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই করুণ বাস্তবতার পরিচয় পাই। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নানা সমস্যা জর্জরিত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে যে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিলেন তা রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকতর এককেন্দ্রিক ও ব্যক্তিনির্ভর করে তুলেছিল। সেই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় তিনি সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার পাশাপাশি স্থানীয় সরকার কাঠামো জোরদার করার পদক্ষেপও নিয়েছিলেন, জেলার গভর্নর নিয়োগ ও পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত গভর্নরদের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান-চিন্তা ছিল রাষ্ট্রের বড় ধরনের সংস্কারের দিক। কিন্তু এই পরিবর্তন বাস্তবে প্রয়োগের কোনো সুযোগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাননি। পরবর্তীকালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর বহুল-সমালোচিত সংশোধনী পাল্টানোর প্রয়াস গৃহীত হয়। তবে সেই পরিবর্তনে অগণতান্ত্রিক বিধানসমূহ গণতান্ত্রিক করে নেয়ার পদক্ষেপ বিশেষ গৃহীত হয় না, একদলীয় ব্যবস্থা বাতিল করা হয় বটে কিন্তু কার্যকর বহুদলীয় ব্যবস্থা নেয়া হয় না। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা জোরদার করার প্রশ্ন সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়। সংসদীয় পদ্ধতি পুনরায় প্রচলিত হলেও তা থেকে যায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার আওতায় এবং সরকার হয় রাষ্ট্রপতিশাসিত। সেই সাথে রাষ্ট্রের পশ্চিমী ধারণার উদার দিকগুলো খর্বিত করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের চরিত্র প্রদান করা হয় এবং সংবিধানের প্রস্তাবনার সূচনায় 'বিসমিল্লাহ' সংযোজন করা হয়। সর্বজনের অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে যে-রাষ্ট্র সেখানে একটি ধর্মের প্রাধান্যকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে পাল্টানো হয় রাষ্ট্রের প্রজাতান্ত্রিক চরিত্র। এর জের হিসেবে সমাজে সাম্প্রদায়িক বিভেদ রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য লাভ করে এবং সমাজকে পশ্চাৎমুখী ও হিংসাত্মক দ্বন্দ্বে আকীর্ণ করে তোলে। পরবর্তীকালে একই ধারাবাহিকতায় যুক্ত হয় রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের ধারণা।

অনেক আন্দোলন সংগ্রামের পর ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির শাসনের স্থলে দেশ আবারও সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন করে। তবে এই

সময়ে দলীয় আনুগত্য সংসদ সদস্যদের জন্য একান্ত বাধ্যতামূলক করে সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্বে পরিণত করা হয়। পক্ষান্তরে দীর্ঘ সামরিক একনায়কী শাসন ও রাষ্ট্রপতির আওতাধীন সংসদীয় ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারের অধিকার ও পরিসর ক্রমে ক্রমে খর্ব হয়ে তা কার্যত অকেজো হয়ে পড়ে। ফলে গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন করে যখন সংসদীয় ব্যবস্থা পুনরায় চালু হলো ততোদিনে স্থানীয় সরকার কাঠামো ক্ষমতাহীন ও নির্জীব হয়ে পড়েছে এবং ফাঁকা পরিসরে সংসদ সদস্য বিশেষভাবে সরকার দলীয় সংসদ সদস্যরা ক্ষমতার প্রবল ভাগীদার হয়ে উঠলো। এসব মিলিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা প্রকৃত অর্থে মুষ্টিমেয়ের করায়ত্ত হয়ে থাকে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনো প্রতিফলন সমাজে খুঁজে পাওয়া যায় না। যথাযথ তদারকি ও সংস্কারের অভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া হয়ে পড়ে অর্থ, পেশি ও মাস্তানির জোরে বিজয় ছিনিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া। এই আবহকে ইন্ধন যুগিয়েছে অবাধ বাজার অর্থনীতির এক লুটেরা ভাষ্য যেখানে বাজারে সুষম প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি বজায় রাখার গুরুত্ব নেই, আছে যথেচ্ছভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও লুটপাটের কারবার। এমনি লুটেরা অর্থনীতির সফল কারবারিরা কায়েম করেছে লুটেরা রাজনীতির আসর এবং দুর্বৃত্তায়নকে সামাজিক ধারা হিসেবে মহা-পরাক্রমী করে তুলেছে। যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করছে তারা, পাকিস্তানী আমলের মতো, শুরুতে ব্যবহার করেছিল ধর্ম ও সেনাবাহিনীকে, এখন অবলম্বন হয়েছে ধর্ম এবং খর্বিত খণ্ডিত অনুগত গণতন্ত্র। এই শ্রেণীটি সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও তেমনি এক তরল শেকড়বিহীন বিনোদনকে আলিঙ্গন করেছে, জাতিসত্তার গভীরে প্রবেশের সকল দ্বার রুদ্ধ রাখতে সচেষ্ট রয়েছে।

এই পরিস্থিতি দাবি করছে ব্যাপক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার। এক দশকের 'গণতান্ত্রিক' অভিজ্ঞতা এবং বাঙালির তিন দশকের রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতা এটা সুস্পষ্ট করে তুলেছে যে, নিছক সংসদীয় কাঠামো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো গ্যারান্টি নয়, বরং উপযুক্ত রক্ষাকবচের অনুপস্থিতিতে সংসদীয় ব্যবস্থা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তদের অধিগত হয়ে পড়ে এবং ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীর হেজিমনি প্রতিষ্ঠা করে অধিকাংশজনের জীবন বিপন্ন করে তোলে। বাংলাদেশ আজ তাই এক ব্যর্থ রাষ্ট্রের অভিধা ললাটে ধারণ করেছে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আত্মসাৎ করে গণতন্ত্রের খোলস বজায় রেখে এটা ঘটছে। এহেন পরিস্থিতি আমাদের গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করছে রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে এবং করণীয় হিসেবে ইঙ্গিত দিচ্ছে অধিকতর গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য, যেখানে সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে নির্বাহী ও সিদ্ধান্তমূলক কর্তৃত্ব জোরদার হবে, সমাজ পর্যায়ে নাগরিকজনেরা নিজেদের জীবন নিজেরা বিন্যস্ত করে নিতে পারবে। পাশাপাশি রাষ্ট্রকে উদার ও অসাম্প্রদায়িক আদর্শকে বরণ করে সমাজে সম্প্রীতির আবহ নিশ্চিত করে তুলতে হবে এবং সংবিধানে সেই আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এই মুক্ত আবহে সংস্কৃতিচর্চা ব্যাপকতম করতে গৃহীত সকল পদক্ষেপের প্রতি রাষ্ট্র ও স্থানীয় সরকারের সার্বিক সহযোগিতা বয়ে আনবে সুদূরপ্রসারী ফলাফল।

অবরুদ্ধ গণতন্ত্রকে মুক্ত করে সমাজে নতুন ধারার কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি করতে রাষ্ট্রের সংস্কারের পাশাপাশি প্রয়োজন বহুমুখী সামাজিক উদ্যোগ, সদর্থক নির্মাণের কাজ। এই কাজ সম্পাদনে সবচেয়ে তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করতে পারে শিক্ষা এবং এক্ষেত্রে গুণগত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রভূত সমস্যার মধ্যেও অগ্রগতির পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় যেসব ক্ষেত্রে তার একটি হচ্ছে জনশিক্ষার সুযোগের প্রসার। প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামো দেশব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে। স্কুলগামী বালক-বালিকাদের মধ্যে ৯০ শতাংশেরও বেশি যে শিক্ষাগ্রহণের আনুষ্ঠানিক অথবা উপ-আনুষ্ঠানিক সুযোগ গ্রহণ করছে এর চেয়ে ইতিবাচক ঘটনা আর কী হতে পারে? অথচ এই প্রবণতার সুফল যে সমাজে বিশেষ জমা হচ্ছে না তার বড় কারণ শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা তো যাচ্ছেই না, বরং তা ক্রমেই অতলগামী হচ্ছে। শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু এই সমস্ত বালক-বালিকার মধ্যে বড় অংশ হচ্ছে গ্রামীণ দরিদ্রগোষ্ঠী থেকে আগত, অনেক ক্ষেত্রে নিরক্ষর পিতামাতা সন্ততিদের প্রেরণ করছেন বিদ্যালয়ে এবং তারা প্রথমবারের মতো পরিবারে শিক্ষার আলো হাতে প্রবেশ করছে, অন্তত সে-রকমটিই তো হওয়ার কথা। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যে-গঠন শিক্ষা পরিস্থিতিও তার থেকে ব্যতিক্রমী কিছু হয়নি। শিক্ষার সুযোগ বাড়লেও মানসম্মত শিক্ষার অধিকার সবার অধিগত নয়। অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যেতে পারে মানসম্পন্ন শিক্ষা, তবে অর্থ দিয়ে ক্রয়কৃত এই শিক্ষাও মানবিক চেতনার বিকাশ সাধনের চাইতে অনেক বেশি আত্মসাফল্য নিশ্চিতকারী। ফলে উপরিস্তরে ও নিম্নবর্গীয় পর্যায়ে চলছে দুই ধরনের শিক্ষা, যার কোনোটিই জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নয়। আর দরিদ্রজনদের জন্য শিক্ষা তো কোনোভাবেই চিত্তবিকাশের অবলম্বন হয়ে-ওঠার পর্যায়ে যেতে পারছে না। বাংলাদেশে মেধা এখন জড়ো হয়েছে নগরের জৌলুসপূর্ণ গুটিকয় বিদ্যালয়ে, এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার নগরের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি, আর গ্রামের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দুই কি তিন শতাংশ। এই বাস্তবতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় শিক্ষার সঙ্কট কীভাবে জাতির মেধাবিকাশকে পঙ্গু করে রাখছে। শিক্ষার এই সঙ্কটমোচন, আমরা জানি, কোনো সরকারি সিদ্ধান্তে ঘটে যাওয়ার নয়, তা সেই সরকারের সদিচ্ছা যতোই থাকুক না কেন। এক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন অক্ষৌহণীর, প্রয়োজন তাদের বিপুল কর্মযজ্ঞ যা সংখ্যার অবয়বহীন ভারকে পরিবর্তিত করবে গুণগত সত্তায়।

দেশের সঙ্কট যেমন সর্বব্যাপ্ত, মুক্তির সাধনাকেও তেমনি হতে হবে সর্বব্যাপক। এই লক্ষ্যে যেমন রাষ্ট্রীয় সংস্কার প্রয়োজন, শাসন-ব্যবস্থায় জনকর্তৃত্ব কায়েম জরুরি, তেমনি তৃণমূল স্তর থেকে নানা প্রচেষ্টা, নানা উদ্যোগ-আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। এই বহুব্যাপক কাজে ব্যক্তির সম্পৃক্তি এবং যৌথ প্রয়াস যেমন দরকার, তেমনি প্রয়োজন সৃজনশীলতার উন্মেষ। সমাজের সর্বস্তরে এই সদর্থক কর্মকাণ্ড প্রসারিত করার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও প্রচেষ্টার কোনো বিকল্প নেই। কেননা সংস্কৃতির আসল কাজই তো চিত্তের উদ্বোধন, আর চিত্তের শক্তিতে বলীয়ান মানুষই তো পারবে সৃজনশীলভাবে

প্রতিরোধের অর্গল মোচন করতে। জাতীয় সংস্কৃতির বোধ জাতির অন্তরে পরিব্যাপ্ত করে দেয়ার সাধনা এই পথে আমাদের যোগাবে শক্তি। পথের ইশারাটুকু আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, আমরা বুঝি এই পথ ধরাবাঁধা সড়ক নয়, পথপরিক্রমণ দিয়েই ঘটবে পথ কেটে অগ্রসরমানতা। সরল সমাধানের মধ্যে দেশের মুক্তি নিহিত নেই, সদর্থক নির্মাণের বহু ধরনের কর্মকাণ্ডের যোগ যেমন দরকার, তেমনি প্রয়োজন শাসন পদ্ধতির নতুন বিন্যাস, এর ক্রমাগত পরিবর্তন ও বিকাশ। রবীন্দ্রনাথই তো বলেছিলেন, "দেশের মুক্তির কাজটা খুব বড়ো অথচ তার উপায়টা খুব ছোটো হবে, এ-কথা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাঁকির 'পরে বিশ্বাস, বাস্তবের 'পরে নয়, নিজের শক্তির 'পরে নয়।"

বহুমুখী বৈচিত্র্যময় সেই জাতীয় জাগরণের জন্য চাই অনুকূল রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্র ও শাসনের ধারার ব্যাপক সংস্কার যা সহায়ক বিভিন্ন ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিত করবে। আর চাই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পৃক্তি, অযুত কর্মকাণ্ড যা মানুষের জীবনের সৃজনশীল বিকাশ নিশ্চিত করবে, তার আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটাবে। যে আনন্দময় কল্যাণকর ভবিষ্যৎ ছিল আমাদের রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পেছনকার স্বপ্ন, সবকিছু ধসে পড়লেও সেই স্বপ্ন তো মানুষের মন থেকে মুছে যায় না।

শিশুতীর্থের যাত্রীসকল আবার কি তাদের পথযাত্রা শুরু করবে না? আরো গভীরভাবে অনুশীলন করে, দৃষ্টিকে আরো প্রসারিত করে পথ চিনে পথ চলার প্রক্রিয়া কি কখনো থেমে যেতে পারে কিংবা পারে সরল সমাধানের অলীক মায়ার পেছনে কেবলি ঘুরপাক খেতে?

অসাম্প্রদায়িকতা বনাম ধর্মান্ধতা

ষাটের দশকের জনপ্রিয় এক মার্কিন উপন্যাসের শিরোনাম ছিল, *ইটস অ্যা ম্যাড ম্যাড ম্যাড ওয়ার্ল্ড*। হাস্যরসাত্মক সেই উপন্যাসের শিরোনাম বুঝি একবিংশ শতকের বিশ্ববাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বিশ্বায়নজনিত নিবিড় পারস্পরিক সংযোগ ইত্যাদি মিলে পৃথিবী মানুষের জন্য আরো বসবাসযোগ্য হয়ে ওঠার কথা ছিল। স্নায়ুযুদ্ধের অবসান তো এমন আশাবাদও সঞ্চার করেছিল যে দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্বের বিলুপ্তির ফলে পৃথিবী এগিয়ে যাবে নিরস্ত্রীকরণের দিকে, দুই ক্ষমতাধরের হয়ে আঞ্চলিক যেসব প্রক্সি ওয়ার সংঘটিত হয়েছিল তার আর কোনো পুনরাবৃত্তি হবে না। কিন্তু আমাদের পরিচিত পৃথিবী এবং কাঙ্ক্ষিত ভুবন কতো দ্রুতই না কোন্ অতলে হারিয়ে গেল! এই অতলান্ত অন্ধকারে মানুষের সঙ্গে মানুষের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, জাতির সঙ্গে জাতির মিলনের ক্ষেত্রগুলো সঙ্কুচিত হয়ে বিভাজনের ফাটলগুলো ক্রমেই বড় হয়ে উঠলো। অসহিষ্ণুতা ও ঘৃণার আধিপত্য মানুষের মধ্যে সংহারপ্রবৃত্তি জোরদার করে তুলেছে এবং হত্যা ও রক্তপাত টলিয়ে দিয়েছে বহু শান্ত জনপদ। নতুন এই সংঘাতময় পরিস্থিতিকে 'সভ্যতার সংঘাত' হিসেবে অভিহিত করেছেন মার্কিন তাত্ত্বিক স্যামুয়েল হান্টিংটন এবং তাঁর এই মত পশ্চিমী বিশ্বে বিশেষভাবে নীতিনির্ধারক মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও সমর্থন অর্জন করেছে। মানবসভ্যতার বিপুলা বৈচিত্র্যকে কতক মোটা দাগে চিহ্নিত করে ইতিহাসের টানা-পোড়েন উপেক্ষা করে যে সংঘাতের মতাদর্শ তুলে ধরা হয়েছে তা পশ্চিমী শাসকগোষ্ঠীর আধিপত্যবাদী নীতিকে আদর্শগত ভিত্তির যোগান দেয়, আর তাই তাঁরা এর সোৎসাহ সমর্থক হয়ে উঠেছে। সভ্যতার যে সংঘাতের কথা বলা হচ্ছে তাতে ইরাকের সাদ্দাম হোসেন চিহ্নিত হয়েছেন অগণতান্ত্রিক, প্রজাপীড়ক একনায়ক হিসেবে এবং সে-দেশে গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পশ্চিমা বিশ্ব তথা আমেরিকা-ব্রিটেন আতাঁত এগিয়ে এসেছে ত্রাতা হিসেবে। সভ্যতার সংঘাতের বোলচালের আড়ালে তেল ও মুনাফার ভূমিকা ঢাকা পড়ে গেছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত অমর্ত্য সেনের *আইডেনডিটি অ্যান্ড ভায়োলেন্স* গ্রন্থ সরাসরি স্যামুয়েল হান্টিংটনের তত্ত্বের মোকাবিলা না করলেও এর অসারতা নগ্নভাবে মেলে ধরেছে। অমর্ত্য

সেন জোরের সঙ্গে বলেছেন বৈচিত্র্যের কথা, মানবের বহু সত্তার দিকটি তিনি তাঁর সহজাত অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে সহজ ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষকে কেবল তার ধর্ম, জাতি কিংবা রাষ্ট্র পরিচয়ে চিহ্নিত করা যায় না, প্রতিটি মানুষ আরো নানা সত্তা বহন করে। এই সত্তা জীবনের বিপুল বৈচিত্র্যের প্রতিফলন ঘটায়। জন্মতিথি বিবেচনায় নিয়ে অনেক মানুষ রাশিগণনার ভিত্তিতে নিজেদের কখনো-বা গোষ্ঠীবদ্ধ করে। বাংলাদেশে জেলাভিত্তিক সত্তাপরিচয় দানের রেওয়াজ তো ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত। এই রেওয়াজ এমনই জোরদার যে বিদেশভূমিতে আশ্রয়গ্রহণ করেও এমনি নানা জেলাভিত্তিক সংগঠনে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে স্বস্তিবোধ করেন। আবার ঘটি ও বাঙাল হিসেবে বাংলাভাষী জনগণের বিভক্তি তো বহু পুরনো। এখন যে বিপুল সংখ্যক বাঙালি বিদেশে স্থিত হয়েছে সেই ডায়াসপোরা তো জন্ম দিচ্ছে আরেক ধরনের দ্বৈত সত্তার। সমস্যাটা তাই ধর্মপরিচয়ভিত্তিক সভ্যতার মধ্যে নয়, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং জাতিগত পীড়ন জন্ম দিচ্ছে দ্বন্দ্বের, রয়েছে এর আরো অনেক কারণ। সত্তা-পরিচয়ের বহুত্ববাদকে ক্ষুণ্ন করে যখন কোন একক পরিচয়ে মানবগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তার উপর কথিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয় সেটা বাস্তব থেকে যোজন দূরবর্তী হতে বাধ্য। সত্তা-পরিচয়ের বহুত্বের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বোধ করি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁকে কোনো একক পরিচয়ে চিহ্নিত করাটা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো পরিস্থিতি জন্ম দেয়। যে ধর্ম-পরিচয় সূত্রে নজরুল-বিচারের রাজনৈতিক মতান্ধতা সরকারি-পৃষ্ঠপোষকতায় এখন বিশেষ জোরদার তা সামান্যতম নজরুল-চর্চাতেই খড়কুটোর মতো ভেসে যেতে বাধ্য। এমনকি বিভিন্ন সত্তার পাশাপাশি একক ধর্মপরিচয়ে নজরুলকে চিহ্নিত করার কাজটিও তিনি কঠিন করে গেছেন তাঁর বিচিত্র রচনাসম্ভার ও কর্মধারা দ্বারা। এক গোঁড়া মুসলমান হতবাক হয়ে তাই প্রশ্ন তুলেছিলেন, লোকটা কাফের না শয়তান?

বিশ্বজুড়ে এখন লড়াই চলছে খ্রিস্টিয় তথা পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে প্রাচ্যদেশীয় তথা মুসলিম সভ্যতার এবং মুসলিমবিরোধী অবস্থানে ইহুদিবাদ তথা ইজরায়েলকে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়ে চলেছে পশ্চিম দুনিয়া—এই হচ্ছে হালফিল দুনিয়ার ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনের সরল ছবি। এই তকমা আরোপকে মেনে নিয়ে ইহুদি-নাসারা আতাঁতের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের এক ধরনের মাওলানা-মৌলবীরাও বিশেষ সোচ্চার, প্রতি জুম্মার খোৎবায় কিংবা মিলাদের আসর বা ওয়াজে ইহুদি-নাসারা চক্রের বিরুদ্ধে মুসলিম জাহানের উদ্ধারের জন্য হাঁকডাক বিস্তর শোনা যায়। এর পাশাপাশি ঘটনার আরেক বাস্তব রয়েছে। যে নাসারা শব্দটি প্রচারধর্মে বহুল উচ্চারিত তা বর্তমান ইজরায়েল অধিকৃত পশ্চিম তীরের নাজারেথ শহরের অধিবাসীদের বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। এই শহরের বর্তমান অ্যাংলিকান চার্চের খ্রিষ্টধর্মী আরব বিশপ সম্প্রতি এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে প্রশ্নকর্তার নানাবিধ উস্কানির মুখেও জোর গলায় বললেন, মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা আসলে ইজরায়েল কর্তৃক আরবভূমি দখল এবং প্যালেস্টাইনি তথা আরব জনগণকে পীড়ন ও অপমান থেকে

উদ্ভূত। সেইসঙ্গে তিনি ইতিহাসের আরেক সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, দেড় হাজার বছর ধরে আরব ভূমিতে ইহুদি-খ্রিষ্টান-মুসলমান একত্রে পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে, তাদের মধ্যে কোনো সমস্যা তৈরি হয়নি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ইহুদিদের সংহারের ঘটনা ঘটেছে ইউরোপে এবং ইহুদি-বিদ্বেষে পীড়িতরা আশ্রয় পেয়েছে আরব দেশগুলোতে। বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এই পরিস্থিতি পালটে গেছে রাজনৈতিক কারণে। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো প্যালেস্টাইনে মুসলিম অধ্যুষিত পটভূমিকায় তিনি ইসলামী মৌলবাদীদের কাছ থেকে বিপদের আশঙ্কা করেন কিনা তখন অ্যাংলিকান বিশপ জবাব দিলেন, আমার বড় ভয় খ্রিষ্টান মৌলবাদ তথা ইভানজেলিক্যাল চর্চা নিয়ে। আমেরিকার বিত্তবান এই ধর্মগোষ্ঠী যে ইজরায়েলের চরম অমানবিক কর্মের জোরদার সমর্থক সেটা খ্রিষ্টান হিসেবে তাঁকে বিশেষ পীড়িত করে।

মৌলবাদ যে ইসলামের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য নয়, বরং শান্তির ধর্ম ইসলাম যে অন্য সব ধর্মের মতো মানবিক প্রেম, সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের ওপর জোর দেয়, সেটা জঙ্গি ও হিংসাত্মক ইসলামের বাহকদের কারণে ভিন্নরূপে চিত্রায়িত হয়ে চলেছে। ফলে ইসলামের অভ্যন্তরে একটি দ্বন্দ্ব চলছে, সে-দ্বন্দ্ব ইসলামের কট্টরবাদী ওয়াহাবি ভাষ্যের বিরুদ্ধে তার উদার সমন্বিত বৈচিত্র্যময় ভাষ্যের দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বটা যদি হান্টিংটনের ধর্মপরিচয়ভিত্তিক সভ্যতাগুলোর মধ্যে হতো তবে কট্টরবাদী ইসলামের ধারক-বাহক সউদি রাজতন্ত্র পশ্চিমী তথাকথিত খ্রিস্টিয় সভ্যতার নেতা বুশ-ব্লেয়ারের সঙ্গে এমনি নিবিড় গাটছড়া বেঁধে চলতেন না। অন্তত এ-ক্ষেত্রে তো কোন ক্লাশ অব সিভিলাইজেশন দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে সুফি-ধর্মগুরুদের প্রভাবে চিরাচরিতভাবে যে-ইসলাম প্রসার ও স্ফূর্তি খুঁজে পেয়েছে তা এক সহনশীল উদার ধর্মাদর্শের পরিচয় বহন করে। এই কারণেই পাকিস্তানী তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্রের পীড়নমূলক আধিপত্য ভেঙে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাবে এমন ব্যাপক গণঐক্য গড়ে উঠতে পেরেছিল। বাংলাদেশের মানসগঠনের এই সহনশীল রূপ বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির পরতে পরতে মিশে আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় বাংলাদেশে সুফি ও সমন্বয়বাদী ইসলামের রূপানুসন্ধানে তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা আহমদ মুজতবা জামালের তথ্যচিত্র *সত্যের গহিনে*-এর কথা। ধর্মগুরুদের মাজার ঘিরে যেসব গীত ও আচার পালিত হয় তার বাহ্যিক রূপ নিয়ে অনেক কথা হতে পারে; কিন্তু এর গভীরে যে উদার মানবতাবাদী জীবনচেতনা তার বৈভবে চমৎকৃত না হয়ে পারা যায় না। সেই চিত্র মেলে ধরেছেন জামাল। বাংলার বাউল, সাধারণ নিরক্ষর জনগোষ্ঠী থেকে যাঁদের উত্থান, এই একবিংশ শতকে, হান্টিংটনের সংঘাত তত্ত্বের প্রবল পরাক্রমী যুগে, কী অসাধারণভাবেই না বলে চলেন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান-ইসলাম ধর্মের অন্তর্গত সাযুজ্য ও মিলনের কথা। ছবিতে এর সহজিয়া রূপটি নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলাদেশে জঙ্গি ইসলাম যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও ধর্মগুরুর মাজারে সহিংস বোমা হামলা ঘটিয়েছে সেসব ঘটনা উদারবাদী ধর্মমতের বিরুদ্ধে কূপমণ্ডূক ধর্মাদর্শের পরিচয় প্রকাশ করছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাবকে যারা বরদাস্ত

করতে পারেনি তারা দেশকে কোন্ অতলে ঠেলে দিয়েছে সেটা এইসব ঘটনা দিয়ে বোঝা যায়। অসাম্প্রদায়িক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়বার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি হয়তো অনেক বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে, অনুবাদের মাধ্যমে আহরিত এই শব্দবন্ধ দেশজ অসাম্প্রদায়িক উদারবাদী সমন্বিত ধর্মাদর্শের ইতিবাচকতা জোরের সঙ্গে তুলে ধরতে হয়তো ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু সেজন্য গোটা আদর্শকে বিসর্জন দেয়াটা যে চরম অবিমৃষ্যকারিতা হয়েছে আজকের অসহিষ্ণু ও মৌলবাদ-তাড়িত সন্ত্রস্ত বাংলাদেশ তো সেই সঙ্কট নানাভাবে প্রকাশ করছে। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বনাম একক ধর্মের প্রাধান্য ঘোষণাকারী রাষ্ট্র নিয়ে ধর্মান্ধতার যে-দ্বন্দ্ব তাতে দ্বিতীয় পক্ষের আপাত জয় হয়েছে। এই জয় ধর্মের তথা ইসলামের জয় নয়, এর মাধ্যমে ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী সঙ্কীর্ণবাদী চিন্তার জয় হয়েছে এবং তারা ক্রমে ক্রমে সমাজ ও রাষ্ট্রকে আরো সঙ্কীর্ণতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, অখণ্ড মানবসত্তাকে টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন পরস্পরবিরোধী সত্তায় বিভক্ত করে ফেলছে। এর জের পড়েছে দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের জীবনে, তাদের ওপর পরিচালিত নির্যাতন ও পীড়ন সকল মাত্রা ছাপিয়ে যাচ্ছে। এই অত্যাচার যে কেবল সংখ্যালঘুর ওপর ঘটছে তা ভাবলে ভুল করা হবে। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাবজগতও কলুষিত হয়ে পড়ছে, সমাজের স্বাভাবিক মুক্ত বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের পুজো উৎসবের সময় বিগ্রহ-ভাঙার ঘটনা এখন একেবারে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ফলত পুজো উৎসবের সময় মণ্ডপে মণ্ডপে পুলিশ প্রহরার আধিক্য দিয়ে শান্তি বজায় রাখতে হয়। এটা যে সমাজের উৎসব আয়োজনের স্বাভাবিক সক্ষমতাকে কি নিদারুণভাবে ক্ষুণ্ন করেছে সেটা আমরা ভেবে দেখছি না, পুলিশ সফলকাম হলেও গোটা সমাজ এখানে বিকৃতি দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। এই খণ্ডীকরণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মাচারকেও বিকৃত করছে। বাঙালি মুসলমান চিরকাল 'খুদা হাফিজ' বলে বিদায় সম্ভাষণ জানালেও ওয়াহাবি চিন্তায় তা এখন বর্জনীয় বিবেচিত হয়েছে। মানবজাতির যিনি স্রষ্টা তিনি মানবের প্রার্থনা বহুবিচিত্রভাবে উচ্চারিত হতে শুনবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু পারসিক 'খুদা' শব্দ অনৈসলামিক বিবেচনা করে তা সরকারিভাবে, বেতার-টিভিতে তো বটেই, এখন বর্জিত। জল ও পানিকে একদা হিন্দু-মুসলমানে ভাগ করে নিতে তৎপর হয়েছিল সম্প্রদায়জনিত ভেদবুদ্ধি দ্বারা তাড়িত সাম্প্রদায়িকেরা, এখন শব্দগত সেই বিভাজন উপচে এসে পড়ছে নিজ সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক শব্দব্যবহারে। ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে খুব সামান্য মনে হতে পারে; কিন্তু কূপমণ্ডূকতার কলুষ মানবচিত্তকে কীভাবে বিভ্রান্ত করতে পারে ইসলামের হিংসাশ্রয়ী প্রকাশে আমরা তার নমুনা দেখতে পাচ্ছি। পাশাপাশি এর একটি বড় রকম প্রভাব হিসেবে দেখা দিয়েছে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি নিয়ে সৃষ্ট অরাজকতা ও সহিংসতা। দীর্ঘকাল যাবৎ রাষ্ট্র এক ধরনের সার্কাসের অবতারণা করে এমনি কূপমণ্ডূক ও বর্বর চিন্তাকে প্রশ্রয় যুগিয়ে চলেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশবাহিনী আন্দোলনকারীদের দ্বারা লিখিত 'কাদিয়ানিদের উপাসনালয়' সাইনবোর্ড তাদের মসজিদে ঝুলিয়ে দিয়েছে। এরপর কোনো একদিন হয়তো

মোহাম্মদপুরের শিয়া মসজিদেও তারা উপাসনালয় লেখা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেবে। পাকিস্তানে তো মসজিদ ঘিরে শিয়া-সুন্নি সহিংসতা নিয়মিত ঘটনা হয়ে উঠেছে।

মোদ্দা কথা, সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিলে সেই গহ্বরে নিজেদেরই ক্রমে তলিয়ে যেতে হবে, এর থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই। এই বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা আজ বাড়ছে এবং আমাদের আশপাশে ও আরব-ভূমিতে অনেক ধরনের পরিবর্তন ঘটে চলেছে যা কট্টর ইসলামের কবজা থেকে সমাজের মুক্তির আকুতি বহন করছে। উপমহাদেশের দিকে তাকালেও আমরা পরিবর্তনের হাওয়া অনুভব করতে পারি। ভারতে কট্টর মৌলবাদী হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির বিদায় ঘটেছে ক্ষমতা থেকে। নেপাল রাজতন্ত্রবিরোধী সফল আন্দোলনের পর আনুষ্ঠানিকভাবে 'হিন্দুরাষ্ট্র' হিসেবে পরিচয় প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে 'সেকুলার রাষ্ট্র' ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানে সামরিক শাসক মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপক আয়োজন শুরু করেছে, নারীর অর্থনৈতিক সামাজিক ভূমিকা প্রসারে উদ্যোগ নিয়েছে।

পাশাপাশি আরব দেশের একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। আরব-ভূমিতেও যে পরিবর্তনের দোলা জেগেছে তার প্রতিফলন দেখে এসেছে আমাদের দেশের অগ্রণী নাট্যদল 'ঢাকা থিয়েটার', তারা *বিনোদিনী* নাটক মঞ্চস্থ করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্ষুদ্র রাজ্য ফুজায়রাতে আয়োজিত নাট্য-উৎসবে। অগ্রজপ্রতিম রামেন্দু মজুমদার এবং বন্ধুবর নাসিরউদ্দিন ইউসুফের কাছে শুনেছি তাঁদের নাট্য-অভিজ্ঞতার কথা। *বিনোদিনী* মঞ্চায়ন শেষে ছিল দর্শকদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব। দর্শকমণ্ডলী সর্বাংশে আরবী। তাঁদের প্রশ্নের অনুবাদক হিসেবে কাজ করছিলেন ফুয়াদ আল শাত্তি, কুয়েতের এই নাট্যব্যক্তিত্ব গোটা আমিরাতে নবনাট্যচর্চার প্রেরণা হিসেবে কাজ করছেন। নাটকের কাহিনী, বাংলাদেশের নাট্যরীতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বুদ্ধিদীপ্ত বিভিন্ন প্রশ্নের পর উঠে দাঁড়ালেন কাঁচাপাকা চুলের এক প্রবীণ ব্যক্তি। তাঁর প্রশ্ন শুনে সমবেত সব দর্শক হেসে উঠলো, ফুয়াদ আল শাত্তি বললেন, আমি এই প্রশ্ন অনুবাদ করে দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছি। পরে জানা গেল, প্রশ্নকর্তা জানতে চেয়েছিলেন, বাংলাদেশ তো মুসলিম দেশ, তারা কেন একজন হিন্দু রমণীকে নিয়ে লেখা নাটক মঞ্চস্থ করলো। মানবসমাজকে কেবল মুসলিম আর অমুসলিম হিসেবে যারা ভাগ করে দেখে, মানুষ দেখতে পায় না, তারা আরব বিশ্বে ক্রমে উপহাসের পাত্রে পরিণত হচ্ছে, ফুজায়রার নাট্যসন্ধ্যা সেই বাস্তবতার প্রকাশ ঘটিয়েছে।

আমার জন্য আরেক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল যখন সারজা প্রত্যাগত রামেন্দু মজুমদার শোনালেন সেখানকার সুলতান প্রদত্ত ভোজসভার কথা এবং আমাকে পড়তে দিলেন উপহার হিসেবে পাওয়া সুলতান রচিত গ্রন্থ। বিলেতের প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা রাউটলেজ প্রকাশিত গ্রন্থের নাম *দি মিথ অব অ্যারাব পাইরেসি ইন দা গালফ্*। নাম থেকে বোঝা যায় এটা কোনো রাজপুরুষের শখ মেটানোর গ্রন্থরচনা নয়; আর বই পাঠে বোঝা যায় এ হচ্ছে তীক্ষ্ণ ইতিহাসবোধসম্পন্ন গবেষকের পরিশ্রমী কাজের মাধ্যমে ইতিহাসের পুনঃপাঠ তৈরি।

বিলেতের এক্সটার বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেছেন সুলতান, কাজ করেছেন বোম্বে আর্কাইভসে, এই দ্বিতীয় ক্ষেত্র থেকে তিনি উদ্ধার করেছেন বহু নথি ও তথ্য যার ভিত্তিতে পারস্য উপসাগরে জাহাজ চলাচলের ইতিহাস নতুন আলোকে লিখতে পেরেছেন। ১৭২০ থেকে বোম্বে কুঠির নথি সংরক্ষণ শুরু হয়। ১৭৫৫ থেকে ব্রিটিশ সরকার কোম্পানির কাগজপত্র সংরক্ষণে বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সেই সময়ে থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত বহু নথি সংরক্ষণ করে বোম্বে আর্কাইভস্। পরবর্তী দলিল চলে যায় বিলেতে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে। সুলতান উদ্ধারকৃত দলিলপত্র থেকে মহীশুরের টিপু সুলতানের বাণিজ্যিক ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাত বিকাশে দূরদর্শিতার বহু পরিচয় মেলে, আরো পাওয়া যায় বাংলা থেকে জাহাজে চালানকৃত মালের অনেক বিবরণ। সর্বোপরি যে মিথ সুলতান খণ্ডন করেছেন তা হলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজ স্বার্থে আরব জলদস্যুদের নামে মিথ্যা অপবাদ তৈরি করেছিল এবং তাদের দমনে রাজকীয় নৌবাহিনী ব্যবহার করে আসলে উপসাগরীয় এলাকায় নিজেদের বাণিজ্য স্বার্থ পাকাপোক্ত করে। আরবভূমিতে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের নতুন ধারার প্রতিনিধিত্ব করছেন সারজার সুলতান মোহাম্মদ আল কাসিমি, আর এসবই তো পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ।

কিন্তু আমরা কি করছি? আমরা আমাদের সমৃদ্ধ লোকনাট্যধারা যাত্রা মঞ্চায়নকে কার্যত রুদ্ধ করে রেখেছি। ফরিদপুরে নারী পাচারবিরোধী নাটক *কথা কৃষ্ণকলি* মঞ্চায়ন নিষিদ্ধ করে জোট সরকারের মদদপুষ্ট গোষ্ঠী এর তরুণ পরিচালক, নাট্যকার ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে লেলিয়ে দেয়। কূপমণ্ডূক ধর্মচিন্তা সমাজে উদারবাদের কোনো অবকাশ রাখে না।

ফলে বাংলাদেশে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব ধর্মহীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার নয়, যেটা প্রমাণ করতে মৌলবাদীরা সদা উদগ্রীব থাকে। এই দ্বন্দ্ব অসাম্প্রদায়িকতা বনাম ধর্মান্ধতার। বাংলাদেশের মানুষের সমন্বয়বাদী সহনশীল ধর্মচিন্তায় কূপমণ্ডূকতার কোনো স্থান কখনো ছিল না। বাইরের মদদপুষ্ট হয়ে ধর্মের লেবাসধারীরা ইসলামের রক্ষক সেজে অসাম্প্রদায়িক উদারবাদী চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করছে। আধুনিক উদারবাদী রাষ্ট্র ও সহনশীল সমাজ নির্মাণ ছাড়া বাংলাদেশের বিকাশ সম্ভব নয়, এটা আমরা যতো শিগগির অনুধাবন করতে পারবো ততোই মঙ্গল।

না দাঙ্গা, না রক্তপাত: কালিয়াকৈর শান্তি-কল্যাণ হয়ে আছে

কালিয়াকৈর বাজার থেকে আমরা ধরি ভেতরের পথ, তারপর গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা, একেবেঁকে চলে গেছে গ্রামপথের রীতি অনুযায়ী। গাড়ি নিয়ে চলা অসুবিধাজনক হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। তবে সমস্যা হচ্ছিল নৌকার কারণে। যদি বলা হয় নৌকার কারণে গাড়ি নিয়ে চলা দায় হয়েছিল, তাহলে অনেকে নিশ্চয় কৌতুক বোধ করবেন। কিন্তু বাস্তবতা ছিল এটাই, রাস্তার ধারে কিছু পরপরই কাত করা রয়েছে নির্মীয়মাণ নৌকা, খুটখাট কাজ করছেন নৌকার মিস্ত্রি, কয়েক শত বৎসর ধরে বংশপরম্পরায় যে কাজ তাঁরা করে আসছেন। গাড়ি আসছে দেখে নৌকা টেনেটুনে তারা পথ করে দিচ্ছিলেন। অবশেষে আমরা সদলবলে পৌঁছাই সীমাইরপার গ্রামে, গাজিপুর জেলার প্রান্তবর্তী টাঙ্গাইল-সংলগ্ন এক নিস্তরঙ্গ গ্রাম।

আমরা এসেছিলাম 'নাগরিক-অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা-প্রতিরোধ কমিটি'র পক্ষ থেকে দেশের এক বিপুলাংশ মানুষের জীবনে সৃষ্ট বিপন্নতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর করতে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ড. মুশররফ হোসেন, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক অজয় রায়, অভিনেতা আলী যাকের, কবি-সাংবাদিক সোহরাব হাসান, সাংস্কৃতিক জোটের গোলাম কুদ্দুছ, মহিলা পরিষদের কাজী সুফিয়া আখতার ও আরো কয়েকজন। সীমাইরপার গ্রামের অধিকাংশ মানুষ তথাকথিত সংখ্যালঘু, হিন্দু ধর্মাবলম্বী, পেশায় সূত্রধর অর্থাৎ কাঠের কাজে নিয়োজিত। পেশার কথা বলতে গিয়ে মলিনবসন দরিদ্র এই মানুষগুলোর মুখে হাসি ফুটে ওঠে, বলে বুড়িগঙ্গায় যতো কোশা নৌকা আপনারা দেখেন তার সত্তর ভাগ আমাদের হাতে তৈরি। এই অঞ্চলে কাঁঠাল গাছের কাঠ ভালো মেলে, আর নিকটবর্তী তুরাগ গিয়ে মিলেছে বুড়িগঙ্গার সাথে। ঢাকা থেকে আমরা আধুনিক সড়কপথে এলেও যুগ-যুগান্তের একটি জলপথে যোগাযোগ ঢাকা ও সীমাইরপার গ্রামের রয়েছে। এমনকি দূর অতীতে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা আসার জন্য নৌপথ ব্যতীত ভিন্ন অবলম্বন ছিল না, আর সে-পথও ছিল এই তুরাগ অবলম্বন করে। আজও তাই এখানকার তৈরি নৌকার ঢাকায় পৌঁছতে বিশেষ ক্লেশ বা বিলম্ব হয় না।

এমন এক গ্রামের সূত্রধর বাড়ির চত্বরে বসে আলাপচারিতার সময় শাশ্বত বঙ্গের প্রবহমাণতা অনুভব না করে পারা যায় না। তবে চিরায়ত এই জীবনধারায় সমকালের নির্মম ঘটনাধারা তার যে দংশন এঁকে যাচ্ছে সেটাও তো অনুভব না করে উপায় নেই। সীমাইরপার গ্রামে কোনো ঘরে আগুন লাগেনি, কেউ ধর্ষিত হয়নি, রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করেনি। অথচ আপনাদের এলাকায় নির্বাচন ও নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি কেমন ছিল এমন প্রশ্নের জবাবে সবাই যেন মূক, নির্বাক হয়ে গেল। এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তারপর একজন ঘাড় বাঁকিয়ে মাটির দিকে চোখ রেখে বললো, না, আমাদের এখানে কোনো গণ্ডগোল হয়নি, গণ্ডগোল নেই, আপনারা চলে যান। তাঁর কথার সুরে আবৃত রয়েছে যে-বক্তব্য, খোলস ভেঙে তার স্বরূপ উন্মোচন সহজ কাজ নয়। তবু এ-কথা সে-কথার সূত্রে যা জানা গেল তা নিঃসন্দেহে দাঙ্গা বা রক্তপাতের ঘটনা নয়; কিন্তু দৈনন্দিন পীড়ন ও অত্যাচারে নীরব রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে একটি সম্প্রদায়ের জীবনের আলো নিভে যাওয়ার বাস্তবতা প্রকাশ করে। যেমন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তুরাগ নদীর প্রবাহ, নদীতীরে চেপে-বসা বাণিজ্যকাজের চাপে নদী হারাচ্ছে স্বাভাবিক ছন্দ, তেমনি নদীতীরের এই বসতগুলো ক্রমে তাদের জীবনছন্দ হারিয়ে বিলীন হওয়ার শঙ্কায় দুলছে। যা ঘটেছে গুরুত্বে তা খুব সামান্য, গালিগালাজ কটুমন্তব্য তাদের অহর্নিশ শুনতে হয়েছে এলাকার ধানের শীষ প্রার্থীর পরাজয়ের কারণে। পাড়ার এক মধ্যবয়েসী পিতা, যিনি কিছুটা নেতৃত্বদানের ক্ষমতা রাখেন, 'কাকা' বলে সম্বোধন করে তাঁর ঘরে ঢুকে, স্ত্রী ও সন্তানদের সামনেই, বেদম প্রহার করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দল। লুঙ্গি ও গেঞ্জিপরা কালো ছিপছিপে শরীরের মধ্যবয়সী এই মানুষটি যখন সে-কথা বর্ণনা করেন তখন বোঝা যায় মারের চেয়ে অপমানটাই তাঁর মনে বেজেছিল বেশি করে। স্ত্রীর কাছে স্বামী পরম আরাধ্য, কন্যার কাছে পিতা পরম প্রতাপশালী, সেই স্বামী বা পিতাকে তাঁরই আপন গৃহে যখন কয়েকটি চ্যাংড়া ছেলেছোকরা যথেচ্ছভাবে কিলচড় কষিয়ে, যেন কোনো চোরকে প্রহার করছে, বুঝি-বা পরের দেশে পরের ভোট চুরি করেছে, তারপর শাসিয়ে বিদায় নেয়, তখন সেই ব্যক্তির মানুষ হিসেবে ন্যূনতম সম্মানটুকু কোন্ ধূলিতে মিশিয়ে দেয়া হয়! এক বাড়ির কর্তার এই অপমান দশ বাড়িতে সঞ্চারিত হতে তো বেশি সময় লাগে না। ফলে বিহ্বল গোটা সম্প্রদায় অনেকটা নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের সামনে, কীভাবে কোন্ কথা বলবে দিশে না পেয়ে। দুর্গতির দিনে তাঁরা কাউকে খুঁজে পায়নি কাছে, তাঁদের পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ ছিল না। এলাকার নির্বাচিত সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ দলের রহমত আলী তাঁকে ভোট দিয়ে বিপদগ্রস্ত মানুষের কাছে মোটেই আসেননি। প্রতিকূল পরিবেশে তাঁদের যদি রক্ষা করতে না পারতেন, অন্তত তাঁদের বেদনার সমব্যাথী তো হতে পারতেন তিনি এবং সেটাও হতো এই দুঃখদিনে সীমাইরপারের সূত্রধর সম্প্রদায়ের জন্য বড় ভরসা। ফেরার আগে, সবার হয়ে, তাঁদের একজন চেপে ধরলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের হাত; বললেন, যদি আমাদের কিছু উপকার করতে চান তবে ভোটার তালিকা থেকে নাম তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করুন, আমরা

আর ভোট দিতে চাই না। নাগরিক-অধিকার সংরক্ষণে সঙ্কল্পবদ্ধ মানুষজনের এবার নির্বাক হওয়ার পালা। এক গোটা সম্প্রদায়ের মানুষের নিজ অধিকার বিসর্জন-দানে এমন উদগ্র কামনার পেছনে যে গভীর ও নীরব বেদনা জড়িত তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে আর কীই-বা বলার থাকে?

দুই.

এর পরের গন্তব্য পালপাড়া। তুরাগের ওপর নির্মিত সেতুর কোল ঘেঁষে পালপাড়ার শুরু। চিরাচরিত বাংলা এই পাড়ার মধ্যে এখনও যেন সজীব হয়ে রয়েছে। পালবাড়িতে অনুসৃত আচার অনুযায়ী ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ কেউ বসে নেই। এই মুহূর্তে বাড়িতে অবশ্য পুরুষের সংখ্যা কম, তাঁরা বাজার-হাট কিংবা বাইরের কাজে গেছেন। বর্ষীয়ান মা, মধ্যবয়েসী বধূ, কিশোরী বালিকা সবাই নীরবে কাজ করে চলেছে, কেউ মাটি ছেনা, কেউ পাত্র শুকানো আর কেউ-বা করছেন উনুনের কাঠখড় গোছানোর কাজ। নিতাই পাল আমাদের নিয়ে বসেছিলেন দাওয়ায়, অকপটে বললেন ভোটটা তিনি দিয়েছিলেন ধানের শীষ মার্কায়, প্রার্থী তানভীর আহমেদ সিদ্দিকী হাজার হলেও তাঁদের জমিদার। কবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে জমিদারি প্রথা, প্রজার সঙ্গে জমিদারের নেই কোনো প্রত্যক্ষ সামাজিক কি অর্থনৈতিক সম্পর্ক, তবু অনুগত প্রজা ভুলতে পারে না তার দায়। এই এলাকায় ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ধুতি পরে মিছিল করেছিল কারা জানতে চাইলে নির্দ্বিধায় বলেন তারাই সেটা করেছিলেন। তারপর ঈষৎ হেসে কবুল করার মতো করে জানান, সহিংস বিভিন্ন ঘটনার পর তাকেই সরকারি দলের পান্ডারা ধুতি পরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল স্থানীয় প্রেস ক্লাবে, তিনি উপস্থিত সবাইকে বলেছেন কালিয়াকৈরে সবকিছু শান্তি-কল্যাণ হয়ে আছে। শান্তির এই বার্তাবাহক নিজে অবশ্য ভালোভাবেই জানেন কোন্ দেশে কোন সমাজে তিনি এখন কোন্ শান্তি ভোগ করছেন। বাজারে বড় চায়ের দোকান বেদখল হয়ে গেছে, লুটপাট ঠেকাতে নিম্ন আয়ের মানুষদেরও বিবিধ অর্থদণ্ড দিতে হয়েছে, বাজার-সংলগ্ন জায়গায় যাদের বাস তাঁরা বসতভিটা রক্ষা করতে পারবেন কিনা তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত, বেশ কিছুদিন পালপাড়ার মানুষ বাজারমুখী হননি, বাজারে গেলে মারধর ছিল অবধারিত পাওয়া।

পালপাড়ায় যা ঘটেছে সেসব সংবাদপত্রের ছোট খবর, ইতিহাসের পাতায় কখনো তার ঠাঁই হতে পারে না, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণের মতো বড় আকারের সংঘাত সংঘর্ষও এ নয়। সদ্য আমেরিকা ঘুরে এসেছে বর্তমান নিবন্ধকার। টুইন টাওয়ার ধূলিসাৎ হওয়ার সপ্তাহকাল পরের নিউইয়র্ক শহরের অবাস্তবতার মধ্যেও নাগরিক অধিকারের যে প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল তার সঙ্গে নিজেদের অবস্থানের তুলনা টানার লোভ সংবরণ দায়। নিউইয়র্কের ট্যাক্সিচালকদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা এখন নেহায়েৎ কম নয়। উপমহাদেশসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মুসলিম ট্যাক্সিচালকের দেখা হর-হামেশাই মিলবে। ১১ সেপ্টেম্বরের

পর অনেক যাত্রী মুসলিম ট্যাক্সিচালকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে এবং তারই প্রতিকার হিসেবে দেখা গেল ট্যাক্সিচালক সমিতির পক্ষে টেলিভিশনে ও বিভিন্নভাবে যাত্রীদের সাবধান করে দেয়া হচ্ছে এমনি আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য। যাত্রীদের যেসব আচরণ গর্হিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে কটুমন্তব্য তর্কবিতর্ক করা ছাড়াও বলা হয়েছে, বিরক্তি প্রকাশ করে কোনো যাত্রী যদি নামার সময় সজোরে ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করেন তবে সেটাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। মার্কিন সমাজের অনেক অসঙ্গতির মধ্যেও নাগরিক অধিকারের, এ-ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ট্যাক্সিচালকদের অধিকারের, এমনি স্বীকৃতির পাশাপাশি পালপাড়ার নিতাই পালের অধিকারের সীমানা নিয়ে মনে অনেক কথা খেলা করে।

মনে পড়ে জমিদার বংশের সুসন্তান চৌধুরী তানভীর আহমদ সিদ্দিকী তো অনেক দেশ ঘুরেছেন, জ্ঞানের অনেক পাঠ নিয়েছেন, ধানের শীষে ভোটদাতা কিংবা ভোট না-দাতা এলাকার নির্বিশেষ নাগরিকের অধিকারের মাত্রা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা এবং সক্রিয়তার একটি পরিমাপ কি আমরা পেতে পারি!

বিদায়ের আগে আমি গৃহকর্তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম মাটির পুতুল পালবাড়িতে তৈরি হয় কি না। সোৎসাহে হাঁক দিলেন তিনি, আর তাঁর স্কুল প্রত্যাগত কিশোরী বালিকা ঘর থেকে এক গুচ্ছ পুতুল এনে আমার হাতে তুলে দিল উপহার হিসেবে। মহেনজোদারোতে প্রাপ্ত মাটির পুতুলের সঙ্গে এইসব টেপা পুতুলের সাদৃশ্য বিস্ময়ের সঞ্চার করে। কালিয়াকৈরের পালপাড়া বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে, উপমহাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে, মানবসভ্যতার ধারাবাহিকতার সঙ্গে কীভাবে কোন্ অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে আমরা কি তা' বুঝি! নিতাই পালদের উৎখাত করে আমরা সংস্কৃতির কোন্ শেকড় উৎপাটিত করছি সেসব কি জানি! বস্তুত সংস্কৃতি নিয়ে যে বিভ্রম আজ সঞ্চার হচ্ছে তা' কি লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্কট, নাকি আমাদের তথাকথিত নাগরিক পরিশীলিত সংস্কৃতির অবদান? মনে পড়ে ধানের শীষ প্রার্থী তানভীর আহমদ সিদ্দিকী বন্ধুমহলে 'নেপো' নামে পরিচিত, এই নেপোর সঙ্গে অবশ্য দইয়ের কোনো সম্পর্ক নেই, পিতৃদত্ত ডাক নাম নেপোলিয়নের অপভ্রংশ এটি। বলিয়াদির জমিদারদের বংশধারা হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রাঃ) থেকে প্রবাহিত হয়েছে বলে দাবি করা হয়। দেখা যাচ্ছে তাঁদেরই এক অধস্তন পুরুষ ইতিহাসের আরেক বীর নেপোলিয়নের শৌর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নামে পুত্রের নামকরণ করেছেন। এই পরিবারের পরবর্তী জীবনে আবার প্রভাব পড়েছে বিশ শতকের পঞ্চাশের ও ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয় চেতনার জাগরণী কর্মকাণ্ডের, তাঁর ভগিনী পুত্রের নাম রেখেছেন অজেয় রোহিতাশ্ব আল-কাজী এবং অম্লান নীলাভ্র আল-কাজী, আরবি নামের এই বাংলা রূপান্তরে অনেকে হিন্দুয়ানির ঘ্রাণ পেতে পারেন, ঠিক যেমন পাবেন ইন্দোনেশীয় মুসলমানদের নামে প্রাক-ইসলামী ঐতিহ্যের প্রভাবে। আজ এই পরিবার রাজনৈতিকভাবে ভিন্নতর এক আদর্শের প্রতি সমর্পিত রইলেও ইতিহাসের বিচিত্র গতি তো পারিবারিক ইতিহাসেও ছাপ রেখে গেছে। একদিকে জমিদার বংশের

ইতিহাসে পরিবর্তনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, আরেকদিকে দরিদ্র শতচ্ছিন্ন পালকুটিরে হাজার বছরের সভ্যতার গুঞ্জরিত হয়ে ওঠা—এর মধ্যে গুরুত্বের আসন কাকে দেব সে-বিচার কি খুব সহজ। উত্তর না-জানা প্রশ্নের বোঝা মাথায় নতমস্তকে আমি বেরিয়ে আসি পালবাড়ি থেকে।

তিন.

এরপর আমরা যাই তুরাগ তীরের গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু বাড়িতে। দেয়াল দিয়ে ঘেরা পাকা দালানের সংখ্যা এখানে একাধিক এবং বেশ কয়েক পরিবারের বাস। বাড়িতে একান্নবর্তী পরিবারের আবহ বজায় রয়েছে, তবে বোঝা যায় পৃথকন্নের ব্যবস্থাও পাশাপাশি সচল। পরিবারের প্রধান বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অন্যরা মূলত ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, তাঁদের বিশেষ কাউকে এ-সময়ে ঘরে পাওয়া গেল না। মহিলা পরিষদের নেত্রীদ্বয়ের সুবাদে ঘরের মহিলাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথা বলার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। পরিবারের পুরুষ সদস্যদের ব্যবসাস্থলে বিড়ম্বনার কথা তাঁরা জানেন, তবে সবিস্তারে বলতে পারগ নন। নির্বাচনের পরের সন্ধ্যায় মিছিল করে লোকজন এসে বাড়ির ফটক ভাঙবার চেষ্টা করে, ইট-পাটকেল ছুঁড়ে এবং এরপর মহিলাদের সবাইকে সরিয়ে নেয়া হয় ঢাকা কিংবা টাঙ্গাইলে। পরিস্থিতি কিছুটা থিতিয়ে এলে পালিয়ে যাওয়া মহিলারা ফিরে এসেছিলেন ঘরে। যে কিশোরী মেয়েটি অতিথিদের জন্য সোৎসাহে চা বানিয়ে আনছিল, এবার সে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এক বিরূপ পটভূমিকায় তার সুন্দর মুখশ্রী সবার মনে উৎকণ্ঠা না জাগিয়ে পারে না। অধ্যাপক অজয় রায় জানতে চাইলেন, মা তুমি কোথায় ছিলে? জবাবে কিশোরী দ্বিধাহীনভাবে জবাব দিল, আমি এখানেই ছিলাম। তাঁর এই জবাবে আগত অতিথিজনের মনে সঙ্গত জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে, বাড়ির সব মহিলা পালিয়ে গেলেও এই কিশোরী কীভাবে রয়ে গেল! তাঁর এক মাসীমা ধমকের সুরে বলে উঠলেন, তুই না ঢাকা পালিয়ে গিয়েছিলি। কিশোরী এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে স্পষ্টভাবে বললো, আমি কোথাও পালাইনি, পরীক্ষা শেষে ঢাকা বেড়াতে গিয়েছিলাম, বেড়ানোর পর আবার বাড়িতে ফিরে এসেছি।

বাড়ির সবাই যখন ঘর ছেড়ে পালাল তখন পরিবারের কিশোরী সদস্যাকেও তাঁরা সঙ্গে করে নিয়েছিলেন, কিন্তু আপন ঘর থেকে এমনি পলায়নের বাস্তবতা এই কিশোরী কোনোভাবে মেনে নিতে রাজি নয়। পালাতে সে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু পলায়নের গ্লানি মেনে নিতে সে বাধ্য নয়, তাই তো অমন বলদর্পীভাবে কিশোরী বলতে পারলো, না আমি পালাইনি, আর দশটা স্বাভাবিক কিশোরীর মতো আমিও পরীক্ষা শেষে ঢাকায় গিয়েছিলাম আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে।

ঘটনা খুব সামান্য, কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে অসামান্যের রেখাপাত, আছে প্রতিরোধের বীজমন্ত্র, সবাই বাস্তবতা মেনে নিলেও আছে এক জেদি কিশোরী যে কিছুতেই খাঁচাবদ্ধ হবে না, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বলবান ইচ্ছার কবলে পড়ে সংখ্যালঘু হিসেবে নিজেকে

ছাঁটকাট করবে না, মানব হিসেবে অধিকার ভোগের পূর্ণতায় বিন্দুমাত্র ছাড় দিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করবে না। কিশোরীর এই মানসগঠনে যে প্রতিরোধ স্পৃহা, পূর্ণ মানবজীবনের জন্য যে আকুতি, স্বাভাবিক সুস্থ সুন্দর জীবনের জন্য যে মমত্ববোধ সেটাই তো আমাদের আস্থার ভূমি। সময় যতো প্রতিকূল হোক, পায়ের নিচে এই ভূমিটুকুর অস্তিত্ব তো আমরা অনুভব করতে পারি, দেখতে পাই এর নানা বিচ্ছুরণ, যেখান থেকে একদিন জ্বলে উঠবে আলো।

নববর্ষে মোনাজাত রইলো, বাংলার সকল ঘরে মঙ্গল ও কল্যাণের সেই দীপশিখা প্রজ্বলিত হোক, দূর করুক তমস।